যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ

ইনসান বাঙাল

যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ

ইনসান বাঙাল

পরিবেশক
ইনসানিয়াৎ লাইব্রেরী
গরীব নেওয়াজ খান, খুলনা
বাংলাদেশ

যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ

JUKTIBADIR CHOKHE
NABI MAHAMMAD-O-KOR'AAN SHARIF
[NABI MAHAMMAD AND KOR'AAN :
IN THE EYES OF A RATIONALIST]
By Insan Bangal

প্রথম প্রকাশ : ১ জানুয়ারি ২০০৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১ মে ২০০৯
তৃতীয় সংস্করণ : ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬
প্রকাশক : ইনসান বাঙাল
৬৬, গরীব নেওয়াজ খান, খুলনা, বাংলাদেশ
কম্পোজ : মুন্সী আবদুল্লাহ্
মুদ্রণ : ইনসানিয়াৎ প্রেস, খুলনা, বাংলাদেশ

মূল্য : বাংলাদেশে ১৪০ টাকা এবং ভারতে ১০০ টাকা

উৎসর্গ

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অতীত, বর্তমান ও
ভবিষ্যতের মুক্তবুদ্ধি মানুষ যাঁরা ধর্মকে মানবপ্রেমের অন্তরায় করার
একান্ত বিরোধী, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁদের উদ্দেশে

"সত্য প্রীতিকর না অপ্রীতিকর এবং প্রচলিত মতের অনুকূল না প্রতিকূল আমি তা পরোয়া করি না। সত্য বলার জন্য আমি বন্ধু, শত্রু নির্বিশেষে সকলের বিদ্রূপ ও নিন্দা ধৈর্যের সাথে সহ্য করবো।"

— স্যার যদুনাথ সরকার

কোরআন :

" ... যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

(৭২: ২৩, মক্কী সূরা)

***

"তাদের (বিশ্বাসীদের) জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যা-সঙ্গিনী থাকবে; ওদের আমি বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি - ওদের চির কুমারী করেছি, সোহাগিনী ও সম-বয়স্কা," (৫৬ : ৩৪-৩৭, মক্কী সূরা)

***

" ...অংশীবাদীদের (পৌত্তলিকদের) যেখানে পাবে, বধ করবে; তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় তবে তাদের পথ মুক্ত করে দেবে; ..."

(৯: ৫ - মদনী সূরা)

***

হাদিস :

"জেনে রাখ তরবারির ছায়াতলে বেহেশ্ত বিরাজমান।"

(সহী আল-বোখারী, খণ্ড-৪, ৭৩)

***

"যারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেককে ৭২ জন হুরী দেওয়া হবে।..." (মিশকাত শরীফ, ৩য় খণ্ড, পৃ- ৮৩-৯৭)

***

"বেহেশ্তে প্রবেশকারী মুসলমানকে একশত পুরুষের পুরুষত্ব দেওয়া হবে।" (তিরমিজী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৮)

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ও পাঠকদের চাহিদা স্মরণে রেখে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। আগের দুটি সংস্করণের কিছু মুদ্রণের বানান সংশোধন ছাড়াও বেশ কিছু তথ্যের পুনর্মার্জন ও পরিবর্ধন করা হল। আশা করি আগ্রহীজনের চাহিদা মিটবে।

ইনসান বাঙাল

২৫ নভেম্বর ২০১৬ খুলনা, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ভূমিকা

জন্মসূত্রে আমি মুসলমান। তদুপরি মাদ্রাসায় শিক্ষিত। কিন্তু যতটা আমার গোঁড়া মুসলমান হইবার কথা, তাহা হইতে পারি নাই। তাহার কারণ-কোরান, হাদিস, আমার যুক্তিবাদী মন ও মানবিক চেতনা। মাদ্রাসার মূল পাঠ্য কোরান ও হাদিস গ্রন্থ সমূহ পাঠে আমার মন নানা প্রশ্নে কণ্টকিত হইয়াছে এবং আমি একটি দ্বন্দ্ব বহন করিয়াছি। ইসলামের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস টলিয়াছে। অথচ দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্ট জীব ও জড় এবং সুশৃঙ্খল নিয়ম সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের পেছনে যে একটি ধারণাতীত শক্তি অবিরাম কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহাকে অস্বীকারও করি না। এই কল্পনাতীত কিন্তু নানাভাবে জাহির শক্তিকে যদি আল্লাহ্ বলি তবে সেই আল্লাহ্‌কে কোরানবর্ণিত আল্লাহ্‌র সঙ্গে এক বলিয়া ভাবিতে পারি না। কোরানের আল্লাহ্ মানব জাতিকে 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' হিসাবে বিভক্ত করিয়াছেন। বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া জগতকে চির অশান্তির ক্ষেত্র করিয়াছেন। কিন্তু আমার ধারণায় আল্লাহ্ ঐরূপ হইতে পারেন না। আমি আল্লাহ্, ঈশ্বর বা গড-এ ভিন্নতা বুঝি না। ভাষারই যা ভিন্নতা। বস্তুতঃ সমস্ত কিছুর নিয়ামক শক্তি একটিই। ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং দেশ, কাল অনুযায়ী ধর্ম বিভিন্ন নামের হইলেও তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকা উচিত নয়। যেধর্ম মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তাহা ধর্ম নামের অযোগ্য। ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ করা, মানব গোষ্ঠীকে ভ্রাতৃত্ববোধে একসূত্রে গ্রথিত করা। বিভক্ত করা নয়। অথচ নবী ও কোরান মূলতঃ তাহাই করিয়াছে। মহম্মদ যাহাই বলিয়াছেন ও করিয়াছেন এবং কোরানে মানবপ্রেমের অন্তরায় যাহাই থাকুক আমরা তো পারি ঐ ত্রুটিগুলি সারিয়া লইতে। অবশ্য মহম্মদের পরবর্তীকালে ইসলামের মধ্যে থাকিয়াই সুফীসাধকগণ ইসলামের দ্বি-জাতিতত্ত্ব সহ আরও কিছু কঠোর নিয়মকে ভাঙ্গিয়াছেন। সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সম্পর্ককে প্রভু ও দাসের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভয় নয় প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। ইসলামকে বোধ করি জেহাদের আক্রমণাত্মক ভয়ঙ্করতা হইতে কিছুটা মুক্তও করিয়াছেন। মনে হয় জমিকে আল দিয়া চিহ্নিত করিলেও দেয়াল দিবার প্রয়োজন নাই। দিতে গেলেই দ্বন্দ্ব ও অশান্তি অনিবার্য।

কয়েক মাস হয় এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একদিন আমাকে একটি বই পড়িতে দিলেন।

বইটির নাম 'যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ'। লেখক ইনসান বাঙাল। তাঁহার নাম আগে শুনি নাই। পড়িয়া দেখিলাম লেখক পাকা। তাহার যুক্তির অকাট্যতা সহ কোরানের বিষয়ওয়ারি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্যই মনোহারী ও বস্তুনিষ্ঠ। ইহাতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের অপূর্ব সমাহার লক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। লেখক প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। বহু পন্ডিতের লেখা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু নিরস রচনা হয় নাই। ইনসান বাঙাল আমার ধন্দ নিরসন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন, আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখদের লেখাগুলি মনে পড়ে। ইসলামের অযৌক্তিক, অমানবিক ও অকল্যাণকর বদ্ধ সংস্কারের সম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন সেসব ওয়াজিব বলিয়াই মনে হয়। ইনসান বাঙাল আরও ব্যাপকভাবে কোরানকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণ আক্রোশমূলক হয় নাই। বিশ্বাস করি, ধর্ম নির্বিশেষে যুক্তিবাদী মানুষ লেখকের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করিবেন না। এই বই মানুষের গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা বোধকে দূর করিবার সহায়ক হইবে। মানুষ পরমত সহিষ্ণু হইবে। মানুষের মিলনের পথে ধর্ম বাধার সৃষ্টি করিবে না। ধর্মের উদ্দেশ্য তো মানুষকে দ্বন্দ্বমুখর করা নয়।

বইটি পড়িয়া ইনসান বাঙালের সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়াছি। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছি। তাঁহার নিকটই শুনিলাম বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। প্রস্তাব রাখিলাম, উহার ভূমিকা লিখিব। তিনি সহৃদয় চিত্তে রাজী হইলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম।

মৌঃ মুস্তাফিজুর রহমান

তাং ৭ এপ্রিল, ২০০৯ ফুলতলা, খুলনা, বাংলাদেশ

লেখকের নিবেদন

স্কুল-জীবন হতেই ইসলাম ধর্ম ও কোরআন শরীফ সম্পর্কে গুণগান শুনে আসছিলাম। ফলে এই ধর্ম সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা জন্মেছিল। মনে করতাম কোরআন শরীফে নিশ্চয়ই খুব ভালো ভালো কথা আছে। পরে পরিচিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী অনেকের মুখেই কোরআন হতে কিছু ভাল কথার উদ্ধৃতি শুনেছি। যেমন—

'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমার জন্য আমার ধর্ম। (১০৯: ৬) 'ধর্ম সম্বন্ধে বল-প্রয়োগ নেই, ...' (২: ২৫৬) '...তোমরা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। ...' (৪: ১৭১) '...এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়োনা। আল্লাহ্ অশান্তিকারীকে ভালবাসেন না।' (২৮: ৭৭) 'আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি। ...' (২৯: ৮) এ সব শুনে সে ভালো ধারণা দৃঢ়ই হয়েছিল। বস্তুতঃ কোরআন সম্পর্কে এর বাইরে কোন ধারণা তখন হওয়ার সুযোগ ছিল না, কৌতূহলও তেমন একটা হয়নি। অল্প বয়স হতেই পড়াশোনার প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল বলে ভাল মন্দ নির্বিশেষে সব ধরনের বই-ই পড়তাম। মনে পড়ে বছর তিরিশেক বয়সে বোখারী শরীফ পড়েছি। এটিকে খুব উঁচু ধরনের গ্রন্থ বলে মনে হয়নি। চল্লিশ পার হয়ে আবুল আলা মওদুদীকৃত 'তহ্‌ফিমুল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদের একটা খণ্ড পড়েছিলাম। ওটি পড়েও ভালো ধারণা জন্মেনি। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'পূর্ব কোণ'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে প্রতিদিন কোরআন শরীফের একটা আয়াতের (শ্লোক) বাংলা অনুবাদ ছাপা হত, ওগুলো প্রায়ই পড়তাম এবং এসব নিয়ে মনে অনেক প্রশ্ন জাগতো। সে সব প্রশ্ন অনুকূল নয়; প্রতিকূল। সুতরাং অন্তত মুসলমান কাউকে সে সব প্রশ্ন করা সমীচীন মনে হয়নি।

ইসলাম শান্তির ধর্ম ও কোরআন এক মহান ঐশীগ্রন্থ বলে মুসলমানদের বহুল প্রচারণা চিরকাল শুনে এসেছি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস, অতীতে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মুসলিম আগ্রাসনের বিবরণ এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলামী মৌলবাদী কার্যকলাপ তো তার সত্যতা প্রমাণ করে না। এক শ্রেণীর মুসলমান বিশেষতঃ কট্টর কোরআনপন্থী মোল্লা, সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যারা ইসলামের নাম নিয়ে অতীতে ও বর্তমানে পরধর্ম বিদ্বেষ, নরহত্যা, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি মানবতা বিধ্বংসী কার্যাবলী করেছে ও করছে তাদের প্রেরণার উৎস কোথায় এবং

অন্যান্য মুসলিম ভাইদের তা নিয়ে নিন্দাবাদ না জানিয়ে নীরব থাকার কারণ কী, এসব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সম্পূর্ণ কোরআন পড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এরপর অনেক বছর গিয়েছে, আমার এক আত্মীয়ের নিকট তাঁর অনেক বইয়ের মধ্যে ডঃ ওসমান গনীকৃত কোরআনের বাংলা অনুবাদ বইটি পেয়ে খুব খুশী হই। এতদিনে সম্পূর্ণ কোরআন পড়বার সুযোগ পাওয়াই এ খুশীর কারণ। কয়েকবার পড়লাম। আবার অনেক প্রশ্ন মনে জাগলো। কোরআন ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আগের ভাল ধারণাগুলি একেবারে বদলে গেল।

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে এবং 'মুসলিম লীগ' নাছোড়বান্দা হয়ে পাকিস্তানের দাবি করছিল তখন এবং পাকিস্তান বাস্তবায়িত হওয়ার পরও জানতাম মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দই দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করে মুসলমানদের দ্বীন (ধর্ম), তহজিব-তমদ্দুন (কৃষ্টি-সংস্কৃতি) হিন্দুদের হাত হতে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান দাবির সংগ্রাম করছেন। কোরআন পড়ে আমার এতদিনের ভুল ভাঙ্গলো। দেখলাম দ্বি-জাতিতত্ত্বের মূল সেখানেই নিহিত রয়েছে। কোরআন পৃথিবীর সকল মানুষকে স্পষ্টতই 'মুসলমান' ও 'অমুসলমান' হিসেবে (সৎ ও অসৎ নয়) ভাগ করে অমুসলমানরা ইসলামধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে তাদের সম্পদ ও প্রাণ হরণের নির্দেশ মুসলমানদের প্রতি দিয়েছে (কোরআন-২:১৯৩; ৯:৫, ২৯, ৭৩)। এমনকি নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এ সংগ্রাম করতে গিয়ে কেউ শহীদ হলে তার জন্য বেহেশ্ত (স্বর্গ) নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সেখানে অনন্ত দৈহিক সুখভোগের কথা, যেমন— সর্বোত্তম খাদ্য ও পানীয়ের সাথে উদ্ভিন্ন যৌবনা চিরকুমারী অতুলনীয় রূপসম্পন্না নারী ও রূপবান কিশোর বালকের (সম মৈথুনের জন্য কি?) নিশ্চিত ব্যবস্থা আছে। আর যুদ্ধে সফল হলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (নারীসহ) অধিকার ও খোদাপ্রদত্ত সকল প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। এ সব নগদপ্রাপ্তির অতিরিক্ত পরকালের চিরকালীন ব্যবস্থা তো আছেই। লক্ষণীয় যে, বেহেশ্তের এসব দৈহিক সুখভোগের বর্ণনায় কোথাও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অহেতুকী প্রেমবশত তাঁর নৈকট্যলাভের বা আত্মিক তৃপ্তি বা আনন্দের উল্লেখ নেই। মুসলমানদের জন্য এ লোভনীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি অমুসলমানদের জন্য আছে দোজখের (নরকের) ভয়ংকর অনন্ত শাস্তির ব্যবস্থা। এই যে দৈহিক সুখ ও যন্ত্রণাভোগের দুটি চরমচিত্র কোরআন বার বার বর্ণনা করেছে তা সাধারণ মানুষকে স্বভাবতই প্রলুব্ধ ও ভীত করে ইসলামের পথকে সুগম করেছে— তথা তাদেরকে 'ইসলাম' গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। তদুপরি অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও জঙ্গী তৎপরতায় উৎসাহ যুগিয়ে 'বিশ্বাসী'দের (মুসলমানদের) জন্য 'ইসলাম' বিস্তারের পথ সহজ ও দ্রুততর করেছে।

বস্তুতঃ নবী মহম্মদ প্রবর্তিত কোরআন ও তাঁর কার্যাবলীই ছিল জিন্নাহ প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের মূল কারণ। একথা হিন্দু নেতা ও চিন্তাবিদগণের ২/৪ জন ছাড়া কেউ জানতেন না। এবং উক্ত ২/৪ জন নেতার কথা কেউ গ্রাহ্য করেননি। অতএব হিন্দু নেতৃত্বের অজ্ঞতাও ভারত বিভাজনের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

নবী মহম্মদ তিনটি মোক্ষম নীতি প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িকতারূপী ভয়ঙ্কর দৈত্যটিকে মহাশক্তিধর করে তুলেছেন। সেই নীতিগুলো হচ্ছে যৌনতা, জেহাদ ও জান্নাত। হিন্দু নেতৃত্ব সে বিষয়ে আদৌ ওয়াকিবহাল নন। এবং ওগুলোর প্রতিষেধক বের করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত আবারও ভাঙবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্ম দেবে। জন সংখ্যার ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় ভারসাম্যহীনতা ও ইসলামী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সেই অশনি সংকেত দেয়।

অবিভক্ত ভারতে আমার জন্ম হলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমার জীবনের সত্তর বছর পার হয়েছে। এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু কোরআন ও কিছু কিছু হাদিস ইত্যাদি পড়ে যে সত্য জেনেছি তা মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ করার প্রচণ্ড ইচ্ছা হল। উদ্দেশ্য এটা যে, মানুষের ভুল ভাঙ্গুক, সত্যকে জানুক। কিন্তু তাতে অন্তরায় আছে। ইসলামী বিধান মোতাবেক আমার অনন্ত দোজখ বাসের ব্যবস্থা হয়েই আছে। আমি তা জেনেও ভীত নই। কিন্তু ইসলামের পরমত অসহিষ্ণু অতন্দ্র প্রহরীরা যে আমার ইহলৌকিক নানা প্রকার লাঞ্ছনাসহ প্রাণ হরণের ব্যবস্থা করবে তাকে একেবারে তুচ্ছ করা চলে না। অতএব নিজেকে আড়াল করতে আমি ' ইনসান বাঙাল'।

অনেকদিন আগেই এ বইয়ের একটি খসড়া করে রেখেছিলাম। কিন্তু হিংসুক ও বেহেশ্‌তলোভী মৌলবাদী ইসলাম পন্থীদের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তাণ্ডব দেখে এটি প্রকাশ করতে পারিনি। অধুনা কিছুদিন হল বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন লেখক লেখিকা কোরআন-হাদিসের বুদ্ধিদীপ্ত নিরপেক্ষ সমালোচনা করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং তা প্রকাশও হচ্ছে। দু'টো 'ই-মেল ম্যাগাজিন'-ও বেরিয়েছে- www.mukto-mona.com এবং www.shodalap.com। প্রধানত এসব দেখেই আমরা বইটি প্রকাশে উৎসাহ পেয়েছি।

আজ পর্যন্ত নানা পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ (প্রধানতঃ মুসলমান), ধর্মনিরপেক্ষতার ভেকধারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এমনকি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত কোরআন হাদিসের যে আধুনিক মনোহারী মোলায়েম ও মানবিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা সঙ্গত কারণেই আমার নিকট ভুল ও অজ্ঞতা কিংবা অভিসন্ধিপরায়ণ, মিথ্যা ও বিকৃত বলে মনে হয়েছে। বরং ইসলামের বিস্তৃতির জন্য প্রাথমিক যুগের হযরত মহম্মদ ও তদীয় সেনাপতিদল অথবা পরবর্তীকালের খালিদ, ওয়ালিদ, তারেক, মহম্মদ-বিন-কাসেম, সুলতান মাহমুদ, ঘুরী, তৈমুর, বাবর, নাদিরশাহ প্রমুখ যুদ্ধবাজ সামরিক ব্যক্তিত্ব শত

শত যুদ্ধে হাজার লক্ষ মানুষের প্রাণ যারা হরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি কিংবা আধুনিক কালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কট্টর মৌলবাদী ইসলামিক বিভিন্ন দল অথবা উগ্র জঙ্গীবাদী তালিবান নেতা মোল্লা ওমররা যে সব ধ্বংসাত্মক কাজ করে চলেছে তা-ই কোরআন ও ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামে দীক্ষা দিয়ে বিশ্বের সকল মানুষকে ইহকাল ও পরকালের সকল সুখসম্ভোগের অধিকারী করার যে মহান ঠিকাদারী রসুল মহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা নিয়েছেন তা-ই কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ ("...এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" ২৫: ৫২)। অথচ প্রাকৃতিক বা মনুষ্য-সৃষ্ট কোন দুর্যোগের সময় কোন মোল্লা মৌলভীকে কোরআন হাতে নিয়ে সাহায্য করতে বা শান্তির বাণী প্রচার করতে দেখা যায়নি। কোরআনের এই যে আদর্শ (?) তাতে কোন জটিলতা নেই— একেবারে সহজ সরল মার-প্যাঁচ বিহীন কথা— হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয় মর। তবে এই ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গী ও নিষ্ঠুর কার্যাবলী ইসলামের সাথে যতই সঙ্গতিপূর্ণ হোক তা গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী হওয়ার অনুকূল নয়। এসব অন্যের ন্যায্য অধিকারে সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৃষ্টিকর্তা বলে যদি কেউ থাকেন তবে তিনি সর্বযুগে সকল দেশে যে সমস্ত মানবিক ও কল্যাণকর নৈতিক রীতি পদ্ধতি ছিল, আছে ও হবে তার সমস্ত কিছু বাতিল করে কেবল একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ এলাকার, বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মকেই বিশ্বের সকল যুগের সকল মানুষের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করতে বা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারেন না। দিলে তার সাথে স্বাভাবিক বুদ্ধির কোন সংস্রব থাকে না। এর স্বপক্ষে বহু যুক্তি প্রমাণ দেয়া যেতে পারে। তন্মধ্যে অত্যন্ত সহজ একটা প্রশ্ন যে, মহম্মদ ও কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসুলের পিতামহ ও পিতা পর্যন্ত যে সকল লোক পৃথিবীতে জন্মেছিল, যারা কোরআন কিংবা তাতে উল্লেখিত কোন রসুলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেনি এমন কি ভৌগোলিক দূরত্ব বা সময়ের ব্যবধানবশত তাঁদের কোন উপদেশ শোনবার সুযোগ পায়নি তাদের উপায় কী হবে? তারা কেন দোজখবাসী হবে? এ সম্পর্কে কোরআনের ব্যাখ্যাটা কী?

হাদিসের বিধান অনুসারে পরকালে নবীর চাচা আবু তালেবের শাস্তি নাকি হবে সবচেয়ে কম — তাঁর পায়ে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে অনন্তকাল ধরে তাঁর মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে। (বর্ণনাকারী ঃ হযরত ইবনে 'আব্বাস, — বুখারী। ডঃ ওসমান গনী কর্তৃক তাঁর 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে হযরত মহম্মদ (দঃ), ১৯৯৫, পৃ-২৮২)। এর নাম ধর্ম? এই কি শান্তির ধর্মের নমুনা?

অজ্ঞতা বা ভুলবশত হোক কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোন প্রকার স্বার্থরক্ষা করার কৌশল হিসেবেই হোক (এটাই প্রধান) যারা ইসলামকে শান্তির বাহক বলে

বর্ণনা করেন ও জঙ্গীবাদীদের ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী বলেন তাদের উদ্দেশে আরও একটা প্রশ্ন রাখা যায় যে, আজ পর্যন্ত সেকালের ও একালের কোন ইসলাম তত্ত্ববিদ, ধর্মগুরু, মনীষী ইত্যাদি কি ইসলামের নামে রক্তের নদী বহানো কোন সেনাপতি, সুলতান বা মৌলবাদী মোল্লাদের ওসব জঘন্য নরহত্যা, নারীহরণ, লুণ্ঠন ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটুও নিন্দা বা মৃদু সমালোচনা করছেন? এ প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর— না, করেননি। বরং মানবতার পক্ষে গ্লানি ও লজ্জাজনক ওসব কাজকে গৌরবের বিষয় বলে অনেকেই নিরবে বা সরবে সমর্থন করেছেন। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস লিখেছেন। 'জেহাদে'র অর্থ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধই হয়, তবে ইসলামের শান্তিবাদী ব্যাখ্যাকাররা ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে পাল্টা জেহাদে নামেন না কেন? এই সেদিনও ইসলামের নামে পাকিস্তানের সমরনায়করা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ইসলাম বিরোধী হিন্দুদের প্ররোচিত কাজ বলে হাজার হাজার নারী-ধর্ষণ ও লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুঠ করেছে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছে। ইসলামিক বিশ্ব ও তাদের মতলববাজ মিত্ররা এমনকি সাম্যবাদী কম্যুনিস্ট চীন ঐ বর্বর কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে একটি কথাও বলেনি। নিরবে বা সরবে তাকে সমর্থনই করেছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। ইসলাম ও কোরআন অনুসরণকারী মুসলমানদের স্বার্থপূর্ণ সংঘাত ও নররক্ত রঞ্জিত দীর্ঘ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কোন অর্থেই কি কোরআনকে শান্তি ও মানবতার উৎস বলে গণ্য করা যায়? পৃথিবীর তাবৎ ইসলামী আলেম সমাজ কোরআনের যে ব্যাখ্যা বা সর্বরোগহর চিত্রটি তুলে ধরেন তা কি সত্যই কোরআন যা বলেছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? যদি না হয় তবে কোরআন কি যৌক্তিক ও মানবিক? কোরআন কি প্রকৃতই ঐশীগ্রন্থ? কোরআন কি মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না? এসব অনেক প্রশ্ন আমার মনকে আলোড়িত করেছে, কোরআন সম্পর্কে কৌতুহলী করেছে। তারই ফলে আমি অনুসন্ধান করে কোরআনে যা পেয়েছি অকপটে তা লিখেছি।

আমি আরবী ভাষা জানি না। তাই কোরআনের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। এর যে সমস্ত বাংলা অনুবাদ এ বইতে উদ্ধৃত করেছি তার প্রায় সকলই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ ওসমান গনীকৃত ও কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স প্রকাশিত, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮ হতে। তথ্যাদি বিষয়ে, যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা যথাস্থানেই উল্লেখিত। অধ্যাপক হোসেন আলীকৃত ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে লিখিত আই, এ ও বি, এ ক্লাসের জন্য বেগম নুরজাহান প্রকাশিত পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ "Hand Book of ইসলামের ইতিহাস" হতে হযরত মহম্মদ এর জীবনের কিছু তথ্য নিয়েছি। কোরআনের ইংরেজী অনুবাদ যা উদ্ধৃত করেছি তা M. M. Pickthall কৃত বই "The Meaning of the Glorious Koran" হতে। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সত্য সন্ধানে আমি নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ হয়ে কোরআনকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি বলে পূর্বসংস্কারবশত যারা এর অন্ধ অনুরাগী, তাদের ক্রোধ উদ্রেক হবে জানি। কিন্তু মুসলিম ভাইদের মধ্যে ও বাইরে মুষ্টিমেয় হলেও কিছু লোক ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যারা সত্যকে জানতে চায় এবং স্বীকার ও প্রকাশ করে। এ বড়ই ভরসার কথা। সে ভরসা এবং অন্ধদের মধ্যেও যদি কারো সত্য দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে সে আশায় আমি এ সামান্য পুস্তক রচনায় উৎসাহী হয়েছি। এ বিষয়ে নানা বই যুগিয়ে, উদ্দীপনা, তাগিদ ও পরামর্শ দিয়ে যে ব্যক্তি আমাকে অশেষভাবে ঋণী করেছেন তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও প্রতিবাদী লেখক ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বরিশালের...। না, যে কারণে আমি ছদ্মনামের আড়াল হয়েছি সে কারণেই তাঁর নাম প্রকাশ করা গেল না।

এ বইটিতে যেহেতু কোরআনের প্রধানত মন্দ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি সেহেতু কৌতূহল হতে পারে আমি কোন্ ধর্মমতে বিশ্বাসী। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, যে ভাবে বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত আছে তার কোনটার প্রতিই আমার দুর্বলতা নেই। আমি মানব-ধর্মে বিশ্বাসী। মানব কল্যাণে বিশ্বাসী।

বিভিন্ন ধর্মের প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণা সর্বাংশে এক নয় এবং তা সত্য হোক বা না হোক আমার তাতে বিশ্বাস না থাকলেও আমি এর বিদ্বেষী নই। ঈশ্বরের একত্ব নিয়ে যে সহজ তত্ত্বটি ইসলাম প্রচার করেছে সেটিকে আমি প্রশংসাই করি। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যে মহম্মদ ও তার অনুসারীদের একক প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠার কথা কোরআনে বলা হয়েছে তা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। অথচ কোরআন সে কথাই বার বার বলছে।

এ বিষয়ে এখানে আরও একটি তথ্য সংযোজন না করলেই নয়। ই-মেল ম্যাগাজিন 'সদালাপ'-এ (www.shodalap.com) জনৈক সৈয়দ কামরাণ মির্জা ২৮.২.০৬ তারিখে লেখা তাঁর একটি নিবন্ধে বলেছেন— আল্লাহ্‌র নামে চালানো কোরআনের আয়াতগুলি মহম্মদ রচনা করেছেন কয়েকজন ব্যক্তির রচনার সাহায্য নিয়ে। এঁদের মধ্যে আছেন— ইমরুল কায়েস, যায়েদ-বিন-আমির বিন নৌফল, লাবিদ, হাসান বিন সাবিত, সালমান, বাহিরা, জাবের, ইব্‌ন কামতা, খাদিজা (মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী), ওয়ার্কা, ওবে-বিন কা'ব, আল সাবেনস, আয়েশা (মহম্মদের নাবালিকা স্ত্রী), আবদাল্লা বিন সালাম বিন আল হারিস এবং মুখিয়ারিখ।

মূলতঃ ইসলাম ধর্মে ও তার ইতিহাসে অন্য ধর্মের স্বীকৃতি নেই। গণতন্ত্রেরও স্থান নেই ইসলামে।[১] আজ পৃথিবীর প্রায় ৫৫-টি রাষ্ট্র মুসলিম শাসিত। এদের

১। King Fahad of Soudi Arabia said, "The Democratic system that is predominant in the world is not suitable system for the peoples of our religion. The system of free elections is not suitable to our country." From : 'Is Islam Compatible With Democracy & Human Rights.' Institute for the secularisation of Islamic society. Internet matter > to search by google.

কোনটাতে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই। নেই নিম্নতম বাক-স্বাধীনতার সুযোগ। এবং ওগুলির তিন চারটি রাষ্ট্র বাদে কোনটাতেই হিন্দু বা বৌদ্ধদের, পুতুল পুজারীদের নাগরিক বলে স্বীকার করা হয় না। ইসলাম নিজেকে বিশ্বজনীন ধর্ম বলে দাবি করলেও রাষ্ট্র সংঘ ঘোষিত বিশ্বজনীন মানবাধিকার সে স্বীকার করে না। এবং তার মূল ঐ নবী মহম্মদ ও তাঁর প্রচারিত কোরআন শরীফ। এ কথা আমরা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি এই বইতে। বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন তথ্যাদি হাজির করেছি নিরপেক্ষ ভাবে। তবু যেহেতু মানুষের ভুল হয় এবং আমরা সে ভুলের ঊর্ধ্বে নই, সেহেতু কেউ যদি বইটির কোন ভুল ধরিয়ে দেন তো সবিনয়ে তা স্বীকার করে পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেব।

বিশ্বাস দুই প্রকার। এক, যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ নির্ভর। উদাহরণ—বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি। দুই, — প্রশ্নহীন পরম্পরাগত। বলা যায়, পৃথিবীর তাবৎ ধর্মগুলি প্রধানত এই দ্বিতীয় ধরনের বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মগুলির সাথে মোটামুটি সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিকর্তা, দেব-দেবী, ফেরেশ্‌তা, মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও তাদের বিচার, আত্মা, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি ঐ প্রশ্নহীন পরম্পরাগত বিশ্বাস। যার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

নাস্তিক্যবাদী ধর্মগুলির কথা বাদ দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে বোঝা যায় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী প্রচলিত ধর্মগুলির সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা হুবহু এক নয়। তাঁর সাকারত্ব এবং নিরাকারত্ব নিয়েও মতপার্থক্য আছে। যদিও অধিকাংশ ধর্মগুলির মূল ভিত্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই বা থাকা সম্ভব নয়, তবু সে বিষয়ে অনুমান-নির্ভর যুক্তি দাঁড় করানো যায়। যেমন পর্বতের ধোঁয়া দেখে সেখানে আগুনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। কিন্তু এটা আরও যুক্তিসংগত যে, যখন শূন্যতা বা আকাশ, ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সীমা নির্ধারণ করা যায় না তখন এগুলোর সৃষ্টিকর্তার যে বর্ণনা বিশেষত কোরআন ও অন্যান্য সেমিটিক ধর্মগুলিতে দেখা যায় তা একান্তই হাস্যকর। এই যখন ধর্মগুলির প্রকৃত অবস্থা তখন ওগুলির কোনটা ঠিক এবং কোনটা বেঠিক তা নিয়ে দাবি বা তর্ক করা কতখানি সমীচীন তা মুক্ত-বুদ্ধির মানুষ বিচার করবেন।

সে যাহোক, আমরা ধর্মের মধ্যে প্রচলিত কল্পিত বিষয়গুলিকে নাকচ করতে চাই না যদি ওগুলির মধ্যে মানুষের জন্য কল্যাণ থাকে। কিন্তু তাই বলে এই অপ্রমাণিত বিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে একদল ভীতি ও লোভ প্রদর্শন করে, নিজেদের ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে, অপর সকল ধর্মানুসারীরা ঘৃণ্য এবং নরকেই তাদের একমাত্র গতি এই ঘোষণা দিয়ে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ দ্বারা তাদের ধর্মান্তরকরণের ইজারা নিতে পারে না। এটা চরম মনুষ্যত্ব বিরোধী। ইসলাম বিশ্বমানবের কথা বলে না। কেবলমাত্র বিশ্বাসীদের কল্যাণের কথা বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় কোরআন ও হাদিসের অনুবাদ হয়েছে। শত শত বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন আয়াত ও বিধানের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাকারদের

মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১। মৌলবাদী বা চরমপন্থী, ২। নরমপন্থী, ৩। মুখোশধারী।

আমরা এখানে এ ভাগগুলির একটু ব্যাখ্যা করবো। মৌলবাদী বা চরমপন্থী শব্দ দুটি সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ মৌলবাদীরাই প্রকৃত কোরআন হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাদানকারী ও অনুসারী। তাদের ব্যাখ্যায় ভণ্ডামী নেই। নেই রূপক প্রয়োগের অস্পষ্টতা। কোদালকে তারা কোদাল বলতে লজ্জা বা ভয় করে না। তারা যে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ উস্কাচ্ছে বা চালাচ্ছে তা অবশ্যই কোরআন হাদিসের নির্দেশ অনুসারেই করছে।

নরমপন্থীদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে মানবিক কারণে বা চক্ষু লজ্জায় তাঁরা কোরআন-হাদিসের জেহাদ বা পরধর্মদ্বেষী উগ্র ও কুৎসিত অংশগুলিকে ঢেকে রেখে বিপরীতধর্মী মোলায়েম অংশগুলিকে নানা ভাবে তুলে ধরেন। কোরআনে স্ব-বিরোধিতা থাকায় এরূপ ব্যাখ্যার সুযোগ কিছুটা আছে।

আর মুখোশধারী বলতে বোঝাতে চাইছি সেই বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত মুসলমানদের যাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অপর ধর্মাবলম্বীদের বিভ্রান্ত করার বা ধোঁকা দেওয়ার জন্য সুকৌশলে এমন সব ব্যাখ্যা দান করেন যাতে মনে হয় ইসলামে অপর ধর্মালম্বীদের সাথে সহাবস্থানের কোন বাধা নেই। তাঁরা সময় বিশেষে অপর ধর্মের গুণগানও করেন। এবং অমুসলমানরা যাতে সেকু লার থাকেন সেই উপদেশ অহরহ দিয়ে যান। কিন্তু নিজ ধর্মের দ্বি-জাতি তত্ত্ব, জেহাদ ইত্যাদি বিষয়গুলির উল্লেখ মাত্র করেন না। কিংবা ওগুলির নিন্দা বা সংস্কারের কথাও বলেন না। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে তাঁদের এক অতি ধূর্ত রণকৌশল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন এরূপ স্বনামধন্য মুখোশধারী পণ্ডিত আছেন। তাঁদের সম্পর্কে এ বইয়ের অন্যত্র কিছুটা উল্লেখ আছে।

আমরা উপরে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাদানকারীদের ভাগ ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছি। কিন্তু ভাগ ও চরিত্র যাই হোক একথা খুবই সত্য যে, তাদের সকলের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। এবং তা হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষকে মুসলমান বানাতে হবে। আল্লাহ্ রসুলের প্রতি বিশ্বাসী করে তাদেরকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখানো চাই-ই।

এখানে আরও একটি সত্য প্রকাশ করা নেহাৎ প্রয়োজন। মুসলমানদের ঘরে জন্মে ও মুসলমানী নামে পরিচিত হয়েও পরবর্তী জীবনে জ্ঞানার্জনের ফলে কিছু ব্যক্তি কোরআন হাদিসের এবং অপরাপর ধর্মেরও খারাপ দিকগুলির প্রতি নিরপেক্ষভাবে অকুতোভয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অন্য ধর্মের খারাপ দিকের সমালোচনা করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করা যাবে না। কোনমতেই না। করলে তার আর মুসলমানীত্ব থাকে না। 'মুরতাদ' নামে অভিহিত করে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ইসলামের পবিত্র বিধান। ইংল্যাণ্ডে বসবাসরত সালমান

রুশদী, আনোয়ার শেখ, বাংলাদেশের দাউদ হায়দার, হুমায়ুন আজাদ (নিহত), সালাম আজাদ, তসলিমা নাসরিন, সদ্য প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান, পশ্চিমঙ্গের গিয়াসুদ্দিন, মোঃ মোরসালিন ইত্যাদি ইসলামী তত্ত্ববিদ লেখকগণ মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়াপ্রাপ্তদের জ্বলন্ত উদাহরণ। অমুসলমানরা তাঁদের মুসলমানীত্ব খারিজ করছে না; কিন্তু মুসলমানরা তা করে। তাদের ধর্মের বিধান মেনেই করে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা— অন্য ধর্মাবলম্বীরা দূরে থাক মুসলমানরাই বা ক'জনে কোরআন পড়েন? এবং যারা পড়েন তাদের মধ্যে ক'জন অনারব আরবী কোরআনের অর্থ বোঝেন? অথচ আমরা মনে করি ধর্মনির্বিশেষে সকলেরই গ্রন্থখানি পড়া উচিত। উচিত বলছি এ জন্য যে, এ গ্রন্থখানির অনুসারীরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। সুতরাং তাদের তো বটেই অমুসলমানদেরও যে গ্রন্থের এত অনুসারী তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা একান্ত জরুরী। অবশ্য তার কারণ এ নয় যে, এটি একটি ঐশী ও মহান গ্রন্থ। বরং এজন্য যে, ঐশী বলে যে-দাবি করা হয় তা একান্তই ভুল এবং এটি মহান গ্রন্থও নয়। কোরআন পড়েই আমাদের একথা মনে হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থখানি পাঠ করার একান্ত জরুরী কাজটির প্রধান বাধা এর বিশালায়তন, নিরস একঘেয়েমী ও কিছুটা উচ্চ মূল্য। আরবী ভাষাটা এখন আর বাধা নয়, কেননা বাংলা সহ এখন বহুভাষায় এর অনুবাদ সুলভ। সুতরাং এসব বাধা অতিক্রম করার কষ্ট স্বীকার না করেও এর বক্তব্য যাতে মোটামুটি সহজে জানা যায় তার জন্যই আমাদের প্রয়াস— 'যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ'। অসত্য প্রচার শুনে, অস্পষ্ট ও মিথ্যে ধারণা পোষণ না করে কৌতূহলী পড়ুয়া এ বইয়ের মারফত কোরআন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাবেন। এবং সত্যমিথ্যা যাচাই ও চিন্তা করার সুযোগ পাবেন। তাতে মানুষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের উদ্দেশ্য যশোলাভ নয়। সত্য গৃহীত হলেই সফল ও অনুগৃহীত হব।

বিনীত

তাং ৩০/১২/২০০৬ ইনসান বাঙাল

কোরআন থেকে প্রতিটি উদ্ধৃতির শেষে 'সূরা' ও 'আয়াতের' ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে — ১: ৬ কিংবা ২৮: ৯, ১৫ ইত্যাদি। এখানে 'কোলন'(:) চিহ্নের আগে ১ বা ২৮ হচ্ছে সূরার ক্রমিক সংখ্যা এবং কোলন (:) চিহ্নের পরের ৬ ও ৯, ১৫ উক্ত সূরার আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক।

১॥ হযরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে আরব উপদ্বীপের অধিবাসীরা যখন ধর্মীয় ও অন্যান্য দিক দিয়ে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, অর্থাৎ অশিক্ষা, মদ-জুয়ার নেশা, গোত্রগত লড়াই, যাযাবরী জীবন, সর্বজনগ্রাহ্য আইন কানুনের অভাব ইত্যাদি দ্বারা সমাজ বিপর্যস্ত হচ্ছিল, সে সময় পাঁচশত সত্তর খ্রীষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার (তারিখটি সম্পর্কে মতভেদ আছে) মক্কা নগরীর সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে হযরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লা, মায়ের নাম আমিনা এবং দাদুর নাম আবদুল মোতালেব। মোতালেবের ৬ ছেলে।

আবদুল মোতালেব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লার সাথে আবু ওয়াহাবের কন্যা আমিনার বিয়ে দেন। বিয়ের কিছু দিন পরে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আবদুল্লা সিরিয়া চলে যান। তখন আমিনা গর্ভবতী। সিরিয়া থেকে বাড়ী ফেরার পথে মদীনায় এসে আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে আব্দুল্লার মৃত্যু ঘটে। বিধবা আমিনা যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ঐ পুত্রই হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হযরত মহম্মদ। দাদা আবদুল মোতালেব তাঁকে ঐ নামটি দেন যার অর্থ প্রশংশিত এবং মা আমিনা নাম রাখেন আহম্মদ যার অর্থ প্রশংসাকারী। ধাত্রী হালিমা মহম্মদকে পাঁচ বছর পর্যন্ত পালন করেন।

মা আমিনা ছয় বৎসরের শিশু পুত্রকে নিয়ে স্বামীর কবর দর্শন ও আত্মীয়স্বজনের সাথে মহম্মদকে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে মদীনায় (তৎকালে নাম ছিল ইয়াস্রেব) যান। সেখান থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি এক মরুদ্যানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অতঃপর পিতামহ আবদুল মোতালেব বালক মহম্মদের লালন পালন করতে থাকেন। কিন্তু বছর দুয়েক পর তিনিও পরলোক গমন করলে জেঠা আবুতালেব তাঁর অভিভাবক হন। আবুতালেব গরীব ছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে মহম্মদকে জীবিকা অর্জনের জন্য কৈশোরেই ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি চরাতে হত। একটু বড় হলে তিনি জেঠার সাথে বাণিজ্য করতে নানা স্থানে যেতেন। পরে মক্কার এক বিত্তশালিনী বিধবা মহিলা খাদিজার ব্যবসায়ে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন। এসময় তাঁর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হয়ে খাদিজা তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। অভিভাবক জেঠা আবুতালেব ও মহম্মদ প্রস্তাবটি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন।

৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। খাদিজার এর পূর্বে দু'বার বিয়ে হয়েছিল। মহম্মদের সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বৎসর এবং মহম্মদের বয়স ২৫ বৎসর। এই বিয়ের ফলে মহম্মদের দারিদ্র্য ঘুচলো। বলা হয়ে থাকে তিনি তখন প্রায়ই মাইল তিনেক দূরের হেরা নামক একটি গুহায় গিয়ে ধ্যান করতেন। সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন। এ সময় নানা গুণের জন্য তিনি সমাজে প্রিয় হয়েছিলেন। এভাবে দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর কাটলে যখন তাঁর বয়স চল্লিশোত্তীর্ণ তখন একদিন তিনি এসে স্ত্রী খাদিজার নিকট বর্ণনা করলেন যে, হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান করার সময় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে কিছু বাণী (ওহী) দিয়েছেন। এতে তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত বোধ করছেন। এ কথা শুনে বিবি খাদিজা অভয় ও উৎসাহ দিয়ে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই। বরঞ্চ এ হচ্ছে ফেরেশ্‌তা মারফত সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বাণী। এবং তিনি আরও বললেন, মহম্মদ 'আল্লাহ্‌র' নবুয়ত (প্রতিনিধিত্ব) প্রাপ্ত হয়েছেন, যা খুবই সম্মান ও আনন্দের। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, তখনও মহম্মদ ইসলামধর্ম প্রচার শুরু করেননি। একেশ্বরবোধক 'আল্লাহ্' শব্দটি যা পরবর্তীকালে মহম্মদ ব্যবহার করেছিলেন তা খাদিজার জানার কথা নয়। কেননা খাদিজা ও মহম্মদ তখন পর্যন্ত মক্কায় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের লোকই ছিলেন। যদিও মক্কার কাবা মন্দিরের বহু দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে 'এল' নামে একটি প্রধান দেবমূর্তি ছিল বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। মহম্মদ বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণীপ্রাপ্তির এই প্রথম ঘটনাটি ঘটে কারো কারো মতে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে জুলাই মোতাবেক ১৭ রমজান সোমবার। যাহোক, এরপর তিনি তাঁর বর্ণনামতে মাঝে মাঝেই ঐরূপ জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা মারফত আল্লাহ্‌র বাণী পেতে থাকলেন। এবং গোপনে গোপনে মক্কার লোকদের মধ্যে উক্ত বাণী সমূহ তথা ইসলাম ধর্ম নামে একটি ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন। মক্কার অধিবাসীরা তখন নানা দেবদেবীর মূর্তি পূজা করত। কিন্তু মহম্মদের প্রচারিত ধর্মের মূল কথা ছিল সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ্ নিরাকার; তাঁর কোন মূর্তি নেই। এবং মহম্মদ আল্লাহর বাণী বাহক বা রসুল। তাঁর এ ধর্ম প্রথমে বিবি খাদিজা, পরে জেঠা আবু তালেবের ছেলে আলী ও ক্রমে আরও দু'একজন গ্রহণ করলেও মক্কার সকলেই, যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত, মহম্মদের সঙ্গে প্রবল বিরোধ ও শত্রুতা করতে শুরু করলো। যদিও জেঠা আবুতালেব মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তবু তিনি তাঁকে সর্বতোভাবে শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করতে লাগলেন। ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের বয়স যখন পঞ্চাশ বৎসর অর্থাৎ নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বৎসর, তখন প্রথমে বিবি খাদিজা ও মাসাধিক পরে জেঠা আবু তালেব (অবশ্য এ বিষয়ে মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে) ধরাধাম ত্যাগ করে গেলে তিনি খুবই অসহায় বোধ করলেন। এবং বিচলিত হলেন। শত্রুদের প্রবল বিরোধিতার মুখে অতিষ্ঠ হয়ে

কিছু দিনের জন্য তিনি তায়েফ নগরীতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গেলেন। কিন্তু সেখানেও সুবিধা না হওয়াতে ফিরে আসলেন। বহুপূর্ব হতেই আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতি বৎসর এক নির্দিষ্ট সময়ে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী মক্কার কাবা মন্দিরের দেবদেবীর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য এসে মিলিত হত। এ মেলা 'ওকাজ মেলা' বলে পরিচিত ছিল। ওকাজ মেলায় সে সময় একবার মদীনাবাসী কয়েকজন লোক মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। পরবর্তী কয়েক বছরে 'ওকাজ' মেলায় আগত আরও কিছু মদীনাবাসী তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে তাঁকে মদীনায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। তিনি বুঝেছিলেন মক্কায় তাঁর ধর্মের প্রচার হবার আশু সম্ভাবনা নেই। এবং টের পেলেন সেখানে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সুতরাং ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের এক রাত্রে প্রায় সমবয়সী বন্ধু ও শিষ্য আবুবক্করকে সাথে নিয়ে মক্কা হতে পালিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের প্রায় ২২৫ মাইল দূরবর্তী মদীনায় উপস্থিত হলেন। সেখানকার শিষ্যগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। মক্কা থেকে মহম্মদের মদীনায় আসার এই ঘটনাকে 'হিজরত' বলা হয় এবং হিজরতের পরবর্তী চান্দ্র বৎসরগুলিকে হিজরী সাল ধরা হয়।

মদীনায় এসে মহম্মদের নির্জন পাহাড়ের গুহায় বসে ধ্যান করা গেল ঘুচে। ধর্মপ্রচারের সাথে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডে এত ব্যস্ত হলেন যে, তাঁর জীবনের পটই পরিবর্তন হয়ে গেল। সেখানে তাঁর শিষ্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। ধর্মীয় ভূমিকার পাশাপাশি তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক কাজ-কর্ম প্রবলতর হল। মদীনায় এক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন এবং একই সময় তিনি ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনেতা হয়ে সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করতে লাগলেন। তিনি বহু যুদ্ধে[১] স্বয়ং অংশগ্রহণ করে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা বিজয় ছাড়াও অনেক দেশ দখল, লুণ্ঠন ও বহু লোককে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। লক্ষণীয় এ সময়ে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বলে কথিত কোরআনের বাণীসমূহের প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছিল। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচনা ও হত্যার নির্দেশ দানের মত কঠোরতা মদীনায় অবতীর্ণ 'ওহী' সমূহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ('কোরআনে দ্বি-জাতি তত্ত্ব' পরিচ্ছেদে আলোচনা আছে)। তিনি অনেক যুদ্ধ-বন্দীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আটশ' ইহুদী ধর্মাবলম্বী বানু কুরাইযা গোষ্ঠীর বন্দীদের হত্যা এর অন্যতম উদাহরণ (The life of Mahomet by Sir Wilium Muir, 1st Indian print, 1992 pp.-316-322)। এবং আশ্চর্যের কথা এই, কোরআনে এ ধরনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ আছে। যেমন, "দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়, ..." ৮: ৬৭-মদনী)। নবী অবশ্য এর পূর্বেই বদরের যুদ্ধের পর বানু কাইনুকা ও ৪র্থ হিজরীতে বানু নাদির নামীয় ইহুদীদের অপর দু'টি গোষ্ঠীকে মদীনা

হতে বিতাড়িত করেন। এভাবেই মদীনাকে ক্রমে ক্রমে তিনি ইহুদীশূন্য করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন।

নবী মহম্মদ মদীনায় এসে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন করেন, তখন নিজে যেমন সম্পদশালী ছিলেন না, তেমনি রাষ্ট্রীয় অর্থ ভাণ্ডারও দুর্বল ছিল। তাই সেনাদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র প্রসারের জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। এ সংকট মোচনের জন্য তিনি লুটের মালকে (নারী সহ) কোরআন মারফত বৈধ করেছেন (দেখুন : কোরআন ৮ঃ৬৯)। বিধান দিয়েছেন, যুদ্ধবন্দী মহিলাদের সাথে অবাধে যৌন সঙ্গম করা যাবে (দেখুনঃ কোরআন ২৩:৫,৬ এবং মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৪৩)। এর হেতু ছিল। প্রকৃতিগত ভাবে অধিকাংশ মানুষ সহ সকল প্রাণীই ইন্দ্রিয়পরায়ণ। নবী মহম্মদ নিজেও তা-ই ছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের এই দুর্বল দিকটির সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ভিন্নতর অবস্থায় যারা সেই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাকে চিরকালীন ধর্মীয় রূপ দিতে তৎপর তারা নিশ্চিত ভাবে অবিবেচক।

মানুষ মাত্রেরই কম বেশী ভুল হয়। মহম্মদ যত অসাধারণই হোন তিনি মানুষই ছিলেন। সুতরাং ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না তিনি। সেই ভুলের প্রমাণ — তাঁর প্রচারিত ধর্মে পরধর্মবিদ্বেষ, যৌনতা ইত্যাদির প্রাধান্য দেওয়া। অনেক নিরপেক্ষ চিন্তাবিদ এই মত প্রকাশ করেছেন।

হিজরত করার পূর্বে মক্কায় থেকে নবী মহম্মদ যে নরম পন্থায় ধর্ম প্রচার করছিলেন সেটা তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন একটা অপছন্দের কৌশল এটা বোঝা যায় হিজরত পরবর্তী তাঁর জীবনের কার্যধারা লক্ষ করলে। তিনি মদীনায় গিয়ে সামরিক শক্তি অর্জন করেছিলেন এবং সেটাই ছিল তাঁর উদ্ভাবিত ইসলাম ধর্ম বিস্তারের প্রধান কৌশল। কোরআনের 'মক্কী' ও 'মদনী' সূরাগুলি-তে এ লক্ষণ পরিস্ফুট।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাকালীন মহম্মদের পক্ষে লোকবল ছিল না। সুতরাং জোর দিয়ে কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই মক্কী সূরাগুলির বক্তব্য নরমপন্থী ও আপোসমূলক। কিন্তু মদীনায় যাওয়ার পরে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে তাঁর শিষ্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি একটা শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত হন। ফলে মদনী সূরাগুলিতে তার প্রতিফলন ঘটে। এবং ওগুলি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। কোরআনের 'মক্কী' ও 'মদনী' সূরাগুলির এই চরিত্রগত পরিবর্তন নবী মহম্মদের প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। আমরা নিচে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ হিসাবে 'মক্কী' ও 'মদনী' সূরা থেকে মাত্র কয়েকটি আয়াত তুলনামূলক বিচারের জন্য উদ্ধৃত করছি—

মক্কী সূরা

১। 'এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি দেবে না, ... (৬:১০৮)

২। '... পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, ... প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তী হয়োনা। (৬:১৫১)

৩। '...আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তুমি মানুষকে সর্তক করবে এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা। ...' (১০:২)

৪। 'ওদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়।' (১০: ৬৫)

৫। 'তোমরা গ্রন্থধারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে - ...' (২৯:৪৬)

৬। ' সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর ...' (২০:১৩০)

৭। '... তোমাকে ওদের জবরদস্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি ...' (৫০:৪৫)

৮। 'লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য

মদনী সূরা

১। ' আর তোমরা তাদের সাতে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত হয়, ...' (২:১৯৩)

২। 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল জানছেন।' (৩: ১৪২)

৩। '... যে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব।' (৪:৭৪)

৪। ' ... যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব, সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর।' (৮:১২)

৫। 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের (অমুসলমান) যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, ...' (৯:৫)

৬। 'তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের লাঞ্ছিত করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন...' (৯:১৪)

৭। 'হে বিশ্বাসীগণ। অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর ...' (৯:১২০)

৮। 'অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের

ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে ওদের পরিহার করে চল।' (৭৩:১০)	সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে, ... ' (৪৭:৪)
৯। 'অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা, ' (৮৮:২১)	৯। 'হে নবী! সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর ওদের প্রতি কঠোর হও। ...' (৬৬:৯)
১০। 'সুকৃতিকারীগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, এবং দুষ্কৃতিকারীগণ তো থাকবে জাহান্নামে;' (৮২:১৩,১৪)	১০। '... ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।' (৩৩: ৬১)

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ এক অনাকাঙ্খিত এবং প্রায় নজীরবিহীন ঘটনা। কেবল বাইবেলের পুরাতন নিয়মেই কিছুটা জেহাদ ধর্মী হিংসার কথা আছে। আমরা 'কোরআন ও বাইবেলের মধ্যে মিল' পরিচ্ছেদে তার উদ্ধৃতি দিয়েছি। পৃথিবীতে এ যাবৎ যত ধর্মীয় মহাপুরুষ যথা,বুদ্ধ, মহাবীর, জরথুস্ত্র, কনফুসিয়াস, যীশু, শঙ্করাচার্য, নানক, চৈতন্য, কবির, রামানুজ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি তাঁরা কেউ কি সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি অবলম্বন করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন? ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হয়ে মহম্মদ মক্কা বিজয়ের পর নিজহাতে মক্কার কাবা মন্দিরের দেব-দেবীর মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গেছিলেন। (সম্প্রতি এ ব্যাপারে ইন্টারনেটে একটি ছবিও প্রচারিত হচ্ছে) এর মতো অভদ্র ও নিষ্ঠুর নজীর পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ধর্ম নিজ ঔদার্য ও সৌন্দর্যে মানুষের নিকট গ্রহণীয় হবে, গায়ের জোরে নয়। মক্কাবাসীদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন— এ একটা সর্বৈব মিথ্যা প্রচারণা মাত্র। মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা থেকেই মক্কাবাসীরা বুঝেছিলেন তাদের জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। অতএব, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ছাড়া তাঁদের বাঁচার কোন উপায় ছিল না। তাঁরা তাই করেছেন। তাঁদের হত্যা করার চেয়ে ঐ কৌশলটা যে সহজে কার্যোদ্ধারের পথ তা বোঝার মত বুদ্ধির অভাব ছিল না নবী মহম্মদের।

মদীনায় আসার ছয় বছর পর মহম্মদের শিষ্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় বুঝে তিনি বহু সৈন্য সহ মক্কা অভিযান করেন। কিন্তু মক্কার কয়েক মাইল দূরে 'হোদায়বিয়া' নামক প্রান্তরে মক্কা বাহিনীর সম্মুখীন হলে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ না হয়ে একটি আপোসমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবং তিনি মক্কায় না গিয়ে চুক্তি অনুযায়ী মদীনায় ফিরে আসেন। পরের বছর 'খাইবারের' ইহুদী ও মূতার রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; কিন্তু জয়ী হতে না পেরে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।

তিনি ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে দশ হাজার সৈন্যসহ পুনরায় মক্কা আক্রমণ করে জয়ী হন। অথচ হোদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে কোন পক্ষই যুদ্ধ বিগ্রহ করবে না। এ সন্ধি ভঙ্গের অনুকূলে কোরআনের ৮/৫৮ নং আয়াত বিদ্যমান। পরের বছর তায়েফ ও তাবুক অভিযান করে সফল হন এবং নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী বিবেচনা করে রোম, আবিসিনিয়া, মিশর, পারস্য, সিরিয়া, বাহ্রাইন প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সম্রাটের নিকট ইসলামধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান।

বাইজানটাইন (পূর্ব রোম) সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর নিকট মহম্মদ যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা এরূপ —

পরম মঙ্গলময় ও দয়াল আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)। এই চিঠি বাইজান্টাইন সম্রাট হিরা ক্লিয়াস-এর নিকট আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর দাস মহম্মদের। যে সত্য পথ অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অনন্তর আমি আপনাকে 'ইসলাম' গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি যদি মুসলমান হন, আপনি রক্ষা পাবেন এবং আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। আর আপনি যদি ইসলামের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তবে আপনি আপনার প্রজাকুলকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য পাপী হবেন। এবং আমি আপনাকে আল্লাহ্র বাণী শোনাচ্ছি :

["In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. This letter is from Mahammad the slave of Allah and his apostle to Heraclius, the ruler of the Byzantines. Peace be upon him who follows the right path. Furthermore, I invite you to Islam and if you become a Muslim you will be safe and Allah will double your reward, and if you reject this invitation of Islam you will be committing a sin by misguiding your subjects. And I recite to you Allah's statement :]

(এই অংশে 'সূরা ইমরান' এর ৬৪ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়।)

অপর প্রত্যেক সম্রাটের নিকট ঐ একই ভাষায় চিঠি লিখিয়েছেন তিনি। তাতে নিজেকে আল্লাহর রসুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (... and His apostle) এবং পরোক্ষভাবে চরম হুমকিও দিয়েছেন তাঁদের— '... ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি নির্বিঘ্ন হবেন। (... you will be safe)। এর সঙ্গে প্রলোভনও দেখিয়েছেন এই বলে —'আল্লাহ আপনার পুরস্কার দ্বিগুণ করবেন। (.. and Allah will double your reward)। (দেখুন— 'মোস্তফা চরিত' মৌঃ আক্রাম খাঁ পৃ. ৭৫৬)

মদীনা থেকে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মহম্মদ তাঁর জীবনের সর্বশেষ

হজ্বব্রত উদযাপনের জন্য মক্কার আরাফাত ময়দানে উপস্থিত হন। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণে তিনি তাঁর অনুসারী বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে অনেক উপদেশ দেন এবং ঘোষণা করেন, একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের ভাই। মক্কায় 'হজ্ব' সমাপ্ত করে মদীনায় ফিরে আসার তিন মাস পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বছরের ৮ই জুন তারিখে কয়েক লক্ষ শিষ্য ও বিরাট ইসলামী সাম্রাজ্য পশ্চাতে ফেলে তিনি তাঁর ঘটনাবহুল জীবন থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন।

সমালোচকদের দৃষ্টিতে নবী মহম্মদ

কয়েক লক্ষ শিষ্য ও বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্য ছাড়াও মহানবী রেখে গেলেন কোরআন ও হাদিস। সমালোচকদের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থাবলীর মূল বক্তব্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও ভোগবাদী আদর্শ প্রচার করা, যা পৃথিবীতে অশান্তির আগুন জ্বেলেছে। সমালোচকদের আরও অভিযোগ, কোরআন পৃথিবীর মানুষকে 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' (মুসলমান ও অমুসলমান) এই দু'ভাগে ভাগ করে নিরন্তর দ্বন্দ্বে লিপ্ত রেখেছে। অপর ধর্ম ও ধর্মানুসারীদেরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ করতে শিখিয়েছে। নিরীহ নররক্তে বসুন্ধরাকে প্রতিনিয়ত কলঙ্কিত করছে।

জীবনের শেষ দশ বৎসর মহম্মদ মদীনায় থেকে বারোটি বিয়ে ব্যতীত অনেক দাসী রেখেছিলেন, যারা ছিল ভোগের জন্য বৈধ। কোরআনে এ বৈধতা বিষয়ে সমর্থন আছে ৩৩: ৫০, ৫২ নং আয়াত সমূহে। তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীদের দু'জন (আয়েশা ও মারিয়া কিবতিয়া) বাদে সকলেই হয় বিধবা না হয় তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন। উল্লেখ্য তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে চারজন ছিলেন ইহুদী ও খ্রীষ্টান, যাদের তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিয়ে ছিল (৩য় বিয়ে) শিষ্য আবু বকরের ছয় বৎসরের কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করা। তখন নবীর বয়স ছিল বায়ান্ন বছর। বিয়ের তিন বৎসর পর তিনি এই বিবির সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হন। রসুলের মৃত্যুকালে আয়েশার বয়স ছিল আঠারো/উনিশ বছর। দাসী ও রক্ষিতাদের বাদ দিয়েও তিনি মোট নয়জন স্ত্রীকে বিধবা হিসাবে রেখে গিয়েছিলেন। বিবি খাদিজার গর্ভে মহম্মদের দুই পুত্র — কাসেম ও আবদুল্লা এবং জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা, এই চার কন্যা জন্মলাভ করে। তাছাড়া বিবি মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে মহম্মদের ইব্রাহিম নামে একটি পুত্র জন্মে। (দেখুন ঃ মোঃ সাদাত আলী রচিত 'মহানবী (সঃ) এর বিবাহ')। আর একটি বিয়েও খুব উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে তাঁর প্রাক্তন ক্রীতদাস এবং পরে পোষ্যপুত্র যায়েদের অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করা। অনেকের মতে রূপমুগ্ধ মহম্মদের মনের বাসনা বুঝে যায়েদ তাঁর পালক পিতার সুবিধার্থে স্ত্রী জয়নবকে তালাক দেন। তারপর মহম্মদ তাকে বিয়ে করেন। এবং খুবই মজার ব্যাপার যে, নবীর এই একান্ত ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যই বিয়ের পর পরই কোরআনের

৩৩: ৩৭ নং আয়াতটি আল্লাহ্ প্রেরণ করে নবীর পথকে বৈধতা দেন। যা হোক, এটা খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে, যদিও ইসলাম ধর্মানুযায়ী বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা রমণী বিবাহযোগ্যা এবং তিনি নিজে অনুরূপ বিয়েই বেশী করেছিলেন; কিন্তু তাঁর বিধবা স্ত্রীদের বিয়ের সব পথ বন্ধ করে দিয়ে গেছেন। আক্ষরিক অর্থে কোরআনের নির্দেশ অনুসারেই (৩৩: ৫৩) সে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিধবা বিয়ে বিশেষত যুবতী বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা একটি কল্যাণকর বিধান এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলাম পূর্ব-আরব সমাজেও তা প্রচলিত ছিল। ভারতেও এ প্রথা চালু ছিল। হযরত মহম্মদ নিজের জীবনেও তা গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলমানদের জন্যও বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। অথচ তাঁর নিজের বিধবাদের বিশেষত আয়েশা, জয়নব প্রমুখ ভরা যুবতী কয়েকজন বিধবাদের বিয়ে নিষিদ্ধ করাটা চরম অমানবিক, অযৌক্তিক ও স্বার্থপরতার কাজ হয়েছে বলে সমালোচকরা অভিমত জানিয়েছেন। বিবি আয়েশা ১৮/১৯ বছর বয়স থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৫ বছর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

ইতিহাসে যা লেখা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সত্য হয় না। তার কারণ প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয় না। এজন্য কিছু কিছু তথ্য হারিয়ে বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এবং কিছু কল্পিত ঘটনা যোগ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ঘটনার সাথে জড়িত কারো দ্বারা লিখিত ইতিহাসে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। তৃতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা লিখিত ইতিহাসেও সত্যকে কিছু না কিছু বিকৃত করা স্বাভাবিক। সর্বোপরি চতুর্থতঃ বহু পূর্বের ইতিহাস লিখতে গেলে তো বটেই সমসাময়িক কালের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত বাহ্য ঘটনাবলীর অন্তরালে এমন অনেক সত্য থেকে যায় বা যেতে পারে যা নানা কারণে অনুদঘাটিত থাকে।

নবীর সঙ্গী বা নবী-বিশেষজ্ঞরা হাজার হাজার হাদিস (নবীর বিধান) সংকলন করেছেন। আমরা এখানে প্রধান ৬ জন হাদিস সংকলকের নাম উল্লেখ করছি। এই ছয়জন বিশেষজ্ঞের সংকলন নির্ভরযোগ্য বলে মুসলিম দুনিয়ায় স্বীকৃত। এঁরা হলেন—

১। ইমাম বুখারী (হিঃ ১৯৪ - ২৫৬)
২। ইমাম মুসলিম (হিঃ ২০৪-২৬১)
৩। সুনান ইবনে মাজাহ্ (হিঃ ২০৯-২৭৩)
৪। সুনান আবু দাউদ (হিঃ ২০২-২৭৫)
৫। জামি আল তিরমিজি (হিঃ ২০৯-২৮৯)
৬। সুনান আল নিসাই (হিঃ ২১০-৩০৩)

নবী মহম্মদের মৃত্যু হয় একাদশ হিজরীর রবিউল আউওল মাসের ১ তারিখ, সোমবার (মোস্তফা-চরিত)। এতে লক্ষ করা যায় নবীর মৃত্যুর পর হাদিস সংকলকদের মৃত্যু হয় যথাক্রমে ২৪৫, ২৫০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮ ও ২৯২ বছর পর (হিজরী সনের

হিসাবে)। অতএব, গড়ে আড়াইশ' বছর (প্রায়) পর যে সব হাদিস সংকলিত হয়েছিল তাদের নির্ভুলতা বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় কি? সে জন্যেই বলেছি— ইতিহাসে যা লেখা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সত্য হয় না।

হযরত মহম্মদের জীবনী লেখা হয়েছে প্রধানতঃ হাদিস সমূহকে ভিত্তি করে। এই জীবনী তাঁর শিষ্য তথা তাঁর অনুসারী মুসলমানরাই প্রথমে লিখেছেন। সুতরাং তাতে নবীর দোষত্রুটির উল্লেখ না থাকারই কথা। যেমন, যুদ্ধ, লুণ্ঠন, যুদ্ধ-বন্দী হত্যা, বহুবিবাহ, দাসীদের সাথে যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে রেখে ঢেকে বলা এবং যত হাস্যকর ও অযৌক্তিকই হোক, সে সবের অনুকূল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনে ওসবের সমর্থনে বিভিন্ন বাণী আছে। আমাদের এই বই-এর যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অপর পক্ষে বিরাট সংখ্যক মুসলিম পণ্ডিত এরূপ অভিযোগ করে থাকেন যে, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী যারা মহম্মদের জীবনী পরবর্তীকালে লিখেছেন, তাঁরা নাকি অনেক মিথ্যা কথা লিখে মহম্মদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। যাহোক, বিবি খাদিজার মৃত্যু পর্যন্ত মহম্মদ তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স অবধি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। এটা তাঁর চারিত্রিক সংযমের উদাহরণ হিসেবে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে — তাহলে বায়ান্ন হতে ষাট বছর বয়সের মধ্যে নয় বছরে তিনি বারোটি বিয়ে করেছিলেন কোন্ সংযমের পরিচয় দিতে? তাছাড়া ভোগের জন্য দাসীও তাঁর অনেক ছিল।

বহু বিবাহ সাধারণত সমাজে প্রশংসার কাজ বলে গণ্য হয় না। তাই রসুলের বহুবিবাহকে যুক্তিপূর্ণ ও মহান কাজ বলে প্রচার করতে তাঁর অনুসারী জীবনীকারদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাঁরা বলেন— রসুল নিজের প্রয়োজনে বহুবিবাহ করেননি, বরঞ্চ কোন ক্ষেত্রে অসহায়া বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তাদের উদ্ধারের অজুহাতে, কোথাও ধর্ম বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, কখনও কনে বা কনের পিতার আকাঙ্খা পূরণে দয়া পরবশ হয়ে রসুল তা করেছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে— মক্কা-মদীনা বা আরবের দুঃস্থ বিধবা বা তালাক প্রাপ্তাদের সকলকেই তিনি কি বিয়ে করেছিলেন? তাছাড়া এসব বর্ণনা যে সঠিক নয় তার প্রমাণ খুঁজলেই পাওয়া যায়। যেমন — গোলাম মোস্তফা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "বিশ্ব-নবী"র ১০০ নং পৃষ্ঠায় (নূতন ভারতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৮৫) লিখেছেন, "আবু বক্করের সাধ ঃ আল্লাহর রসুলের সহিত তিনি রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাই বিবাহের বয়স না হইলেও তিনি তদীয় কন্যা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য হযরতকে অনুরোধ করেন। হযরত আবু বক্করের এ বাসনা পূর্ণ করেন।" তিনি এ তথ্য কোথায় পেয়েছেন সে সূত্রের উল্লেখ করেননি। কিন্তু হাদিসে বলা হয়েছে — Narrated Urwa : The Prophet (PBH) asked Abu Bakr for Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said, "But I am your brother." The prophet (PBH) said, "you are my brother in Allah's

religion and his book but she (Aisha) is lawful for me to marry." [Al-BUKHARI, VOL VII, Page-12, II Chapter.]

অর্থাৎ উরওয়া বর্ণনা করছেন ঃ রসুল (দঃ) আবুবকরের নিকট আয়েশাকে বিয়ে করতে চাইলেন। আবুবকর উত্তরে বললেন, কিন্তু আমি যে আপনার ভাই। রসুল (দঃ) বললেন, আল্লার ধর্ম ও কিতাব অনুযায়ী তুমি আমার ভাই হলেও সে (আয়েশা) আমার বিয়ের জন্য বৈধ।

একই ঘটনার এই যে দু'টি বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, এ ব্যাপার সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মহম্মদের এরূপ ১৩-টি বিয়ে ছাড়াও দাসীদের সাথে যৌন সম্পর্ক দ্বারা তাঁর নিজের যৌন বৈচিত্র্যের সাধ যতই মিটুক; কিন্তু ওসব রমণী যারা অনেকেই যুবতী ছিলেন তাদের যৌন ক্ষুধা মিটানোর প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। এটা তাঁর নারীদের প্রতি চরম অবহেলা ও নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থপরতার পরিচায়ক বলে অনেকে মনে করেন। আরও একটি প্রশ্ন— তাঁর বহু বিবাহের সপক্ষে যে-সব যুক্তি তাঁর অনুসারীরা দেখান, সেইসব যুক্তি খাদিজার জীবদ্দশাতেও ছিল; কিন্তু তখন তিনি তা করেননি কেন?

খাদিজার জীবদ্দশায় মহম্মদ যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি সেজন্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা মত নবীকে সংযত চরিত্রের মানুষ বলে মেনে নেওয়া যেত যদি তিনি পরবর্তীকালে আর বিয়েই না করতেন কিংবা খাদিজার গর্ভজাত অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ও তাঁর সংসার দেখবার অজুহাতে আর একটি মাত্র বিয়ে (বিবি সওদার সাথে) করেই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সুতরাং মহম্মদ বিবি সওদাকে বিয়ের পরও (যদিও দৈহিক ভোগের জন্য বৈধ দাসীদের অভাব ছিল না) অল্প সময়ের ব্যবধানে পঞ্চান্ন-ষাট বছর বয়সে আরও এগারটি বিয়ে করে সংযম পালন করেছিলেন— এ যুক্তি কেউ মানবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। আর এতগুলি বিয়ে দ্বারা যদি তাঁর নারী বৈচিত্র্য ভোগ প্রমাণিতই হল, তবে খাদিজার জীবিতকালে দ্বিতীয় বিয়ে না করার ব্যাখ্যাটা সহজেই করা যায়। মহম্মদ নিজে নিতান্তই দরিদ্র ছিলেন। খাদিজাকে বিয়ে করেই তিনি খাওয়া পরার চিন্তা হতে মুক্ত হয়েছিলেন — এটা ঐতিহাসিক সত্য। এমতাবস্থায় একমাত্র সহায় বিত্তশালী ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্না স্ত্রী খাদিজার অমতে বিয়ে করলে তাঁর বিরাগভাজন ও আশ্রয়চ্যুত হয়ে পুনরায় পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এটা বুঝবার মত বুদ্ধির অভাব নবীর ছিল না। কাজেই সেই দুর্বুদ্ধি তাঁর হয়নি। এটা তাঁর চারিত্রিক সংযমের পরিচয় নয়। বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলেই ধরা যায়। আর পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত ছোটবড় যে কোন মাপের হোক, কোন ধর্মীয় পুরুষ এতগুলি বিয়ে করেছেন এমন নজীর আছে বলে আমরা জানি না। মুসলমান ঐতিহাসিকরা রসুলের বিয়ে নিয়ে আরও সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এসব যুক্তি যারা দেন তাদের মাথায় কেন এ কথাটা আসে না যে, ওসব ব্যাখ্যা সাধারণ

বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও বিশ্বাস করবে না। বস্তুতঃ ভক্তির প্রাবল্যেই হোক কিংবা অন্য কোন মতলবেই হোক, এ মিথ্যা ঢাক পিটিয়ে তাঁরা নিজেরাই হাস্যাস্পদ হচ্ছেন। অবশ্য অন্ধ ভক্তি যাদের প্রবল তাদের কথা আলাদা। তাদের কাছে কোন কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। কেননা তারা তো 'বিশ্বাসী' নামেই পরিচিত। সে যা হোক, একথা একান্তই সত্য যে, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই হোক কিংবা রাজনৈতিক বা দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্যই হোক একজন ধর্ম প্রচারকের পক্ষে তো বটেই ঐ বয়সের সাধারণ লোকের পক্ষেও অতগুলি বিয়ে করা (একই সময়ে) মোটেই সঙ্গত বা শোভন নয় — অধিকাংশ সমালোচক এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। বিয়ের নামে উদ্ভট পাগলামী করে যারা রেকর্ড করে গেছেন, তাদের মধ্যে হযরত মহম্মদ একক ও তুলনাহীন। তবে তিনি অত্যন্ত চতুর ও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, লোক চরিত্র অভিজ্ঞ দূরদর্শী এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন— এ কথা স্বীকার করলেও তিনি আদর্শ মানুষ ছিলেন, এমন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মন্তব্য খুঁজে পাননি সমালোচকরা।

হযরত মহম্মদ কোরআনের দোহাই দিয়ে তাঁর পূর্বের ও পরের সকল ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র বকলমে বলে গেছেন — "...আজ তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম..." (৫: ৩)। তিনি একমাত্র ইসলাম ধর্মকেই সর্বতোভাবে মানুষের সততার মাপকাঠি বলে নির্ধারণ করে গেছেন। তিনি যেন তদ্দ্বারা সকল মানুষকে মানবতা, আধ্যাত্মিকতা ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেমের পথে নয়, বরং নামাজ, রোজা ও জেহাদের পথ ধরে জান্নাতে গিয়ে অনন্তকাল সুখাদ্য খাওয়া ও অপরূপা চিরযৌবনা কুমারী হুরীদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনে লিপ্ত হওয়া সহ সব রকম দৈহিক সুখভোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার (কোরআনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রলোভন' পরিচ্ছেদ দেখুন) কর্তৃত্ব নিয়েছিলেন। এবং শুধু এখানেই শেষ নয়। সেই কর্তৃত্ব তাঁর অনুসারী মুসলমানদের হাতে অর্পণ করেও গেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে বিদায় হজ্বের সময়ে আরাফাতের ময়দানে তাঁর শেষ ভাষণে তিনি বলেছিলেন— "প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই ...।" কিন্তু বলেননি যে, এক মানুষ আর এক মানুষের ভাই। হিংসার বীজ এভাবেই তিনি রোপন করে গেলেন বলে আজ বুদ্ধিজীবী মহল অভিযোগ তুলেছেন। অপরপক্ষে ভারতীয় দার্শনিক-ঋষি তাঁরও অনেক আগে উপনিষদের মাধ্যমে মানুষকে "হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা শোনো ..." (শ্বেতাশ্বতর ২৪: ৫) বাণী দ্বারা আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের আর এক পুরোধা মহামতি বুদ্ধ বলেছেন— "সকলেই সুখী হোক, সকলেই নিরাময় লাভ করুক।" সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বা মহম্মদ কিন্তু একবারও এঁদের নাম নেননি। ফলে অন্তত আক্ষরিক অর্থে ইসলাম মেনে চলা অন্ধ বিশ্বাসী মুসলমানদের হিংসামূলক তৎপরতায় হযরত মহম্মদের সময় হতে যতদিন ইসলামের নীতি তথা কোরআন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে ততদিন অমুসলমান নারীদের সম্ভ্রম হানিতে ও

নররক্তে পৃথিবী কলুষিত হবে। শান্তির নামে, ধর্মের নামে অশান্তির আগুনে শ্রীময়ী ধরণী ছারখার হতেই থাকবে বলে আজ দিকে দিকে অভিযোগ উঠেছে।

মহম্মদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন বলেই তিনি তাঁর সমাজ-সংস্কৃতি, প্রচলিত রীতিনীতি, গোষ্ঠী ও ভাষাগত গৌরব, পূর্ববর্তী নবীদের বিশেষত মুসা, জরথুস্ত্র, যীশুর প্রচারিত ধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে নূতন কিছু বলতে যাননি। বস্তুতঃ ইরানের জরথুস্ত্র, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মে উল্লেখিত একেশ্বরবাদিতা, নবীত্বের দাবি, বিশ্বের মালিকানা ঈশ্বর ও রসুলের, প্রতিমা পূজা বিরোধিতা, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, পাপপুণ্যের হিসাব, স্বর্গ-নরক ভোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত ইসলামতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত মোঃ আকরাম খাঁ তাঁর কিতাব 'মোস্তফা চরিত' (নতুন ভারতীয় সংস্করণ, মে ১৯৮৭) বইয়ের ১৮০ হতে ১৮৩ নং পৃষ্ঠায় আরব ও ইসরাইলীদের মধ্যে প্রাক-ইসলামিক যুগেও অনেক ধর্মীয় রীতি-নীতি বা আচার অনুষ্ঠানের মিল ছিল বলে তার নয়টি উদাহরণের সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। সে সঙ্গে তিনি (মহম্মদ) যোগ করেছিলেন প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, জেহাদ ইত্যাদি নীতিগুলোকে। আর একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে, 'বাইবেল' বলে যা প্রচারিত (নূতন নিয়ম) তা কিছু ব্যক্তি যথা— মথি, মার্ক, লূক, যোহন ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিত কিছু ঘটনা, পরামর্শ ও উপদেশ হলেও কোরআনকে মহম্মদ বার বার আল্লাহর বাণী বলেই প্রচার করে গেছেন, যদিও তাঁর এ দাবি কিছুতেই সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের মতামত দিয়েছি 'কোরআন প্রকৃতই কার বাণী' পরিচ্ছেদে। মানুষের ভোগ-চেতনা ও অজ্ঞতাকে মূলধন করে সমরনীতি ও রাজনীতির সাথে ধর্মকে মিশিয়ে যে বিচিত্র মিশ্রণ প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত (?) মহম্মদ সেকালের সরল, উগ্র, অমার্জিত আরবদের উপহার দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর চাতুর্যের বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু অনেক কাল মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা সম্ভব হলেও চিরকালের জন্য তা কার্যকরী হতে পারে না। তাই কোরআন তথা মহম্মদের হিংসা নীতি, যুগের অনুপযোগী বিধিনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্বের মানবতাবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মনীষীগণ (কিছু মুসলমানসহ) বিরূপ মন্তব্য করে আসছেন এবং ইদানীং ইসলাম ধর্ম সংস্কারের কথাও উঠেছে। আমরা নবী মহম্মদের আরও একটি অনৈতিক কাজের উল্লেখ এখানে করছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পণ্ডিত রামস্বরূপ রচিত, "Understanding Islam through Hadis, Religious faith or Fanaticism? Published by Sita Ram Goel, First Indian Reprint 1984" এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, ' 'The Pro-Muslim Arabs believed in many moral values common to all mankind, Muhammad retrieved these values, but gave them a sectarian twist. A Muslim owes everything to the Ummah, very little to others. He has no obligations,

moral or spiritual towards non-Muslims as a part of the human race, except to convert them by sword, spoils and Jizia.' অর্থাৎ 'প্রাক-ইসলাম আরবগণ অনেক নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন, যা সকল মানুষের প্রতি সমান ছিল। মহম্মদ এই মূল্যবোধগুলি গ্রহণ করেছিলেন, তবে এগুলিকে একটা সাম্প্রদায়িক মোচড় (রূপ) দিয়েছিলেন। একজন মুসলমান তার উম্মার (সম্প্রদায়ের) প্রতি সর্ববিষয়ে দায়বদ্ধ থাকলেও অপরের প্রতি একেবারেই নয়। মানবজাতির অংশ অমুসলমানদের প্রতি তার কোন নৈতিক বা আত্মিক দায় নেই, আছে তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরিত করা, লুঠ করা ও জিজিয়া কর আদায়ের অধিকার।' রাম স্বরূপের উপরোক্ত কথাগুলি কঠোর হলেও সত্য বলে মানতেই হবে।

মহম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলেননি।[২] এ খুবই ভাল কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু কোরআনে বর্ণিত সেই একেশ্বর আল্লাহর প্রশংসালিপ্সু হিংসুক ও স্বেচ্ছাচারী চরিত্র এবং তাঁর বাণী বলে মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত কোরআন থেকে প্রেরণা পেয়ে কট্টর ইসলামপন্থীরা যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধর্মান্তরিতকরণ ও হত্যা করে আসছেন, তাকে কি প্রশংসা করা যায়? এমন হিংসা প্রচারকারী গ্রন্থ কি ধর্মপুস্তক হতে পারে?

মহম্মদ যে আল্লাহ্‌র রসুল বা প্রেরিত পুরুষ এটা তাঁর নিজের দাবি এবং মহম্মদ প্রচারিত কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেলেও নাকি 'নবী' বা আল্লাহ্‌র বাণীবাহক হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ আবির্ভাবের কথা আছে এমন দাবি করে থাকেন আধুনিক কালের অনেক মুসলমান পণ্ডিত। যদিও মহম্মদের সময় বা কিছু পরে তিনি নিজে বা অনুসারীদের কেউ অনুরূপ কথা বলেননি। মোঃ আকরাম খাঁ মহম্মদের রসুলত্ব প্রমাণের জন্য বাইবেল (New Testament) হতে উদ্ধৃতি দিলেন— "মরিয়মের পুত্র যীশু যখন কহিলেন, ... এবং আমার পর আহম্মদ নামে যে প্রেরিত পুরুষ (রসুল) আসিবেন তাঁহার (আগমনের) সুসংবাদ প্রদান করিতেছি।" ('মোস্তফা চরিত' পৃঃ-২২৭)। এবং ঐ বইয়েরই ২২৯ নং পৃষ্ঠায় লিখলেন— "বাইবেল পুরাতন নিয়মে 'মোহাম্মদ' নামটি আজও বর্তমান রহিয়াছে।"[৩] আবার ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় তিনি বাইবেলের 'যোহন-১৯' অধ্যায়ের এরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন— "পরে আমি দেখিলাম স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর দেখ শ্বেতবর্ণ একটি অশ্ব, যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি "আমীন ছিদ্দিক" বিশ্বাস্য ও সত্যময় নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করিবেন। ... " ইত্যাদি। আমরা বাইবেলের যোহন লিখিত সুসমাচার ও যোহন লিখিত পত্র তিনটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেও উক্ত উদ্ধৃতি সমূহের সন্ধান পাইনি। বরং যোহন যে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার উল্লেখ আছে 'যোহন লিখিত সুসমাচার'-এর প্রথম অধ্যায়ে। যোহনের ভাষায়— "... যিনি আমার পরে আসিতেছেন, ... আমি তাঁহার জুতার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই।...

আমি দেখিয়াছি আর সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।" যাহোক, আকরাম খাঁ সাহেব যদি তাঁর কথামত অনুরূপ কিছু অন্য কোন বাইবেলে পেয়েও থাকেন, তবে তা প্রামাণ্য বলে আমরা যেমন স্বীকার করতে পারি না, তেমনি তিনিও করেন না। কেননা তাঁর উক্ত গ্রন্থের ১৫৭-১৬৪ নং পৃষ্ঠায় যথেষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত করে বাইবেল পুরাতন ও নূতন উভয় নিয়মের প্রামাণিকতাই তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়— "কিন্তু বাইবেল, বিশেষতঃ তাহার পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক ভিত্তিতে এবং তাহার প্রামাণিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, জগতে অপ্রামাণিক বলিয়া আর কিছুই বাকী থাকে না।" এবং ১৬২-১৬৪ নং পৃষ্ঠায় দীর্ঘ আলোচনা করে বাইবেলের নতুন নিয়ম সম্পর্কে যা বলেছেন, এখানে তাঁর সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। কেবল এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি লিখেছেন— "বাইবেলের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে কতদূর দুর্বল এবং তাহার বর্ণিত বিবরণগুলি যে কিরূপ ভিত্তিহীন উপকথার সমষ্টি আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন।" অথচ আশ্চর্য এই খাঁ সাহেবই তাঁর একই পুস্তকে ঐ অপ্রামাণ্য বাইবেল থেকেই রসুলের আবির্ভাবের সাক্ষ্য যোগাড় করতে দ্বিধা করেননি। আসলে অন্ধভক্তির প্রাবল্যে তিনি যুক্তি বিস্মৃত হয়ে নিজের বিশ্বাসকে অপরের উপর চাপানোর চেষ্টাই করেছেন।

হযরত মহম্মদের জীবন, তাঁর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে এটা খুব স্পষ্ট হবে যে, কোরআন তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন সেখানে ঘটেছে। মূলতঃ তারই গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোরআনকে তিনি সেভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। আল্লাহ্ নিমিত্ত মাত্র।

যে লেখক বন্ধুর নাম 'প্রাক-কথনে' সঙ্গত কারণে উল্লেখ করতে পারিনি, তিনি এ বই প্রকাশিত হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে হঠাৎ একদিন বললেন, 'আমার মনে হয় নবী মহম্মদ আসলে সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ্ আছে বলেই বিশ্বাস করতেন না। যদি বিশ্বাস করতেন তাহলে তিনি আল্লাহ্র নামে এমন আজগুবি মিথ্যাচার প্রচার করতে পারতেন না।' বন্ধুর এই কথাটি অতি সত্য এবং চমকপ্রদ। যদিও বিষয়টি নিয়ে আমি সরাসরি না বললেও যা লিখেছি তা ঐ বন্ধুর অনুমানের সপক্ষেই।

মহম্মদ মক্কা তথা আরববাসী (তৎকালীন) সরল, অশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ ও অন্ধবিশ্বাসী লোকগুলিকে যুগপৎ ইহকাল ও পরকালের ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয়ই দেখিয়েছিলেন তা নয়, পাশাপাশি বেহেশ্তের অপরূপ চিরযৌবনা নারীদেহ ভোগের জ্বলন্ত লালসার অনলও তাদের মনে জ্বেলেছিলেন। এবং অন্যান্য দৈহিক সুখভোগের গ্যারান্টিও দিয়েছিলেন। তাতে স্বভাবতই কেউ ভীত ও প্রলুব্ধ না হয়ে পারে না। এভাবেই তিনি প্রধানত নিজের ও কিছুটা মক্কা তথা আরববাসীদের আখের গুছিয়েছেন। যেমন

হিন্দুদের তীর্থের পাণ্ডা ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবঞ্চনার কাজ চালিয়ে যায়। সর্বদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলে কি কেউ এমন কাজ করতে পারে?

আল্লাহ্ থাকুন বা না-ই থাকুন, মহম্মদ নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই আল্লাহ্র নামকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। আজকের পৃথিবীতে মুসলিম শাসকগণ ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলভীদের সাহায্য নিয়ে একই কাজ করে যাচ্ছেন।

মানুষকে মুক্তবুদ্ধি ও মানবিক না করে একটি জঙ্গীদল সৃষ্টি করেছিলেন মহম্মদ। এমন অশ্রেদ্ধয় কাজ করেও তিনি কেন প্রায় সকল মুসলমানের কাছে শ্রদ্ধেয় এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, সাধারণ মানুষ ধর্মনির্বিশেষে বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে যার নাম পারলৌকিক জীবন। ইহ জীবনের কৃতকর্মের ফল সেই জীবনে চরম সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ করতে হবে। ইসলাম ধর্মের প্রধান নির্দেশ, আল্লাহ্ ও রসুল মহম্মদে স্থির বিশ্বাস রাখলে মুসলমানের পরকালে কোন দুঃখ থাকবে না। বরং নারীসম্ভোগ সহ সকল সুখের ব্যবস্থা হবে।

ইসলাম ধর্মের মূল মন্ত্র পাঁচটি কলেমাতেই আল্লাহ্র সাথে মহম্মদ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছেন। অতএব মহম্মদের উপর মুসলমানদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অটুট রাখার কারণগুলি : —

১) আল্লাহ্র বাণী বলে কোরআনের অপরিবর্তনীয় নির্দেশাবলী।

২) বিচারবুদ্ধিবিবর্জিত ধর্মীয় আবেগ।

৩) সামাজিক বা ধর্মীয় ভীতি।

৪) বহুকালের পরম্পরাগত প্রশ্নহীন বিশ্বাস। এবং

৫) ধর্মব্যবসায়ী কিছু সংখ্যক ধান্দাবাজের প্রচার।

আর একটি কথা উল্লেখ্য। মুসলমানরা স্বভাবত মহম্মদের অন্ধভক্ত বলেই তাঁর গুরুত্ব বাড়াবার চেষ্টা করেন। বিশেষত কোন কোন মুসলিম লেখক এ বিষয়ে লাগামছাড়া। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর 'বিশ্ব-নবী' বইয়ের ১৫ নং পৃষ্ঠায় মহম্মদের পূর্বতন পুরুষ আদম হতে ৮৯ পুরুষের একটি তালিকা দিয়েছেন। বহু কারণেই সেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরং হাসির খোরাক। কারণগুলোর কয়েকটি —

১। প্রতি প্রজন্মের বয়সের গড় ২৫ বছর ধরলে প্রায় তেইশ শ' বছরে উননব্বই পুরুষের এ তালিকাটি কারা তৈরী করেছে তার কোন সূত্র নেই এবং এটি অসম্ভব কাজও বটে।

২। বাইবেলের (নতুন সমাচার) মথি লিখিত সুসমাচারে আব্রাহামের পর হতে যীশু পর্যন্ত একটি বংশ তালিকা আছে। তার সাথে গোলাম মোস্তফার তালিকার

নামের মিল নেই। তাছাড়া যীশুর জন্মদাতা পিতা নেই এবং তিনি বিয়েও করেননি বলে তিনি মহম্মদের পূর্ব পুরুষ বা আদমের পরবর্তী পুরুষ হতে পারেন না।

৩। আদমের গল্পটি পৌরাণিক বা ধর্মীয়; ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত নয়।

৪। কোরআনে আদমের পুত্র বলে হাবিল ও কাবিলের উল্লেখ আছে। অথচ তালিকায় তাদের নাম নেই।

৫। আদিম যুগের লোকেরা লেখাপড়া জানত না। সুতরাং এরূপ একটি তালিকা প্রণয়ন কি আদৌ সম্ভব?

অতএব বলা যায় উপরোক্ত বংশ তালিকা দেখিয়ে মহম্মদের মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা একটা ভ্রান্ত পদক্ষেপ মাত্র। মহম্মদের গুরুত্ব ও মর্যাদা তাঁর কর্মের মধ্যেই নিহিত। বংশ পরিচয়ে নয়।

১। মহম্মদ ১০ বৎসর মদীনা বাসকালে ৮২-টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

২। যদিও নিজের বংশ মক্কার কোরেশদের আভিজাত্য সম্পর্কে তাঁর গর্ব ও পক্ষপাতিত্ব ছিল পুরো মাত্রায়। কোরআনে 'সুরা কোরাইশ' (সূরা নং ১০৬) নামে একটি অধ্যায় আছে। তাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। 'সোলেমানের পরম গীত' ৫ম অধ্যায়ের ১০-১৬ পদ। বাইবেল পুরাতন নিয়মের ঐ অংশের বাংলা অনুবাদে 'মোহাম্মদ' নাম নেই।

২॥ কোরআন ও তার সংরক্ষণের ইতিহাস

হযরত মহম্মদ ও মুসলমানদের দাবি আল্লাহ্‌র যে সকল 'ওহী' বা বাণী আরবী ভাষায় জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা মারফত তিনি তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পার হয়ে এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত অর্থাৎ সুদীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর ধরে মক্কায় ও মদীনায় পেয়েছিলেন সেই সব বাণীর সংকলন গ্রন্থই হল কোরআন। এ হচ্ছে 'ইসলাম' ধর্মের মূলগ্রন্থ। কোরআনের বাণী বা 'ওহী' সমূহ সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিষ্যগণ কর্তৃক মহম্মদের নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা কোন সমস্যা উপলক্ষে অবতীর্ণ হত বলে বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিত বা পেছনের কারণকে বলা হয় 'শানে নুজুল'। কোরআন ৩০ খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডকে আরবী ভাষায় বলে 'পারা'। ভিন্ন ভিন্ন নামে ১১৪-টি 'সূরা' অর্থাৎ অধ্যায় কোরআনে আছে। 'রুকু' অর্থাৎ অনুচ্ছেদ আছে ৫৪০-টি (মতভেদ আছে)। 'আয়াত' বা বাক্য আছে ৬৬৬৬-টি (মতভেদ আছে)। বলা হয়ে থাকে কোরআনের সুরা বা অধ্যায়গুলির মধ্যে ৮৭-টি সূরা মক্কায় অবতীর্ণ

হয়েছিল। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলিকে 'মক্কী' বা 'মাক্কী' সূরা বলে এবং মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহকে 'মদনী' বা 'মাদানী' সূরা বলে। মাদানী সূরার সংখ্যা ২৭-টি।

হযরত মহম্মদের তৃতীয় স্ত্রী বিবি আয়েশার বরাত দিয়ে হাদিস গ্রন্থ বোখারী ও মোসলেম শরীফে মহম্মদ কর্তৃক 'ওহী' (আল্লাহ্‌র বাণী) প্রাপ্তির প্রথম দিকের কিছু বর্ণনার উদ্ধৃতি মোঃ আকরাম খাঁ 'মোস্তফা চরিত'-এর ৩১৪-১৫ নং পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। হাদিসে নাকি আছে— "বিবি আয়েশা বলিতেছেন ঃ হযরত প্রথম প্রথম স্বপ্নযোগে 'অহী' বা ভাববাণী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন... তাহার পর তিনি নিভৃতে অবস্থান করিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। ..." হাদিসে আরও যা লেখা আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাতে দেখা যায় খাদ্য ও পানীয় নিয়ে 'হেরা' পর্বত গুহায় নির্জনে কতদিন রাত্রি ধ্যান ও চিন্তায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন। কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর একদিন মহম্মদের বর্ণনানুযায়ী ফেরেশ্‌তা (কোন্ ফেরেশ্‌তা নামোল্লেখ করা হয়নি) আবির্ভূত হয়ে তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা ও তিনবার আলিঙ্গনের পর তাঁকে দিয়ে কোরআনের প্রথম বাণী পাঠ করালেন। তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরে তিনি বিবি খাদিজাকে বললেন তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করতে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আয়েশার কথায় পাওয়া যায়।

আকরাম খাঁ সাহেবের উক্ত বিবরণ পড়ে আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে। ঐ লেখায় বিবি আয়েশা কার মুখে ঐসব বিস্তারিত বর্ণনা শুনেছেন তার উল্লেখ নেই। নিশ্চয় মহম্মদের মৃত্যুর অনেক বছর পর ঐ হাদিস সংগৃহীত হয়েছিল। এবং হাদিস-কর্তা যে আয়েশার মুখ হতেই এসব শুনেছেন তাও নয়। এবং সর্বোপরি 'ওহী' প্রাপ্তির বর্ণিত কাহিনীর বেশ কয়েক বছর পর বিবি আয়েশার জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর এসব কথা এতটা বিস্তারিতভাবে জানার কথা নয়। আশ্চর্য বিবি আয়েশার সাথে মহম্মদের বিয়ের কথা আকরাম খাঁ তাঁর ৮৭১ পৃষ্ঠার বইয়ের কোথাও উল্লেখ করেননি। শুধু তাই নয়, খাদিজা ও সওদা ছাড়া মহম্মদের আরও ১১-টি বিয়ের কথা তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। যা হোক, আমরা নির্ভরযোগ্য অন্যান্য ইতিহাস ও হাদিস থেকে জেনেছি ৫২ বৎসর বয়সে ৬ বৎসর বয়সের আয়েশাকে রসুল বিয়ে করেন এবং আয়েশা ৯ বছর বয়সে স্বামীর ঘর করতে আসেন। এসব মহম্মদের মদীনায় আসার পরের ঘটনা। সুতরাং বোঝাই যায় ১ম 'ওহী' প্রাপ্তির ঘটনার অন্তত ১২/১৪ বছর পর আয়েশা মহম্মদের ঘরে আসেন। তখন খাদিজা জীবিত নেই যে তাঁর মুখে এসব শোনার সুযোগ তিনি পেয়ে থাকবেন। আর স্বামীর মুখে শুনে থাকলেও সেটাকে নিরপেক্ষ বলা যায় কি? অতএব আয়েশার বরাত দিয়ে বর্ণিত ঐ কাহিনী তথ্য নির্ভর বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

হযরত মহম্মদ 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ

তখনকার দিনে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। লিখবার জন্য তখন কাগজ ছিল না (কাগজের প্রথম আবিষ্কার হয় চীনে, সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে)। বিকল্প অন্যান্য উপকরণ, যেমন— পশুর চামড়া, শিলাখণ্ড, পোড়ামাটির প্লেট, গাছের ছাল-পাতা ইত্যাদি যা লিখবার কাজে ব্যবহৃত হত তাও সুবিধাজনক বা সুলভ ছিল না। তদুপরি ঐ সকল বাণী অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিকে অনেক বছর তা লিপিবদ্ধ করার জন্য মহম্মদের তেমন কোন শিষ্যও ছিল না। আর প্রয়োজনও বোধ হয়নি। হযরত মহম্মদ তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রথম দিকের তেরো বছরে অনধিক সত্তর জনকে নিজের মতবাদে এনেছিলেন। অতএব, সহজেই অনুমেয় 'ওহী' প্রাপ্তির প্রথম দিকে তাঁর শিষ্য সংখ্যা যখন ২/৪ জন তখন আলী ব্যতীত কেউ লিখতেই জানতেন না বা জানলেও লিখেছিলেন এমন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নেই। অথচ এ সময়ে বাণী সমূহ অবতীর্ণ হওয়ার বিরাম ছিল না বলেই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং অলিখিত বাণীগুলি হযরত মহম্মদ নিজে অথবা সামান্য দুই একজন অনুসারী যেমন তাঁর প্রথমা স্ত্রী খাদিজা কিংবা জেঠতুতো ভাই আলী (পরবর্তীকালে মেয়ে ফাতিমার স্বামী) ব্যতীত স্মৃতিতে ধরে রাখবার জন্যও কেউ ছিল না। এখানে একথাও মনে রাখা দরকার যে, তখন মহম্মদ দাবিকৃত আল্লাহ্‌র বাণীগুলিকে কেউ বিশ্বাসও করতো না বা পরবর্তীকালে যে এগুলো এতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে এমন ধারণাও কেউ করেনি। 'সূরা কিয়ামাহ' (সূরা নং ৭৫) এর ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে (বাক্যে) হযরত মহম্মদের উদ্দেশ্যে কোরআনে বলা হয়েছে— "তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য তুমি ওহী দ্রুত আবৃত্তি করো না। এ সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অনেকদিন পর্যন্ত বাণীগুলি লিপিবদ্ধ হয়নি। মহম্মদ ও তাঁর দু'চার জন শিষ্যের স্মৃতিনির্ভর হয়েই তা চলছিল। এবং বেশ কিছুকাল পর শিষ্য সংখ্যা বাড়লে তাঁদের মধ্যে একজন লিপিকার পাওয়া গেল। তার নাম যায়েদ-বিন-সাবেত। যখন থেকে বাণী লিপিবদ্ধ করার সুযোগ হল, তখন বাণী প্রাপ্তির কিছু সময় পরে তিনি লিপিকারকে ডেকে পাঠাতেন এবং তিনি এসে তা লিখতেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা কখন থেকে শুরু হয়েছিল তার কোন নির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

'তফসীরে মারেফুল কোরআন', 'তফসীরে নুরুল কোরআন' ও 'ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ' বইগুলোর উপর ভিত্তি করে রচিত একটি প্রবন্ধে ('দৈনিক ইত্তেফাক', ২রা ফাল্গুন, ১৪০০) লুৎফা জাহান এম. এ. যা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তাতে উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধের অধিকাংশ কথাই অত্যন্ত অযৌক্তিক, অবিশ্বাস্য ও আলোচনার অযোগ্য। কেবল একটা তথ্য জানা যায় যে, প্রথম খলিফা' আবু বক্করের সময় প্রথমবার কোরআন সংকলিত হয়।

পরবর্তীকালে ৩য় খলিফা ওসমানের সময় (৬৪৪ খ্রী - ৬৫৬ খ্রী) ইসলামের

প্রভৃত বিস্তৃতি ঘটায় বিভিন্ন দেশে কোরআনের পাঠভেদ বা উচ্চারণ ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং পুনরায় কোরআন সংকলনের উদ্দেশ্যে এতে বিশেষজ্ঞ চারজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। লুৎফা জাহান লিখেছেন— "...হযরত ওসমান অবহিত ছিলেন যে, 'কেরাত' (কোরআন পাঠের বিশেষ উচ্চারণ)[২] পদ্ধতি নিয়ে মদীনা মনোয়ারায়ও কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তিনি তখন সমস্যাটি সমাধানের জন্য তাঁর বিশিষ্ট সাহাবাদের (মহম্মদের সঙ্গী বা সহচর) ডাকলেন এবং তারাও সমস্যাটির আশু সমাধানের সমর্থন জানালেন। তিনি তখন এক গণসমাবেশ ডাকলেন। সমাবেশে তিনি হোযায়ফা (হযরত হোযায়ফা-এবনে-ইয়ামন হযরত ওসমানের সময়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সেনাপতি, যিনি সেসময় আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের 'জেহাদে' অংশ নেন।) উত্থাপিত সমস্যাটি বর্ণনা করে তার আশু সমাধান কল্পে হযরত আবু বক্করের যুগের সংকলিত কোরআনের নোসখাটি (কপি) সংশোধন করার প্রস্তাব দিলেন, আর বললেন, এবারের সংশোধিত কপি একাধিক হবে। ... তিনি তখন কোরআনের বিশেষজ্ঞ বলে মশহুর (বিখ্যাত) নিম্নলিখিত ৪ জনকে নিয়ে একটি কমিটি করে দিলেন— (১) যায়েদ-বিন-সাবেত। তিনি নবীজীর জীবিতকালে ওহী লিপিকার ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু বক্করের সময়ের সংকলনের কর্মকর্তা (২) হযরত আবদুল্লা-ইবনে-জুবায়ের ; (৩) হযরত সাইদ ইবনুল আস এবং (৪) হযরত আবদুর রহমান-এবনে হারিস। ..."

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাছাইয়ের পর সংশোধিত হয়ে ৫/৭টি কপিতে কোরআন দ্বিতীয়বার সংকলিত হয়। সুতরাং প্রথম খলিফা আবু বক্কর ও তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময় দু'বার সংকলন কালে পরীক্ষা, বাছাই, সংশোধন ও পরিশেষে ওসমান কর্তৃক অগ্রহণীয় কপি পোড়ানো থেকে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনের বাণীসমূহে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভুল ভ্রান্তি, মিশ্রণ, পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছিল। এ সম্পর্কে ডঃ গনী উল্লিখিত অনুবাদের পূর্বাভাষের ৬৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন— 'ইসলামের কোন ঘোর শত্রু আজও পর্যন্ত একথা বলতে সাহস করেন না — হযরত ওসমান হতে আজ পর্যন্ত কোরআনের কোথাও এতটুকু বিন্দু বিসর্গ পরিবর্তন হয়েছে। কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করতেন মহানবী হতে হযরত ওসমান পর্যন্ত সময়কালে **হয়ত যদিও বা কিছু ত্রুটি থেকে থাকে**।" কাজেই আল্লাহ্ যে বলেছেন— "এ সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (৭৫: ১৭) তা কীভাবে পালিত হল? এবং আরও একটি প্রশ্ন— আল্লাহ্র ঘোষণার পরেও আবু বক্কর, ওমরের ওই চিন্তাক্লিষ্টতা যে, হাফিজের অভাবে কোরআনের কোন কোন অংশ বিলুপ্ত হয়ে পড়বে কি আল্লাহর বাণীর প্রতি সংশয় নয়?

কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের এ ইতিহাস লুৎফা জাহানের প্রবন্ধে ও ডঃ ওসমান গনীর কোরআন শরীফ অনুবাদের পূর্বাভাষ-এ আছে। যদিও উভয়ের লেখায়

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন— ডঃ গনীকৃত অনুবাদের পূর্বাভাষ- এ কমিটি গঠনের কথা নেই। বরং ওসমান নিজেই আবু বক্করের সময়ের সংকলিত ও বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত কপিটি আনিয়ে বহু খণ্ড কোরআন লিপিবদ্ধ করান— এরূপ উল্লেখ আছে। অপরপক্ষে লুৎফা জাহানের প্রবন্ধে চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের কথা আছে।

'কোরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস প্যাট্রিক হিউজ (Thomas Patrick Hughes) তাঁর Dictionary of Islam-এর ৪৮৩নং পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তার মূল কথা হচ্ছে, হিব্রু ও আরবী শব্দ Qara (কারা) থেকে 'কোরআন' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ পাঠ করা বা আওড়ানো। 'কোরআন' নবী মহম্মদের সময় ছিল না। তবে তিনি ৬১০ খ্রীঃ হতে প্রায় তেইশ বছর ধরে বর্তমান কোরআনের বাণীগুলি প্রচার করেন বলে দাবি করা হয়। অথচ ঐ বাণীগুলির বহু আয়াতে 'কিতাব' বা 'কোরআন' শব্দ দুটির উল্লেখ দেখা যায়। তাতে মনে হয় যেন 'কোরআন' গ্রন্থটি আগেই ছিল, যা সত্য নয়। বর্তমানে যে গ্রন্থটিকে কোরআন বলা হয় তা তাঁর মৃত্যুর পর ১ম খলিফা আবু বক্করের সময় প্রথম সংকলিত হয়ে গ্রন্থের রূপ নেয় এবং কোরআন নামে অভিহিত হয়। সুতরাং বর্তমান কোরআনের সকল আয়াত যখন নবীজিই প্রচার করেননি তখন অগ্রন্থিত কিছু আয়াতকে কোরআন বলা যায় না। অতএব অনেকেই মনে করেন সংকলনের সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উক্ত শব্দ দুটি বর্তমান কোরআনে ঢোকানো হয়েছে।

আর একটি কথা, ঐ সময়ে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্র পরিকল্পনা, ধর্ম প্রচার, বিচারকার্য, অনেক দাস-দাসী ও বারোজন বিবি নিয়ে বিরাট সংসারের দায় ইত্যাদি বহনের প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যে নবীর পক্ষে ছয় সহস্রাধিক আয়াত প্রচার করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্নও সুধীবৃন্দের অনেকে তোলেন। এ প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। কোরআন শরীফ যার কথাই হোক না কেন, মানুষ দ্বারাই নানাভাবে রক্ষিত হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় স্মৃতিতে ধারণ করে এবং পরে লিখে রেখে। স্মৃতি অনেক সময়েই বিভ্রমকারী। বিশেষত একজন হতে অন্য জনের নিকট কোন কথা গেলে তার বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন বা ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং কোরআন শরীফের মত বৃহৎ গ্রন্থের পক্ষে অনেক সময়ের ব্যবধানে কিছু মাত্র পরিবর্তন না হওয়া একান্তই অস্বাভাবিক। আর সে ভুল বা পরিবর্তন যে হয়েওছিল তা খলিফা ওসমানের সময় তৎকর্তৃক খলিফা আবু বক্করের সময়কার প্রথম সংকলনটি সহ অন্যান্য আরও অনেক সংগৃহীত কপি পোড়ানো হতেই প্রমাণিত হয়।

ডঃ গনীর অনুবাদের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় আছে— "মহানবী যখনই প্রত্যাদেশ পেতেন সঙ্গে সঙ্গেই সেটিকে তাঁর নির্দেশমত লেখনীযোগে সংরক্ষিত বা লিপিবদ্ধ করা

হতো।" ৭৪ নং পৃষ্ঠায়ও এমন কথাই তিনি লিখেছেন। কিন্তু কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিকে তো তা লিখবার কোন শিষ্যই ছিল না। হযরত নাকি নিজেও লিখতে জানতেন না বা তিনি লিখেছেন এমন কথা কোন ইতিহাসেও নেই। তাহলে ডঃ গনীর বলা এ কথাটা কেমন করে সত্য হতে পারে?

ডঃ ওসমান গনী তাঁর অনুবাদের পূর্বাভাষ-এর ৭৩/৭৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "অনেকে অনেক সময় বলে থাকেন কোরআনের সূরা (অধ্যায়) ও আয়াতের (বাক্য) শ্রেণী বিন্যাস খলিফা ওসমান করেছিলেন, কিন্তু একথা ভিত্তিহীন। কোরআন সম্পর্কে মূলতঃ কেউ কিছুই করেননি, মহানবী ব্যতীত। ... যখনই কোরআন অবতীর্ণ হতো, মহানবী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে কোন একজন কিংবা একের অধিক কোরআন সংগ্রহকারী ও লিপিবদ্ধকারীদের ডেকে পাঠাতেন। বা তাঁরা আসতেন এবং কোন অধ্যায়ে কোন্‌টি কোথায় বসবে, তার সঠিক নির্দেশ দিয়ে দিতেন। অন্য নির্দেশ দিতেন— 'কোরআন ঠিক যেভাবে যেটির পর যেটি আসছে ঠিক সেইভাবে তাদের সাজিয়ে রাখতে। তাই বর্তমানে আমরা কোরআন শরীফের সূরা (অধ্যায়) গুলোর দু'টো সংখ্যা পাই— একটি প্রত্যাদেশের ধারাবাহিক সংখ্যা এবং অন্যটি কোরআনের বিষয়বস্তু অনুযায়ী সংখ্যা। বর্তমান কোরআন বিষয়বস্তু নির্ভর সাজানো।"

এখন ডঃ গনীর উল্লিখিত কথাগুলো সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রাখা যাক। প্রথম প্রশ্ন— কোরআনের সূরা ও আয়াতের শ্রেণী বিন্যাস খলিফা ওসমান করেছিলেন বলে যে বিভিন্ন জনের মত আছে তা ডঃ গনী ভিত্তিহীন বললেন কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে? বোঝা যায়, তথ্য নেই বলেই বিভিন্ন জন ওসমানকে সূরা ও আয়াতের শ্রেণীবিন্যাসকারী বলেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন— "... কোরআন ঠিক যেভাবে যেটির পর যেটি আসছে ঠিক সেভাবে তাদের সাজিয়ে রাখতে" যদি নবী নির্দেশ দিতেন (বিষয়বস্তু অনুযায়ী সাজানোর কথা হয়নি) তবে বর্তমানে সূরাগুলোর দু'টো সংখ্যা পাই কেন? নবী তো বিষয়বস্তু অনুযায়ী সাজাতে বলেননি। তৃতীয় প্রশ্ন— বিষয়বস্তু অনুযায়ী সাজানোর ব্যাপারে কি তাহলে বাণীপ্রেরণকারীর খেয়াল ছিল না? থাকলে তিনি তা করলেন না কেন? এতে বোঝা যায় নাকি যে, এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না? চতুর্থ প্রশ্ন— সমগ্র কোরআন পাঠ করলে কি বোঝা যায় যে, সূরাগুলো প্রকৃতই বিষয়বস্তু অনুযায়ী সঠিকভাবে সজ্জিত? সচেতন পাঠক দেখবেন, অনেক সূরার মধ্যে পারম্পর্য তো দূরে থাক অনেক সূরার অন্তর্গত আয়াতগুলির মধ্যেই ভাবের সংগতি রক্ষিত হয়নি। পরে এ বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে। পঞ্চম প্রশ্ন— ১১৪-টি সূরার বিষয়বস্তু কি তাহলে ১১৪ প্রকার? ডঃ গনীর এসব যুক্তি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনমাত্র, যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

অতএব নানাভাবে স্পষ্ট হল যে, দু'বার কোরআন সংকলনের সময় এর কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছিল এবং বাণীসমূহ প্রাপ্তির ও কালানুক্রমিকতা রক্ষিত

হয়নি। এমনকি আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা আগে যা ছিল তা সংকলকদের বিবেচনামত পরিবর্তন করাতে প্রাসঙ্গিকতারও বদল হয়েছে। ফলে কোরআনের আয়াতগুলির প্রসঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে খাপছাড়া ও অপ্রাসঙ্গিক বলে স্পষ্ট ধরা যায়। কিন্তু এতক্ষণ আমরা কোরআন সংরক্ষণের যে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলাম তাতে এর অভ্রান্ততা বা অপরিবর্তনীয়তার কোন নিশ্চয়তা পাওয়া গেল কি?

১। হযরত মহম্মদের মৃত্যুর পর যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হতেন তাদের 'খলিফা' বলা হয়। এরূপ প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বক্কর। (৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ)
২। উদ্ধৃতির মধ্যে বন্ধনীতে দেওয়া মন্তব্য লেখকের।

৩॥ সূরা ও আয়াত সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলা

কোরআন শরীফের সূরাগুলির ক্রমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওদের আদি ও বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা এক নয়। কিন্তু কেন নয় তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে ৩৮ নং, ৪১নং, ৭১নং, ৮২নং সূরাগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় ওগুলির আদি ও বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা অভিন্ন। এর কারণই বা কী? আবার দেখা যায় সূরাগুলির নাম যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি তাদের আদি বা বর্তমান ক্রমিক সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। অথচ ভিন্ন ভিন্ন নামের হলেও কোন কোন দু'টি সূরার আদি ক্রমিক সংখ্যা এক। যেমন— 'সূরা ফালাক' ও 'সূরা নাস্' উভয়ের আদি ক্রমিক সংখ্যা-২১। অনুরূপভাবে 'সূরা ইয়াসিন' ও 'সূরা হা-মীমআস সিজদাহ'-এ দু'টি সূরার আদি ক্রমিক সংখ্যা-৪১। 'সূরা আন আম' ও 'সূরা ত্বা-হা' উভয়ের আদি ক্রমিক সংখ্যা-৪৫। 'সূরা নমল' ও 'সূরা ক্বাসাস' উভয়ের আদি ক্রমিক সংখ্যা-৪৮। 'সূরা ইউসুফ' ও 'সূরা ফাত্বির' উভয়ের আদি ক্রমিক সংখ্যা-৫৩। অপরপক্ষে আদি সূরার ক্রমিক সংখ্যা ২০, ৪৩, ৪৯, ৫৫ ও ৬১ কোরআনে অনুপস্থিত(ডঃ গনীকৃত অনুবাদের সূরার ধারাবাহিক সূচীপত্র, পৃঃ ৩৫,৩৬)। এগুলি কি শৃঙ্খলার নমুনা?

'সূরা মুতাফ্ ফিফীন' যার আদি ক্রমিক সংখ্যা ৮৬ এবং বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা ৮৩ মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী সূরাগুলি মদীনায় অবতীর্ণ হতে থাকে। যেমন 'সূরা বাকারাহ'-এর আদি ক্রমিক সংখ্যা ৮৭, বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা-২ মদীনায় অবতীর্ণ। তাহলে 'মক্কী' সূরার মোট সংখ্যা-৮৮ কী করে হয়? (ডঃ গনীকৃত অনুবাদ, পৃষ্ঠা-৫১৫-এ উল্লেখিত) যদিও আদি সূরা সংখ্যা ৮৬ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর সকল সূরাই মদীনায় অবতীর্ণ। তথাপি 'সূরা মুজাদালা' (যার আদি সংখ্যা ১০৫ ও বর্তমান সংখ্যা ৫৮) মক্কায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করা হয় (ডঃ গনীর অনুবাদের পৃঃ-৪১২)। এতে কিছুটা সংশয় হয়। যাহোক্, একে সত্য বলে ধরে নিলেও 'মক্কী' সূরার

মোট সংখ্যা-৮৮ হয় না, ৮৭ হয়। হিসাবের এ গোলমালটার কারণও বোঝা যায় না।

মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখিত ‘ সূরা মায়িদার ’ (বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা-৫, আদি সংখ্যা-১১২) ৩নং আয়াতটি হযরত মহম্মদের হজ্বব্রত পালনের সময় মক্কার আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেওয়াকালীন অবতীর্ণ হয় বলে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কাজেই ওকে মদীনায় অবতীর্ণ সূরার মধ্যে স্থান দেওয়া হল কেন? ওকে তো ভিন্ন ‘মক্কী সূরা’ হিসাবেই গণ্য করা উচিত ছিল। ‘সূরা নাসর’ (বর্তমান সংখ্যা ১১০, আদি সংখ্যা-১১৪) এর টীকায় ডঃ গনী লিখেছেন, “ অধিকাংশের মতে মহা কোরআনের এটাই সর্বশেষ সূরা।” (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৯) এখন প্রশ্ন— যে মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অবিরাম দাবি করে আসা হচ্ছে যে, এর প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়, অভ্রান্ত যা নিয়ে কোন সংশয় নেই, সেই গ্রন্থ সম্পর্কে আবার অধিকাংশের মতে বলায় কি সংশয়ের উদ্রেক হচ্ছে না? সযত্ন রক্ষিত এ মহান ঐতিহাসিক গ্রন্থের কোনটা সর্বশেষ সূরা তা নিয়ে মতভেদ হয় কী করে? প্রথম সূরা কোনটি তা নিয়েই বা মতভেদ হয় কেন?

“ ... তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। ...” কথাটি ‘সূরা ক্কাসাস’ (২৮ নং সূরা) এর ৮৫নং আয়াতে আছে। উক্ত সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখিত। তাহলে মক্কায় থেকেই আবার কোন্ স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার কথা বলা হল? এতে মনে হয় সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও অভ্রান্ত কিতাবের একটা ত্রুটিই। তাছাড়া এ বক্তব্যের দ্বারা যদি মক্কায় স্থায়ী ভাবে ফেরানোর কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাও সত্যি হয়নি। কেননা মহম্মদ মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ীভাবে মদীনায়ই ছিলেন।

কোরআন সম্পর্কে কিছু ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যেই মতভেদের অভাব নেই। একটি প্রধান মতভেদ ‘সূরা ফাতিহা’ ‘(সূরা নং-১) নিয়ে। ডঃ গনী উক্ত সূরাটির টীকায় লিখেছেন, “এই সূরাটি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। অধিকাংশের মতে ‘সূরা আলাক’ প্রথমে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন ‘সূরা ফাতেহা’ প্রথমে অবতীর্ণ হয়।” এ বিষয়ে গোলাম মোস্তফা তার ‘বিশ্ব-নবী’ পুস্তকের ৬৬ নং পৃষ্ঠার ফুট-নোটে লিখেছেন—“সূরা ফাতিহার অবতরণ কাল লইয়া কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ তফসীরকারদের (ভাষ্যকার) মতে অবতরণের ক্রম হিসাবে ‘সূরা ফাতিহা’ দ্বিতীয় স্থানীয়।” সুতরাং আমাদের প্রশ্ন— এ মতপার্থক্য কি কোরআনের সঠিক সংরক্ষণ ও তার ইতিহাসের যথাযথ সাক্ষ্য দেয়? এই মতান্তর দেখে কি মনে হয় না এর কালানুক্রমিকতা ইত্যাদি গোলমেলে?

ডঃ গনী নিশ্চয়ই তাঁর অনূদিত ‘কোরআন শরীফ’ গ্রন্থখানি চরম সতর্কতা ও যত্নসহকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। এবং বর্তমান কম্পিউটার ব্যবস্থা ও মুদ্রণ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে তা সত্ত্বেও তাতে যেকোন কারণেই হোক কিছু ভুল-

ত্রুটি থেকেই গেছে। এমতাবস্থায় প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে যখন প্রধানতঃ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই বহুদিন ঐ বিপুলসংখ্যক বাণীগুলি রক্ষিত হচ্ছিল, তখন এর কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ত্রুটি হয়নি— এরূপ দাবি এর অলৌকিকতা কিংবা ঐশী মর্যাদা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে করা হলেও তা বাস্তবসম্মত বলে বিশ্বাস করা যায় কি? যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই নিরপেক্ষ হলে বলবেন, যা-য়-না। তারই প্রমাণ আবু বক্কর ও ওসমানের সময়ে কোরআন শরীফ সংকলন কালে যাচাই বাছাই দ্বারা গ্রহণ, বর্জন ও পুড়িয়ে নষ্ট করার প্রয়োজনের মধ্যেই নিহিত। ওসমান নিজেই আবু বক্করের যুগের কোরআনের কপিটি সংশোধন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন? এবং যাচাই বাছাইর পর তিনি যে সংকলনটি করেছিলেন তাতেও যে পরিবর্তন বা ভুল কিছুই হয়নি এমন কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে, প্রচার করা যেতে পারে, কিন্তু নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করলে প্রকৃতই মর্যাদার বৃদ্ধি হয় না।

মক্কায় অবতীর্ণ বলে কথিত 'সূরা ফোরকান' (২৫নং সূরা) এর প্রথম কয়েকটি আয়াত আল্লাহর নয়, অপর কারো জবানিতে বলা হয়েছে। পরে কোথাও আল্লাহর, কোথাও অপরের ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। যাহোক, ৫নং রুকুর (অনুচ্ছেদ) তিনটি আয়াত এরূপ —

১। "আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।" (৫১ নং আয়াত)

২। "সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না, এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (৫২ নং আয়াত)

৩। "তিনি দুই সমূদ্রকে (একত্রে পাশাপাশি) প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপটির পানি লোনা, খর উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" (৫৩ নং আয়াত)

উল্লিখিত ৫১ ও ৫২ নং আয়াত দু'টি আল্লাহ্র জবানিতে বলা হয়েছে। কিন্তু ৫৩ নং আয়াতটি বলা হয়েছে অপরের ভাষায়। লক্ষণীয় আয়াতগুলির বক্তব্যের বিষয়গুলিতে কোন মিল নেই। এবং স্পষ্ট বোঝা যায় 'সুতরাং' শব্দটি দিয়ে শুরু করা হলেও ৫২নং আয়াতটি কোনভাবেই ৫১ নং আয়াতের সাথে সম্পর্কিত নয়। মনে হয় যেন অন্য কোন স্থান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাছাড়া মক্কী সূরাগুলির আপোসমূলক নরম ভাষার সাথে এই ৫২ নং আয়াত বেমানান। বরঞ্চ 'মদনী' সূরার অনেক কঠোর ভাষার আয়াতের সাথে এর ভাবগত মিল আছে। সুতরাং বলা যায় সংকলন কালে ভ্রমবশতঃ এই সুস্পষ্ট বিশৃঙ্খলাটা ঘটেছে। এমন বিশৃঙ্খলার নমুনা কোরআনে অজস্রবার দেখতে পাওয়া যায়।

আরও একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে। উপরোক্ত ৫৩ নং আয়াতে যে বলা

হয়েছে— 'দুই সমুদ্রের একটির পানি লোনা অপরটি পানি মিষ্ট, সুপেয়'— এই ব্যাপারটি কি ঠিক?

'আয়াত' শব্দটির অর্থ 'বাক্য' তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোরআনের অনেক স্থানেই দেখা যায় একটি আয়াতে কয়েকটি বাক্য রয়েছে। যেমন ৪৭: ৪,৩৮; ২: ২৮৬; ৪: ২৪, ৯১ ইত্যাদি। আয়াত সংখ্যা (কোরআনের) উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ গনী তাঁর অনূদিত কোরআনের ৩৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কোরানে (মতান্তরে) ৬২৪০, ৬২৪৭, ৬২৫০, ৬৮৬০-টি আয়াত আছে।" এবং ৫২৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কোরআনে ৬৬৬৬-টি আয়াত আছে।" কিন্তু তার অনুবাদের সমস্ত সূরার আয়াত সংখ্যা যোগ করে দেখা যায় মোট সংখ্যা হয় ৬২৩৬-টি, যার সাথে তাঁর উল্লেখিত সংখ্যার একটিরও মিল নেই। অভ্রান্ত কোরআনের এ ভ্রান্তির ব্যাখ্যা কেউ করবেন কি?

৪॥ বিভিন্ন ধর্মের মূলপুস্তক ও কোরআন

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু, শক্তি, প্রাণ ও প্রাণী সঠিক কখন কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তার মানববুদ্ধিগ্রাহ্য কোন স্পষ্ট প্রমাণ বা ইতিহাস প্রকৃতির মধ্যে আছে কিনা বা থাকা সম্ভব কিনা মানুষ তা এখনও জানতে পারেনি। আমরা ভাববাদীদের কথা বাদ দিয়েই একথা বলছি। চরাচরে পৃথিবী ছাড়া কোথাও মানুষ বা মানুষের মত উন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা এখনও তা নির্দিষ্ট করে আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং তারা থেকে থাকলেও ভাববাদী ধারণার ঈশ্বর সম্পর্কিত কী চিন্তা ভাবনা করছে তা আমাদের জানার প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবীর মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্টির কর্তা হিসেবে একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শক্তির সন্ধান করে আসছে। বস্তুগতভাবে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এবং যায়নি বলেই তাদের কৌতুহল মেটেনি। ফলে অধিকাংশ মানুষ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সৃষ্টি-কর্তার আসনে যাঁকে বসিয়েছে তারা তাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির ভাষানুযায়ী ঈশ্বর, জিহোবা, গড, আল্লাহ্ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করেছে। বস্তুতঃ অকল্পনীয় অথচ কল্পনার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শক্তিটি (অনাদি-অনন্ত-অরূপ) মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় নয়। সে যাহোক, কল্পনায় অধিকাংশ মানুষ তাকে পেয়ে এবং অবলম্বন করে অথবা কিছু মানুষ তাঁকে বাদ দিয়েই সমাজবদ্ধ হয়ে কাজ চালানো গোছের কিছু রীতি-নীতি বা বিধি-নিয়ম সমাজকে সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে চালু করেছে। ঐ গুলিকে আমরা সহজবোধ্য কথায় 'ধর্ম' বলি। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ট্রেড মার্ক দিয়ে সেগুলি পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, মানবকল্পিত এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত সেই সৃষ্টিকর্তা কখনই এসে কাউকে বলেছেন, "আমি আছি"— এমন বস্তুতান্ত্রিক প্রমাণ পাওয়া যায়

না বা যায়নি। এবং তা সম্ভবও নয়। অতএব সেই কল্পিত ঈশ্বর ইত্যাদি এক না বহু তাও জানার উপায় নেই। বহুর কথা উঠছে এজন্য যে, 'ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম' বলে কিছু লোক প্রচার করলেও ভিন্ন ভিন্ন ট্রেড মার্ক বিশিষ্ট ধর্মগুলির সর্বোচ্চ উপাস্য শক্তিটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুসারীরা এক বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন না। যাহোক, যদি ধরেও নেওয়া যায় আমাদের বর্ণনানুযায়ী না হলেও যেভাবে থাকা সম্ভব আমাদের বুদ্ধি অগ্রাহ্য কোন ভাবেই তিনি আছেন এবং তিনি এক, তবু একথা অবশ্যই মানতে হবে, তাঁর বাণী বলে যত গ্রন্থ আছে তাদের একটিও তা নয়, হতে পারেও না। যদিও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যাকে আমরা বিভিন্ন নাম দিয়েছি, এ যাবৎ তা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র এবং স্বর্গ নরকের ব্যাপারগুলিও তা-ই এবং সে বিশ্বাসের কারণ বোধকরি বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। তথাপি তাঁর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কিছুই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত আস্তিক্যবাদী ধর্মগ্রন্থগুলো যে তাঁর বাণী নয় তা প্রমাণ করা সহজ।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত প্রধান সকল ধর্মই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, পালন, ধ্বংসকর্তা এবং মানুষের সকল কর্মের নিয়ামক, সর্বজ্ঞ, সকল কিছুর সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বত্র বিরাজমান একটি অদৃশ্য শক্তি তা মানুষের দেওয়া যে নামেই হোক, আছে বলে স্বীকার করে। প্রচলিত উক্ত ধর্মগুলির অনুসারীগণ প্রায় সকলেই সাধারণত যে ভাবে উক্ত শক্তির সম্পর্কে বর্ণনা ও ধারণা করেন ঠিক সেভাবেই বাস্তবিক কোন শক্তি আছে কিনা বা থাকা সম্ভব কিনা তা মানববুদ্ধির অগম্য। তবু তা নিয়ে তর্ক আছে এবং সে তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি। আমরা সে তর্কের ব্যর্থ শ্রমে প্রবৃত্ত হবো না। কিন্তু সেই অপ্রমেয় শক্তির বাণী বলে যত গ্রন্থ প্রচলিত আছে সেগুলি যে একটিও তা নয়, একথা আগেই আমরা বলেছি। অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ব্যতীত প্রধান প্রতিটি ধর্মের সকল বিশ্বাসীগণ তাঁদের ধর্মের মূলপুস্তক সমূহকে উক্ত সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে প্রচার করে থাকেন এবং বিশ্বাস করেন। ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণের এ ব্যাপারে একটা বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। তাঁরা তাঁদের ধর্মের মূল পুস্তক কোরআন শরীফকে সৃষ্টিকর্তার বা আল্লাহর একমাত্র অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় বাণী বলে শুধু বিশ্বাস ও প্রচারই করেন না, সে সাথে অন্যান্য সকল ধর্মের মূল পুস্তকগুলিকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে স্বীকারই করেন না। তদুপরি প্রচণ্ড উগ্রতা ও উৎসাহের সাথে সে কথা প্রচারও করেন। কিন্তু তাঁদের মনে কেন কোরআন শরীফের অভ্রান্ততা, অবিকৃতি কিংবা তা প্রকৃতই আল্লাহর বাণী কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না, সেটা সত্যই বিস্ময়ের। অবশ্য একদিক দিয়ে বিস্ময়ের নয়, কেননা অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে তো প্রশ্নহীন করেই রাখে। সত্য ও যুক্তির পথ দেখায় না। এবং দেখায় না যে তার নজীর ও অভিজ্ঞতার অভাব আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবনে নাই। আমি এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসী লোক অনেক দেখেছি। তন্মধ্যে দু'টি লোকের কথা খুবই উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি।

নাম-ধাম প্রকাশ না করে এখানে তাদের কথা বলছি।

প্রথম ঘটনাটি এরূপ — একজন যুবক বি, সি, এস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) পাশ করে সদ্য সরকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ লাভ করেছেন। তার নাম দেওয়া যাক নুরুল আমীন খাঁ। তিনি বক্তা ও আমি শ্রোতা। নুরুল আমীন তাঁর ভগ্নিপতিকে (তিনিও সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত একজন কর্মকর্তা) একদিন প্রশ্ন করলেন, "ভাই সাহেব, কোরআনে আছে সূর্য তার কক্ষপথে ঘোরে এবং পৃথিবী স্থির, অথচ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এখন পরস্পর বিরোধী এ দু'টি বক্তব্যের কোন্‌টি ঠিক? প্রত্যুত্তরে ভাই সাহেব নুরুল আমীনকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কোরআনে সত্যই কি সূর্য ঘোরে এবং পৃথিবী স্থির একথা আছে?" নুরুল আমীন বলেছিলেন, কোরআনে ও কথা আছে তিনি নিজেই দেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাই সাহেব বিনা দ্বিধায় বললেন — "যদি কোরআনে এমন কথা থাকে তবে বিজ্ঞান যাই বলে বলুক, কোরআনের কথাই ঠিক।" নুরুল আমীন প্রগতিবাদী শিক্ষিত যুবক, আধুনিক বিজ্ঞানে তার অটুট বিশ্বাস। তিনি তাঁর উচ্চ শিক্ষিত ভাই সাহেবের ঐ অন্ধ বিশ্বাস প্রসূত জবাব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে অন্ধ বিশ্বাসের নমুনা হিসেবে তিনি ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন। আমিও কম অবাক হইনি।

আর একটা ঘটনার কথা বলছি। বরিশালের (বাংলাদেশ) লামচরী গ্রাম নিবাসী আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের লেখা 'সত্যের সন্ধান' নামে একখানি বই আছে। বইটি বাংলাদেশে সুধী মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার দুঃসাহসিক ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্য। ঐ বইটি আমি একজন স্নাতক ডিগ্রীধারী মুসলিম মহিলাকে পড়বার জন্য দিয়েছিলাম। কিছুটা পড়েই তিনি বইটি আমাকে ফেরত দেন এবং মন্তব্য করেন যে, এ বই পড়লে ঈমান (ধর্মীয় বিশ্বাস) নষ্ট হবে। সেদিনও আমি কম অবাক হইনি। মনে মনে বলেছিলাম, হায়রে ঈমান, তোমার কী মহিমা, সত্য তোমার কাছে হার মেনে যায়! অযৌক্তিক অন্ধ বিশ্বাসের নাম ঈমান! সত্য ও যুক্তিকে অস্বীকার করে সেই 'ঈমানকে' আঁকড়ে থাকার নাম কি ধর্ম? অশিক্ষিতদের কথা বাদ দিচ্ছি, কেননা তাদের চিন্তা-চেতনা হয়ত বিস্তৃত হয়নি, কিন্তু উপরোক্ত দু'টি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, শিক্ষিত অনেকের মনেও ধর্মীয় অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক অন্ধ বিশ্বাস এতটা শেকড় গেড়ে বসেছে যে, বিজ্ঞান ও যুক্তির ক্ষমতাই নেই তাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মনুষ্যজ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত কিছুর অচিন্তনীয় সুপরিচালনা, প্রকৃতির নিয়মের শৃঙ্খলা, জড় ও জীব সৃষ্টির কল্পনাতীত রহস্য ইত্যাদি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে স্বতঃই মানুষ সৃষ্টির পেছনের এক শক্তিকে কল্পনায় এনেছে। এবং অধিকাংশ লোক এই শক্তির অস্তিত্বকে সত্য বলে বিশ্বাসও করেছে। অবশ্য কিছু লোক

তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুসন্ধান করেছে এবং পায়নি বলে তাকে বিশ্বাসও করতে পারেনি বা চায়নি। অথবা সংশয়ে থেকেছে। যারা বিশ্বাস করেছে দেশ ও কাল ভেদে তাদের ঐ বিশ্বাসের মধ্যে রকমফের দেখা গেছে। প্রকৃতির যে নিয়ম অন্তত মানব ও মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল, দেশকাল নির্বিশেষে সর্বজনীন ঈশ্বরের (আমরা যারা বিশ্বাস করি) সৃষ্ট সেই নিয়মের কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না। আলোচনার জন্য মানুষের কথাই ধরা যাক — সর্বত্র ও সর্বকালে তার জন্ম, বৃদ্ধির ক্রম, আহার, নিদ্রা, মৈথুন, পুষ্টি, রোগ, সুস্থতা, হাসি-কান্না, সুখ দুঃখের অনুভূতির কারণ ও প্রকাশের মধ্যে মূলত কোন-পার্থক্য নেই। এসবকে আমরা প্রকৃতির নিয়ম বা ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা বলতে পারি। কিন্তু দেশ-কাল অনুযায়ী মানব প্রবর্তিত নিয়মগুলির যেমন—ভাষা, পোষাক, চিকিৎসা, আবাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এবং তা দেখা যায় প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও। সুতরাং ওগুলোকে আমরা যতই ঈশ্বর প্রবর্তিত বলি না কেন (ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলেও) ধর্মগুলো যে প্রকৃত প্রস্তাবে মানব প্রবর্তিত তার প্রথম প্রমাণ ওগুলোর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য। দ্বিতীয় প্রমাণ মানুষ সহ সকল প্রাণীদের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সাদৃশ্য দেখা যায়। অথচ ধর্মের ব্যাপারে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর বিন্দুমাত্র চিন্তা বা অনুভূতি নেই। ঈশ্বর থাকলে তিনি একজনই আর প্রকৃতির নিয়মের মত তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম একটিই বা একই প্রকারের হত। এবং তা মানতে মানুষের প্রচারণা, চেষ্টা বা দৈহিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হত না। প্রকৃতি পরিচালনায় যে ঈশ্বর আমোঘ নিয়মে অবলীলায় কর্ম নির্বাহ করেন এবং তাতে তাঁর প্রচেষ্টা বোঝা যায় না, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও তা ঈশ্বরের প্রবর্তিত হলে প্রকৃতির নিয়মের মত অনিবার্য, সহজাতভাবে এক হত। কিন্তু তা হয়নি। ধর্ম বুদ্ধিমান, কল্যাণকামী, সমাজবোধ সম্পন্ন কোন কোন মানুষের মেধা, আবেগ ও কল্পনা-প্রসূত সৃজনশীল একটা ব্যাপার মাত্র, একথা সহজে মেনে নিলেই পরমত অসহিষ্ণুতা দূর হতে পারে। 'যত মত তত পথ' বলায় যে ঔদার্য তা-ই মানবপ্রেমের পথকে সুগম করে তার কল্যাণকে নিশ্চিত করতে পারে। দলীয়করণে তা হতে পারে না। ধর্ম মানব প্রবর্তিত হলেও তা কল্যাণমুখী হতে পারে যদি তার দলীয়করণ না হয়।

বস্তুতঃ বিভিন্ন কালে ও দেশে এক শ্রেণীর ধূর্ত ও মতলববাজ কিংবা ভাবাবেশে আবিষ্ট অথবা প্রকৃতই মানব হিতৈষী মনীষী ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার নামে মানুষের ভাষায় ভুল বা শুদ্ধ বিবিধ অনুশাসন চালিয়ে আসছেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন অথবা স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ ওসব কথাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেও প্রচার করে আসছে। প্রকৃত পক্ষে বোবা প্রকৃতি বা তার আড়ালের নিয়ামক শক্তি (যদি কিছু থাকে যেমন— ঈশ্বর) তাঁর নিজস্ব ভাষায়ই (অবশ্যই মানুষের ভাষায় নয়) নিজস্ব

রীতিতে প্রকাশ করছেন এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে, নিয়মকে। আর গভীরভাবে সে নিয়মকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আপ্লুত কোন কোন প্রজ্ঞাবান মানুষ হয়ত নিজের উপলব্ধির সেই সত্যকে প্রকাশ করেন আবেগ মথিত সুললিত তাঁর নিজস্ব ভাষায়, যা পরবর্তীকালে প্রচারিত হয় অভ্রান্ত সত্য বলে, অপৌরুষেয় বাণী বলে। কিন্তু প্রচার ও সে সব বাণীর ঢং যাই হোক, ধর্মগ্রন্থ কোনটাই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়— একথা বাস্তবিক প্রমাণ করা যায়।

মহম্মদ তথা কোরআন সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিকে পৃথক করেছে এবং এ বিযুক্তির পর মহম্মদের মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের যোগাযোগের কোন উপায় নেই। কথাটা কোরআনে বহুবার উল্লেখিত। এ এক আশ্চর্য যুক্তিহীন নিষ্ঠুর তত্ত্ব। মানুষ নবী মহম্মদের সুপারিশ ব্যতীত তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে না কিংবা মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার দাস ও প্রভুর একটি মাত্র দূরত্বব্যঞ্জক সম্পর্ক ছাড়া মানবোপলব্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর কোন সম্পর্ক নেই — একথা প্রচার করেছেন নবী মহম্মদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই। ফলে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক মধুরতম হতে পারেনি।

আল্লাহ্‌র বাণী বলে দাবিকৃত কোরআনের এই তত্ত্বের পাশাপাশি ভারতীয় ঋষি প্রণীত উপনিষদের এই বাণীটি লক্ষণীয়— "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং..." (ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক)। অর্থাৎ জগতের স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে, দূরে রাখেনি। এবং এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের এই অমৃত বাণীতে—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।।

সুফী সাধক শেখ সাদীও যেন কোরআনের কঠোর নিয়মকে আলগা করে জীব প্রেমের এই কথাটিই বলেন— 'তরিকত বজুজ খিদমতে খাল্‌ক্ নিস্ত। বতসবিহ্ ওয়া সজ্জাদা ওয়া দল্‌ক্ নিস্ত।' অর্থাৎ তসবিহ, জায়নামায ও দরবেশী বেশভূষা ধর্ম নয়। জীব সেবাই প্রকৃত ধর্ম। নবী ও কোরআন যদি মানব প্রেমের এই তত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করতেন তবে ধরণীতে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে স্থায়ী অনল প্রবাহ নির্বাপিত হয়ে যেত।

পৃথিবীর কোন একটি মানব গোষ্ঠীর ভাষাই ঈশ্বরের (তর্কের খাতিরে তাঁর অস্তিত্ব মেনেই) একমাত্র ভাষা হতে পারে না। সুতরাং বিশেষ একটি ভাষাতে গ্রন্থিত বাণীই খোদ ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ ঈশ্বর এসে ঐ ভাষায় ঐ কথাগুলি বলেছেন আর পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষী লোকেরা না বুঝেই (তাদের মাতৃভাষা নয় বলে) তা আবৃত্তি করবে এ দাবি প্রকৃতই অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক ও হাস্যকর। কোরআন সম্পর্কেও একথা খাটে না কি? ঈশ্বর কি বিবেচনাহীন ও একদেশদর্শী হতে পারেন? কোরআন প্রচারকারীগণ কী বলতে চান?

৫॥ কোরআন প্রকৃতই কার বাণী

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে কোরআনের পারা (খণ্ড) ও 'সূরা'গুলির (অধ্যায়) নামকরণ কে করেছেন? আল্লাহ করেছেন এমন প্রমাণ কোরআনে নেই। অতএব বোঝা যায় এতে মানুষের হাত আছে। কোরআন অল্লাহর বাণী হলে এর বহুস্থানে সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত্রি, নক্ষত্র ইত্যাদি বহু সৃষ্ট কিছু বা অবস্থার নামে শপথ করা হল কেন? যেমন—"শপথ এই নগরের" (৯০:১) "শপথ সূর্যের ও তার কিরণের।" (৯১:১) "শপথ সিনাই পর্বতের"। (৯৫:২) এবং দেখুন—৩৭:১; ৪৩:২; ৫১:১; ৮৯:১; ৯২:১; ৯৩:১; ১০০:১ ইত্যাদি। স্বয়ং আল্লাহ, যিনি নাকি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা তাঁর আবার শপথ করার দরকারটা কি? এবং তাও আবার তাঁরই সৃষ্ট-বস্তু ইত্যাদির নামে কেন? তবে কি ও সকল তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ? কেননা আমরা তো সাধারণত দেখি মানুষ ঈশ্বর বা দেবতা, যা নাকি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচ্য তার নামেই শপথ করে। আর একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষণীয় যে, ঐ শপথ করা সূরাগুলি মক্কায় রচিত। এ-ও একটি ইঙ্গিতধর্মী বিষয় বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৯১ নং সূরার ('সূরা শামস') ১ নং হতে ৪ নং আয়াত পর্যন্ত শপথগুলি কে করেছে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও ৫ নং হতে ৭ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি পড়লেই বোঝা যায় ওসবের বক্তা আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ। যেমন—"শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর।" (৯১: ৫) আকাশ নির্মাণকারী (আকাশ কি আদৌ নির্মাণ করা যায়?) বলতে নিশ্চয়ই আল্লাহকে বোঝান হয়েছে। তাহলে তাঁর নামে শপথ কে করলেন? মহম্মদ নিজেই না তো? "শপথ <u>তাঁর</u>—যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।" (৯২:৩) শপথকারী নিশ্চয় আল্লাহ নন।

সূরা ফাতিহায় (সূরা নং ১) সাতটি আয়াত আছে। সবগুলি আয়াত স্পষ্টতই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বক্তব্য। যেমন— "সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই।" (১:১) এই বক্তব্য আল্লাহ্র হলে তা উত্তম পুরুষের (First person) জবানিতেই হত। এ সূরাটি সম্পূর্ণই একটি প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের প্রার্থনা। সুতরাং আল্লাহর বাণী নয়। আর যদি ধরা হয় 'সূরা ফাতিহা' আল্লাহর বাণী, তবে আল্লাহরও সৃষ্টিকর্তা আছে প্রমাণিত হয়।

আবার অনেক সূরা কিংবা আয়াতের বক্তব্য বিভিন্ন পুরুষের (person)। যেমন 'সূরা হজ্ব' এর (২২ নং সূরা) ৩৪ নং আয়াতের প্রথম অংশ— "<u>আমি</u> প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মানুষ্ঠান নির্ধারণ করে দিয়েছি ...." অথচ ঐ আয়াতেরই পরবর্তী অংশ— "......<u>তিনি</u> পালিত পশু হতে তাদের যা দান করেছেন, তা হতে যেন তারা <u>আল্লাহ্র</u> পথে দান করে।" এখানে আয়াতটির প্রথম অংশে <u>'আমি'</u> অর্থে বোঝান

হচ্ছে বক্তা আল্লাহ। কিন্তু পরবর্তী অংশে 'তিনি' অর্থে কাকে বোঝায়? নিশ্চয়ই আল্লাহকে, তাহলে একই আয়াতের বক্তব্যে উত্তম পুরুষ ও নাম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার দ্বারা কী বোঝায়? পুরো বাক্যটি কার বক্তব্য?

'সূরা আল ইমরান' (সূরা নং ৩) এর শুরুতেই ঘোষণা—"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবিত ও নিত্য বিরাজমান।" (৩ঃ২) মনে হয় কি এ বাক্যটি আল্লাহর কথা? " তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, ..." (৩:৩) " তিনিই তোমার প্রতি এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, ..." (৩:৭) একটু আগে পরে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বলা যেতে পারে অপ্রয়োজনীয় ভাবে কোন কোন কথার বার বার উল্লেখ কোরআনকে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর করে কলেবর বৃদ্ধি করেছে। যাহোক, আয়াত দুটিতে 'তিনি' অর্থাৎ আল্লাহ এবং তোমার অর্থ মহম্মদের। তাহলে বক্তাটি কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নন।

" ....অবশেষে আমি ওকে চরম সৃষ্টিতে পরিণত করি, অতএব ধন্য সেই আল্লাহ যিনি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা।" (২৩:১৪) এখানে একই আয়াতে 'আমি' অর্থাৎ আল্লাহ আবার 'ধন্য সেই আল্লাহ' এ ধরনের বাক্যের বক্তা কি এক?

'সূরা বাকারাহ'র (২ নং সূরা) ৩৫ নং আয়াত —"এবং আমি বললাম..." এখানে 'আমি' অর্থাৎ আল্লাহ নিজে বলছেন। কিন্তু উক্ত সূরার ৩৭ নং আয়াতে —" অনন্তর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কতিপয় বাণী প্রাপ্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।" এ বাক্যটিতে প্রতিপালক 'আল্লাহ' ও 'তিনি' শব্দগুলি দ্বারা বোঝা যায় বক্তা আল্লাহ্ নন।

"আল্লাহর শপথ, তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট (রসুল) প্রেরণ করেছি, ..." (১৬: ৬৩) এখানে আল্লাহ্র শপথ করে কে রসুল প্রেরণ করেছেন? আল্লাহ্ই কি নিজের নামে শপথ করলেন নাকি অন্য কেউ?

আবার ২ নং সূরার (সূরা বাকারাহ) ২৫৩ নং আয়াত -"এই সকল রসুল, আমি তাদের কারো উপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের কাউকেও পদ মর্যাদায় উন্নত করেছেন এবং আমি মরিয়ম নন্দন ইসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মাযোগে সাহায্য করেছি।" ...এ আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশে উত্তম পুরুষে কথা বলা হয়েছে। তাকে যদি আল্লাহ্র বক্তব্য ধরা হয় তবে মাঝের নিম্ন রেখা সম্বলিত অংশকে কি আল্লাহর বক্তব্য বলে মনে হয়? যদি মনে না হয় তবে একই বাক্যের বক্তা একাধিক হওয়ার কী অর্থ হতে পারে?

"তিনি পবিত্রতম যিনি একদা রাতে তাঁর সেবককে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য ভ্রমণ করিয়েছিলেন—মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার সীমাকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করেছি, যেন আমি তাকে কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি; নিশ্চয়

তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" এ হলো 'সূরা বনি ইসরাইল (১৭ নং সূরা) এর ১ নং আয়াত। এ আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশে 'তিনি' সর্বনামটি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে বোঝাতে অন্য কেউ বলেছে। তাহলে বাক্যের মাঝখানের 'আমি' সর্বনামটি কার উচ্চারণ? এখানেও একই আয়াতে বক্তার বিভিন্নতা দেখা যায়।

'আমি' 'তিনি' নিয়ে এ ধরনের জগাখিচুড়ি ৭ নং সূরার ১১ ও ১২ নং আয়াতে, ২২ নং সূরার ৩৪ ও ৩৭ নং আয়াতে,২৩ নং সূরার ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতেও আছে। তাছাড়া আরও ভুরি ভুরি এরূপ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যার ফলে কোরআনের উক্তিগুলি কার সে বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিই হয়। কোরআনের সমস্ত বক্তব্য আল্লাহ্‌র বলে যে দাবি করা হয় তা কি এর পরেও বিশ্বাসযোগ্য থাকে? উপরের উদ্ধৃত আয়াতগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন কোরআনপন্থীরা? এবং যদি এ সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হল যে, সম্পূর্ণ কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী বলে প্রমাণ করা যায় না, তবে তার অভ্রান্ততা, অতুলনীয়তা, সর্ব মানবের জন্য চিরকালীন ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিও তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে, কিছুতেই টেকে না। তবু এই দিবালোকের মত স্পষ্ট সত্যটা কোটি কোটি মসুলমানদের কারো চোখে না পড়ার কারণ— হয় ভক্তির অন্ধতা অথবা চোখে পড়লেও তা প্রকাশ না করার হেতু অভিসন্ধিপরায়ণতা বা মর্যাদা হানির ভয়। কিন্তু এই যে সত্যকে স্বীকার না করা তা কোনমতেই কারো জন্য (মুসলমানদের জন্যও) কল্যাণকর হতে পারে না। সেটা মুসলমানদেরই আগে বোঝা উচিত।

কোরআনের বাণী বা বক্তব্যগুলি আল্লাহ্‌র না হলে কার? এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। সাম্প্রতিক কালের সাড়া জাগানো পশ্চিমবঙ্গের লেখক পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলাম 'ভূমিপুত্র' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। বইটির নায়ক কামাল এক বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র। সঙ্গত কারণেই মনে হয় লেখক তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা- ভাবনাগুলিই কামালের বোধে ও বক্তব্যে প্রকাশ করেছেন। লেখক বলেছেন—"এর থেকে কামালের মনে হয়, কোরআনে যা বলা আছে তা মহম্মদের কথা।" (ভূমিপুত্র' ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০২; ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশন, পৃ:৪১) এবং কামালের অনুরূপ মনে হওয়ার কারণগুলিও বইটির ৩৯ হতে ৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কারণ। কোরআন নিঃসন্দেহে মহম্মদের গুরুত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা 'কোরআনে মহম্মদের বিশেষ ছাড় ও আল্লাহ্‌র তুল্য গুরুত্ব' শীর্ষক ১৩ নং পরিচ্ছেদে বেশ কয়েকটি সূরার আয়াত সমূহ উদ্ধৃত করে উক্ত বক্তব্যকে স্পষ্ট করবো। তাছাড়া নিম্নে 'সূরা তাকভীর' (৮১ নং) এর কয়েকটি আয়াত তুলে দিচ্ছি যাতে প্রমাণ হয় কোরআন আল্লাহ্‌র নামে মহম্মদের কথা ঃ 18. And the breath of morning, 19. That this is in truth **the word of an honoured messenger,** 20. Mighty, established in the presence of the Lord of

the Throne. 21. (One) to be obeyed, and trustworthy. 22. And your comrade is not mad. (M.M. Pickthall)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ কোরআন পড়েছিলেন, 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিতে "আমি ত কোরআনের কোথাও এমন কথা দেখিতে পাই নাই।" (সুলভ শরৎ সমগ্র-২য় খন্ড, সংস্করণ ১৯৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স পৃঃ ১৯৫০) ঠিক পরের লাইনেই তিনি লিখছেন—"বরং কোরানের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে এই যে একটা উক্তি আছে, মৃত্যুর পর দুষ্কৃতকারীকে ঈশ্বর শাস্তি দেন—তিনি নর-নারীকে প্রভেদ করেন না—তাহা দেখিয়া মনে হয় মহম্মদ নারীর আত্মা অস্বীকার করেন নাই।" শরৎচন্দ্র বললেন, কোরআন মহম্মদের কথা, কোরআন পড়েই তো তিনি একথা বলেছেন।

অন্তত আরও একটি স্পষ্ট প্রমাণ কোরআনেই বর্তমান যে, কোরআন প্রবক্তা মহম্মদ। 'সূরা হুদ' (বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা ১১ আদি সংখ্যা ৫২—মক্কায় অবতীর্ণ) এর ২ নং আয়াত —"তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করোনা, নিশ্চয় আমি তাঁর নিকট হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।" এ আয়াতে উক্ত 'আমি' যে মহম্মদ তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? এর পরেও এই সূরাটির ৭ নং আয়াতের প্রথম অংশ পর্যন্ত পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় বক্তব্য আল্লাহ্র নয়।

" ... আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।" (৫১: ৫০) স্পষ্টতই আয়াতটি আল্লাহ্র বাণী নয়। মহম্মদের কথা।

অতি তুচ্ছ কিছু ব্যতিক্রম বাদে মুসলমানদের দাবি — কোরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি তার দাঁড়ি-কমা পর্যন্ত আল্লাহ্র এবং সেজন্যেই অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সমগ্র কোরআন পড়লে যে কোন সামান্য লেখা-পড়া জানা লোকের নিকটও এ দাবি মিথ্যে বলে মনে হবেই। তার কারণ, এর স্ববিরোধী বাক্য, অবৈজ্ঞানিক তথ্য, আগোছালো বক্তব্য, বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, বিষয়বস্তুর তুচ্ছতা, অগভীর তত্ত্ব, অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা, নীতিবিরোধী কথা এবং সর্বোপরি জটিল রচনারীতি।

৬॥ কোরআনে আল্লাহ্র স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংগতি

কোরআনের বহু জায়গায় মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন—"নিশ্চয় যারা নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী দণ্ডবিধায়ক।" (৩ : ৪) এখানেও বক্তব্যটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বলেই বোঝা যায়। "প্রকৃতপক্ষে ওরাই অবিশ্বাসী, আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রেখেছি।" (৪:১৫১) "এবং যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার

করে তারাই নরকের অধিবাসী, সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে।" (২: ৩৯) উপরোক্ত শেষ দুইটি আয়াত স্পষ্টতই আল্লাহ্‌র ভাষায়। অবশ্য বক্তব্য যার ভাষায়ই হোক কোরআনের আরও বহুস্থানে এ ধরনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, কর্মে মানুষের স্বাধীনতা আছে অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচার করে কাজ করার দায় দায়িত্ব মানুষেরই। মানুষ নিজের ইচ্ছামত আল্লাহ্‌র অবাঞ্ছিত কাজ করলেই তবে সে দায়ী হবে, শাস্তিও পাবে। এ খুবই সংগত ও বিচারসম্মত কথা। কিন্তু আবার কোরআনেরই বহুস্থানে আল্লাহ্‌র অসংগত, বিচারবিরুদ্ধ এবং উল্লিখিত উক্তির বিপরীত বক্তব্য দেখা যায়। সে ধরনের কয়েকটি নমুনা—"...অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। ..." (২:২৮৪) "আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কর্ণ মোহর (সীল) করে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর উপরও আবরণ আছে।,..." (২:৭)

"...আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন— সে-ই সুপথ প্রাপ্ত হয়, এবং যাকে বিভ্রান্ত করেন, ফলত তার জন্য তিনি ব্যতীত কোনই অভিভাবক পাবে না, এবং কিয়ামত দিনে তাদেরকে তাদের মুখের উপর অন্ধ মূক ও বধিররূপে (মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়) সমবেত করব, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম ....." (১৭: ৯৭)

"... আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন ওরা কোরআন বুঝতে না পারে, এবং ওদের বধির করেছি, তুমি ওদের সৎপথে আহবান করলেও ওরা কখনও সৎপথে আসবে না।" (১৮:৫৭)

" আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, আমার এই কথা অবশ্যই সত্য; আমি নিশ্চয় জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (৩২:১৩) (অনুরূপ— ১৮:১৭; ১৩:৩১; ৫৮:১০; ৭৪:৩১; ৮১:২৯ ইত্যাদি)

লক্ষণীয় উল্লিখিত আয়াতগুলির প্রথম কয়েকটি আল্লাহ্‌র জবানিতে নয়। যদিও শেষোক্ত দুটি আল্লাহ্‌র জবানিতেই দেখা যায়। সে যাহোক, বক্তব্যগুলি মোটেই বিচারসম্মত নয়। কেন না আল্লাহই যদি তাঁর ইচ্ছা মত কোন মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন, বিভ্রান্ত করেন বা খেয়ালমত কাউকে সৎপথে পরিচালিত করেন, তবে সে দোষ বা গুণের জন্য মানুষকে দায়ী করে শাস্তি দেওয়া কিংবা পুরস্কৃত করা একেবারেই অযৌক্তিক এবং আল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারিতা বৈ কিছু নয়।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উল্লিখিত ১৭ নং সূরার (সূরা বনি-ইসরাইল) ৯৭ নং আয়াতের বক্তব্য শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র ভাষায় নয়। সেটা নিম্ন রেখা দ্বারা চিহ্নিত 'আল্লাহ্' 'করেন' 'তিনি' ইত্যাদি শব্দ সমষ্টি দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু 'করব' ক্রিয়াপদটি (নিম্নরেখা চিহ্নিত) দেখলে কি মনে হয় না যে, বাক্যটির প্রথম অংশের বক্তার শেষ অংশে পরিবর্তন ঘটেছে? একই বাক্যে এরূপ বক্তার বদলের নমুনা আগেও কিছু দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আরও একটি— "...And if He willed He

could have madc it stillthen We have made the sun its pilot." 25:45 (M. M. Pickthall) একই বাক্যে এরূপ বক্তার পরিবর্তনের কী অর্থ হতে পারে আমাদের মাথায় আসে না। কোরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ এ বিষয়ে কী বলেন?

আমরা জানি 'ফোরকান' শব্দটি কোরআনের আর একটি নাম এবং কোরআন আল্লাহ্ হযরত মহম্মদকেই দিয়েছেন বলে কোরআন তথা ইসলাম ধর্ম দাবি করে (দেখুন- ২৫:১) অন্য কোন নবীকে কোরআন দেওয়া হয়নি। তাহলে কোরআনেরই "এবং যখন আমি মুসাকে কেতাব ও 'ফোরকান' দান করেছিলাম,..." (২: ৫৩) এ কথাটি কীভাবে ঐ কথার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে পারে?

কোরআনে বর্ণিত আছে বিভ্রান্ত সম্প্রদায় দোজখে যখন আগুনে দগ্ধ হবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানাবে (২৩: ৯৯, ১০০,১০৬, ১০৭) তখন "আল্লাহ্ বলবেন— তোরা হীন অবস্থায় ওখানেই থাক, এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস না।" (২৩:১০৮) আল্লাহ্র এরূপ নিষ্ঠুরতার নমুনা কোরআনে অনেক আছে। যে আল্লাহ্কে পরম দয়ালু (রহমানুর রহিম) বলে কোরআনে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে তাঁর এ প্রকার হৃদয়হীনতা কোরআনের অসংগতিরই নজির। ভুল করার পর যদি তা স্বীকার করে অপরাধী মার্জনা চায় তবু তার সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে (অন্তত একবারের জন্যও) চরম শাস্তির ব্যবস্থা নিম্নস্তরের মানুষের আক্রোশের বিষয় হতে পারে; কিন্তু সৃষ্টিকর্তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। তবে এ ধরনের চরমতম ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য যে মুসলমানদের দলে ভারী করার একটা পদ্ধতি সেটা বেশ বোঝা যায়।

'সূরা মায়েদা'র (৫নং সূরা) ৩ নং আয়াতটি আরম্ভ হয়েছে এভাবে— "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত ও শূকর মাংস,.." মাঝখানে— "....আজ অবিশ্বাসীগণ তোমাদের ধর্ম হতে নিরাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না...." এবং শেষে— "...আজ তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম, তবে কেউ পাপাসক্ত না হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" একই আয়াতে বিষয় বস্তুর কোন সংগতি লক্ষ করা গেল কি? অবিশ্বাসীদের ইসলাম ধর্ম হতে নিরাশ হওয়ার সাথে, তাদেরকে ভয় না করার যুক্তিটাও সম্পর্কহীন। আবার ইসলাম ধর্ম মনোনীত করার সাথে "...পাপাসক্ত না হয়ে ...." ইত্যাদির যে যোগাযোগটা কি তাও বোধগম্য নয়। এবং বোঝা যায় না নিম্ন-লিখিত আয়াতগুলির পারম্পর্যও : —"... এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (২:২৫) এর অব্যবহিত পরেই —"নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা কিংবা তদপেক্ষা বৃহত্তর উপমা দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না।..." (২: ২৬) মনে হয় না কি প্রলাপের মত অসংলগ্ন কথা? কিংবা— "এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনদের প্রতি

তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমত দু-দুটো, তিন-তিনটে বা চার-চারটি বিয়ে কর, ..." (৪:৩) এই আয়াতে ব্যক্ত পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কার সাথে দুই, তিন কিংবা চারটি পছন্দমত নারী বিয়ে করার সম্পর্ক বোঝা যায় কি?

নিম্নোক্ত পর পর আয়াত দু'টিও লক্ষণীয় ঃ —" যদি তোমরা আশঙ্কা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না, " (২: ২৩৯) "এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং পত্নীগণকে ছেড়ে যায়, তারা যেন পত্নীদের বহিষ্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের ভরণ পোষণ করার অসিয়ৎ (অন্তিম উপদেশ, 'উইল') করে যায়, কিন্তু যদি তারা চলে যায়, এবং তারা নিজের জন্য নিয়মানুযায়ী যা করবে, তার জন্য তোমাদের কোন দোষ নেই। ..." (২:২৪০)

উল্লিখিত (২:২৩৯) আয়াতটিতে নামায সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ 'এবং' শব্দটি দ্বারা যুক্ত পরবর্তী ২৪০ নং আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিধবা বা 'তালাক' (বিবাহ বিচ্ছেদ) দেওয়া পত্নী সম্পর্কে স্বামীর কর্তব্য। অতএব পর পর বলা 'এবং' শব্দ দ্বারা যুক্ত বাক্যদ্বয়ের ভাবের বা বিষয়ের সঙ্গতিহীনতা দেখে বক্তার মানসিক স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় নাকি? অথবা এমনও হতে পারে যে, এই ২৪০ নং আয়াতটি অন্যত্র ছিল, সংকলন কালে ভ্রান্তিবশত এখানে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। তাও যদি হয় সেটাও একটা ত্রুটিই।

"তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারবে?" (৪৩:৪০)

আল্লাহ্ কি দ্বিধাগ্রস্থ ? যদি হন সেটা তাঁর পক্ষে ভাল কথা নয়। অবশ্যই নয়। আর যদি প্রশ্নের মাধ্যমে এটা বোঝান হয়ে থাকে যে, তুমি পারবে না। অর্থাৎ আমি তাদের অন্ধ, বধির ও বিভ্রান্ত করে রেখেছি, তাহলে সেটা তার পক্ষাপাতমূলক স্বেচ্ছাচারিতা নয় কি? উপরোক্ত আয়াতটির পরের আয়াতটি দেখুন—"আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবু আমি ওদের শাস্তি দেবো।" (৪৩: ৪১) ৪০ নং আয়াতটির সাথে এর কিছু সম্পর্ক আছে কি? তাছাড়া 'তোমার' অর্থাৎ নবীর মৃত্যু ঘটানোর সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের শাস্তি দেওয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

'সূরা রহমান' (৫৫ নং সূরা) এর অনেক আয়াতই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশক (যদিও সেগুলির বক্তা আল্লাহ্ ন'ন; অপর কেউ) যেমন, "সেখানে (বেহেশ্‌তে) প্রবহমান দুই প্রস্রবণ থাকবে।" (৫০ নং আয়াত) "যেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দু'প্রকার।" (৫২ নং আয়াত) ইত্যাদি। এবং সেহেতু "তোমরা তোমাদের

প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" (আয়াত সংখ্যা ১৩, ৪৯, ৫১ ইত্যাদি) এই প্রশ্নটি সংগত হলেও আল্লাহ্‌র নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা প্রকাশক আয়াতগুলি, যেমন—"তোমাদের প্রতি অগ্নি-শিখা ও ধূম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে, তখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়বে।" (৩৫নং আয়াত) অনুরূপ ভয়ংকর হুমকি আয়াত নং ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৪ ইত্যাদিতেও আছে। তবু হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" (৩৮, ৪২, ৪৫ ইত্যাদি) এ প্রশ্নটি একেবারেই সংগতিহীন। নিষ্ঠুরতার হুমকি দেখিয়ে তাকে অনুগ্রহ বলাটা হাস্যকর নয়কি?

খারাপ অবস্থায় পড়লে সাধারণত মানুষ যা বলে তা কোরআনেও আছে—"আবার যখন তিনি তাকে জীবনোপকরণ সংকুচিত করে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে —'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।" (৮৯:১৬) মানুষের সাধারণ স্বভাবই সে দুরবস্থায় পড়লে কিংবা অভাবগ্রস্ত হলে সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করে, ক্ষোভ প্রকাশ করে। উদ্ধৃত আয়াতটি মানব চরিত্রের সেই স্বাভাবিক চিত্রই এঁকেছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াত— "এই প্রকার ধারণা অমূলক। বস্তুতঃ তোমরা এতিমদের সম্মান করনা।" (৮৯: ১৭) এ আয়াতের প্রথম আংশটি পূর্ববর্তী আয়াতের (৮৯:১৬) সাথে সংগতি রাখলেও পরবর্তী অংশটি— "...বস্তুতঃ তোমরা এতিমদের সম্মান করনা।" একেবারেই অসংলগ্ন প্রলাপের মত নয়কি? কেননা এতিমদের সম্মান করা বা না করার সাথে পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতের (৮৯: ১৭) প্রথম অংশটির কোন সম্পর্ক আছে কি?

"অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই" (৭৫:১৯)

উপরোক্ত আয়াতে 'এর' অর্থ কোরআন এবং সে সম্পর্কে দায়িত্ব 'আমারই' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র। ভাল কথা। কিন্তু একটু পরের আয়াতটির—"না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস।" (৭৫: ২০) এই বক্তব্যের সাথে কোন সংগতি খুঁজে পাওয়া কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কর্ম নয়।

"যদিও সে (মানুষ) নিজের দোষ ক্রটী ঢাকতে চায়, (৭৫: ১৫) "তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য তুমি ওহী দ্রুত আবৃত্তি করোনা।" (৭৫:১৬) পর পর এ দুটি আয়াতে বক্তব্যের কোন মিল আছে কি? এ যেন এই ছড়াটির কথা মনে করিয়ে দেয়—"ঘরের চালে সন্ধ্যাকালে শুয়ে কুকুর নিদ্রা যায়। পেয়ে মুগুর দুপুড় দাপুড় দিলেম দুটো আমার গায়।"

'সূরা কাহাফ' (১৮ নং সূরা) এর অর্থ গুহা। অবশ্য গুহার উল্লেখ আছে সূরাটির ৯, ১০, ১১, ১৭ ইত্যাদি আয়াতে। কিন্তু "এই সব জনপদ —ওদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমা লঙ্ঘন করেছিল, এবং ওদের ধ্বংসের জন্য

এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ স্থির করেছিলাম।" (১৮: ৫৯) এর পরবর্তী আয়াতটি লক্ষ করুন— "এবং মুসা যখন তার স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলো— "আমি উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামব না, আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।" (১৮: ৬০) 'এবং' শব্দটি দিয়ে যুক্ত উভয় আয়াতের বিষয় বস্তুগত মিল আছে কি? হঠাৎ করে যেন আকাশ থেকে মুসা এসে পড়লো এবং তার সঙ্গীটিইবা কে তারও কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। এ সূরাটিতে ১১০-টি আয়াত আছে। তার মধ্যে চারটি আয়াতে মাত্র গুহার উল্লেখ আছে এবং তাও কোন মুখ্য বিষয় নয়, যার জন্য সূরাটির ঐ 'কাহাফ' নাম দেওয়া যায়। এবং এত বিভিন্ন বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে যার একটার সাথে অপরটির সংগতি নেই।

"তোমার নিকট কি সেই কল্যাণকারীর সংবাদ এসেছে—যারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করল।" (৩৮:২১) আয়াতটির 'কল্যাণকারীর' (নিম্নরেখা চিহ্নিত) শব্দটি একবচন। অথচ সম্পর্কিত সর্বনামটি 'যারা' বহুবচন কেন হল? আর 'যারা' পদটির দ্বারা যদি কল্যাণকারীকে না বোঝান হয়ে থাকে তাহলে কাদের বোঝান হয়ছে? এবং সম্পূর্ণ বাক্যটি দ্বারা কী বোঝান হয়েছে বোঝা যায় কি? এবং এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত—"আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতা।" (২০) ও পরবর্তী আয়াত— "যখন তারা দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন সে ভীত হল, ..." (২২)। এখন অগ্র ও পশ্চাদবর্তী এ দুটি আয়াতের সঙ্গেও ২১ নং আয়াতটির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। খাবলা খাবলা কথা।

"তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।" (৮২: ৮) তা করুন। 'তিনি' (আল্লাহ্) তো তা করতেই পারেন। কিন্তু অব্যবহিত পরের আয়াতটিতে বলা হল—"কখনই নহে বরং তোমরাই দ্বীনকে (শেষ বিচারকে) অবিশ্বাস করেছো।" (৮২:৯) এর সাথে পূর্ববর্তী বাক্যটির যে কী পারম্পর্য আছে তা মাথায় আসে না। প্রথম আয়াতটির (৮২:৮) বক্তা আল্লাহ্ নন বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তী (৮২:৯) আয়াতটির বক্তা কে স্পষ্ট নয়, কেননা পরের ১০ নং আয়াতটি "অবশ্যই তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক আছে" (৮২:১০) দেখেই এ সন্দেহ হয়। তবু যদি ধরে নেওয়া হয় যে উভয় আয়াতের বক্তা একজনই তাহলেও 'কখনও নহে' বলে তিনি কী অস্বীকার করতে চেয়েছেন তা যেমন বোঝা যায় না, তেমনি এই অসংলগ্ন উক্তির জন্য তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে না কি?

"আল্লাহ্র প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসীগণ তৎসহ অংশীস্থাপনকারী নয়; এবং যে আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন করে তবে সে আকাশ হতে পতিত হয়। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" (২২:৩১)

উল্লিখিত আয়াতটিতে 'অংশীস্থাপনকারী আকাশ হতে পতিত হয়, পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল' ইত্যাদি কথার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য পারম্পর্য বোঝা যায় না। এ যেন কল্পনা বিলাসী কোন স্কুলের নিচের ক্লাশের পড়ুয়া বালকের ছড়া লেখার কষ্টকর অদ্ভুত প্রয়াস— যেমন অসংলগ্নচিত্র শিশুতোষ বাংলা ছড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। আলোচিত আয়াতের পরবর্তী আয়াত— "এই রূপে যে কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলীকে সম্মান করে, তবে নিশ্চয় তা আন্তরিক সংযমেরই (তাকওয়া) অন্তর্গত।"(৩২) পূর্ববর্তী ৩১ নং আয়াতের বিষয়ের সাথে এ আয়াতটির সংগতি কোথায়? অথচ আয়াতটি শুরু হয়েছে 'এইরূপে' শব্দটি দিয়ে, যাতে বোঝা যায় আগের বাক্যের কথা উল্লেখ করেই বাক্যটি বলা হয়েছে। সুতরাং মনে হয় অন্য কোন স্থান থেকে ভুলক্রমে এটি এখানে সংকলিত হয়েছে ফলে এরূপ অর্থবিভ্রাট ঘটেছে। অতুলনীয়, ভ্রান্তিহীন কোরআনে এমন অজস্র নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

"যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, কিংবা অন্যায় ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা দানকারী, সর্বশক্তিমান।" (৪:১৪৯)

যদি আমরা অন্যের সৎ কাজ প্রকাশ করি তা ভাল। কিন্তু নিজের সৎকাজ প্রকাশ করা আত্মশ্লাঘা বৈ কিছু নয়। অপরের ও নিজের সৎকাজ প্রকাশ করা এক মূল্য বহন করে না। আবার অন্যের সৎকাজ গোপন করা নিশ্চয় ভাল নয়। অন্যায় ক্ষমা করা সর্বক্ষেত্রেই ভাল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধও। অথচ উক্ত আয়াতটিতে আত্মপর উল্লেখ না করে নির্বিশেষে সকলের সৎকাজ প্রকাশ বা গোপন করা ও অন্যায় ক্ষমা করা পাইকারী ভাবে এক পাল্লায় ওজন করে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাদানকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারবুদ্ধিহীন অসংলগ্ন কথা।

'সুরা বাকারাহ'র ২৬ নং আয়াতটির শেষাংশ "...এর দ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন। আবার বহুলোককে সৎপথে পরিচালিত করেন, কিন্তু অসৎ লোক ব্যতীত কাকেও তিনি বিভ্রান্ত করেন না।"

কথাগুলো আল্লাহ্‌র ভাষায় নয়। সে যাহোক, কিন্তু এই যে বলা হল, "...তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেন, ..." তাতে কি তার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেল না? তাছাড়া তিনি যদি তা-ই করেন তবে সেই বিভ্রান্তির জন্য মানুষকে দায়ী করে শাস্তি দেওয়াটা কি অবিচার নয়? অবশেষে "...কিন্তু অসৎ লোক ব্যতীত কাকেও তিনি বিভ্রান্ত করেন না।" কথাটার অর্থ দাঁড়ায়, সৎ বা অসৎ হওয়ার উপর আল্লাহ্‌র কোন হাত নেই। তাতে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ন হয় না কি? তাও না হয় হল, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তার চেয়ে বড় আর একটা অভিযোগ ওঠে— তাহলে তিনি কি চান না অসৎ লোক সৎ হোক? যদি তা-ই চান তবে অসৎ লোককে তিনি সৎ পথে আনার ব্যবস্থা না

করে বিভ্রান্ত করবেন কেন?

'সূরা বাকারাহ'র (২ নং সূরা) পর পর দুটি আয়াত (২৩৯ নং ও ২৪০ নং) নিয়ে আমরা এই পরিচ্ছেদে আগেই আলোচনা করেছি। এখানে উক্ত আলোচনার পরিপূরক হিসাবে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, 'সূরা বাকারাহ'র ২২৬ নং হতে ২৩৭ নং পর্যন্ত ও ২৪০-২৪১ নং আয়াত সমূহে তালাক ও বিধবাদের সম্পর্কিত বিধান দেওয়া হয়েছে। অথচ মাঝখানের ২৩৮ ও ২৩৯ নং আয়াত দুটিতে নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় এ অসংগতির কারণ সংকলন কালের বিভ্রাট, মানুষের হস্তক্ষেপের ফল।

আল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে আর একটি উদ্ধৃতি—"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই মতাদর্শের অনুসারী করতে পারতেন; বস্তুতঃ যাকে ইচ্ছা তিনি স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; ... " (৪২:৮)

কথাটা আল্লাহ্‌র ভাষায় না হলেও খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশক। কিন্তু কোরআন পড়লে তো এ কথাই মনে হয় তিনি চান সকল মানুষ 'বিশ্বাসী' হোক এবং সে উদ্দেশ্যেই রসুলকে প্রেরন করেছেন অথচ উদ্ধৃত আয়াতটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে সকল মানুষ 'বিশ্বাসী' হোক তিনি ইচ্ছা করেন না। তাছাড়া ইচ্ছানুযায়ী বেছে বেছে কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা তো পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর।

এতক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় 'কোরআনে আল্লাহর স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংগতি' সম্পর্কে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছি আশা করি বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট তা-ই যথেষ্ট। যদিও এ বিষয়ে আরও অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

৭ ॥ কোরআনে অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য

যে বিষয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি বা স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, ধর্মগুলি সেই সব অনির্দেশ্য ও অস্পষ্ট বিষয়ে যখন কিছু বলে তা ঠিক বলে মানি বা না মানি উড়িয়ে দেওয়ার মত নাও হতে পারে। অন্তত কেউ কেউ তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে কোরআন এমন কথাও বলে যা বিজ্ঞান মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। যেমন— "তিনিই ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তার আসন পানির উপর ছিল, এতে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, কে আচরণে শ্রেষ্ঠ, যদি তুমি তাদের বল মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে, তাতে অবিশ্বাসীরা বলবে যে, এতো প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত নয়।" (১১:৭)

লক্ষণীয় বক্তব্যটি আল্লাহ্‌র ভাষায় নয়। উপর্যুক্ত আয়াতে 'ছয়দিনে' শব্দটির দ্বারা

এখন পৃথিবীবাসী আমরা সময়ের যে পরিমাণ বুঝি তা হল পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও সূর্যের অবস্থানের ফলে একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সময়। যখন জমিন অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্যই ছিল না তখন এই 'ছয়দিন' এর পরিমাণটা কী ভাবে হল? আর আসমান অর্থাৎ শূন্য বা কিছুই না। এবং এই শূন্য অসীমও বটে। অতএব শূন্যকে সৃষ্টির প্রশ্ন ওঠে কি? আর "সৃষ্টিকর্তার আসন পানির উপর ছিল" এ কথাটা কেমন করে মানা যায় যখন পৃথিবীই ছিল না? পৃথিবী ছাড়া খালি পানি কোথা হতে আসলো? পানি সৃষ্টি সম্পর্কে তো ভিন্ন করে কিছু বলা হয়নি। সর্বোপরি 'আসন' তো দেহধারীর জন্যই প্রয়োজন। তবে কি আল্লাহর দেহ আছে? আরও একটি প্রশ্ন— আল্লাহ্‌র আসন পানির উপর থাকার কিংবা 'ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টির' সাথে মানুষের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ সে পরীক্ষার সম্পর্কই বা কী? এ আয়াতের সর্বশেষ লাইনের ("যদি তুমি তাদের... যাদু ব্যতীত নয়।") কথাগুলিও আয়াতের প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কহীন। অতএব আয়াতটি শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয় পারম্পর্যহীনও বটে!

পৃথিবী সৃষ্টির মোটামুটি কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। তার সাথে কোরআনের উল্লিখিত বাক্যের মিল নেই এবং মিল নেই কোরআনে নিজের কথার মধ্যেই। যেমন— "আল্লাহ্‌ই আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, শুধু বলেন -'হও', অমনি তা হয়ে যায়।" (২:১১৭; ৩: ৪৭: ১৯:৩৫)

"... যখন তিনি কোন কিছু করার স্থির করেন, তখন তিনি বলেন—'হও' এবং তা হয়ে যায়।" (৪০ : ৬৮; ৩৬ :৮২) কথাগুলো কিন্তু আল্লাহ বলেননি। তাহলে কে বলেছেন? তাছাড়া আসল প্রশ্ন—যদি 'হও' বললেই তা হয়ে যায় তবে 'ছয়দিনে আসমান জমিন সৃষ্টির' ব্যাখ্যাটা কী? আর 'আদি স্রষ্টা' শব্দটি দ্বারা (২:১১৭) কি এ ইঙ্গিত বোঝায় না যে, পরবর্তী কালে ও সব আর কারো দ্বারা পুনঃ সৃষ্ট হয়েছে? ছয়দিনে সৃষ্টি সম্পর্কিত বাণী কোরআনে আরও আছে। যেমন—"আমি আসমান ও জমিন এবং ওদের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি।..." (৫০:৩৮) এখানে আবার বক্তব্যটি উত্তম পুরুষের অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহ্‌র। এতে বোঝা গেল একই তথ্য; কিন্তু বক্তা ভিন্ন। অথচ কোরআনে আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নাকি কথা নেই।

সৃষ্টি নিয়েই আবার দেখা যায় ৪১নং সূরার ৯ থেকে ১২নং এই ৪-টি আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পৃথিবীকে দু'দিনে সৃষ্টি করার পর চার দিনে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন। তারপর দু'দিনে আকাশমণ্ডলীকে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন। এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করলেন।

এখানে অন্তত একটি প্রশ্ন করতেই হচ্ছে— নক্ষত্র কি পৃথিবীর পরে সৃষ্টি হয়েছে? বিজ্ঞান কিন্তু বলে নক্ষত্রদের সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্বে। সুতরাং বলা যায় কোরআন স্পষ্টই একটি ভুল তথ্য দিল।

যাহোক, উল্লিখিত আয়াত সমূহে কথিত 'ছয়দিন' হোক কিংবা 'হও' বললেই

হোক, জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে এ উভয় তথ্যই অবৈজ্ঞানিক ও পারম্পর্যহীন। কেননা বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারটা বিজ্ঞানমতে বহু বহু সময়ের ধারাবাহিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফল।

"তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে .... এবং তোমাদের অধীন করেছেন-রাত ও দিনকে।" (১৪: ৩৩) বক্তব্যটা কি আল্লাহ্‌র? এবং চন্দ্র ও সূর্য, রাত ও দিন কি 'তোমাদের' অর্থাৎ বিশ্বাসীদের কিংবা মানুষের অধীন? এ অসম্ভব কথার যেকোন ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হতে পারে কি?

"তিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, ... তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার পশু দিয়েছেন।..." (৩৯: ৬) বক্তব্য এখানেও আল্লাহ্‌র নয়। এবং পৃথিবীতে মানব প্রজাতি সৃষ্টি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাখ্যা মোটামুটি সমগ্র বিদ্বৎ সমাজ মেনে নিয়েছেন তার সাথে উল্লিখিত তথ্যের মিল নেই। আর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মেনে নিলেও তিনি কেবল আট প্রকার পশু দিয়েছেন এ তথ্য মোটেই বিজ্ঞান নির্ভর বা বাস্তব সম্মত বলে মানা যায় না।

মানুষের জন্ম সম্পর্কে কোরআনে—"এ নির্গত হয় (নরের) মেরুদণ্ড ও (নারীর) পঞ্জরাস্থি হতে।" (৮৬:৭) আয়াতটির 'এ নির্গত হয়' অর্থাৎ শুক্র নির্গত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শুক্র কি নর ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে নির্গত হয়? তদুপরি নরের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থি কি শুক্রের উৎস স্থল? আধুনিক শরীর বিজ্ঞান মোটেই অনুরূপ কথা বলে না, জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে কোন বিজ্ঞানের বই কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রজনন-তন্ত্র অধ্যায়ে কোরআনের উক্ত বক্তব্যের সমর্থন নাই। উদ্ধৃত আয়াতের এই তথ্য হয়ত সাধারণ মানুষের অনুমান, কল্পনা বা বিশ্বাস হতে পারে; কিন্তু এর ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মানুষের জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে কোরআনের আরও অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। এবং তা খুবই সাধারণ ও অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ধারণার অনুরূপ অর্থাৎ শুক্র বিন্দু হতে মানুষের জন্ম, যেমন—৭৫:৩৭; ৭৬:২; ৭৭:২০; ৮৬:৬ ইত্যাদি। কিন্তু এ তো আধা সত্য। নারীর ডিম্বাণু ছাড়া শুক্র কি এককভাবে মানব শিশুর জন্ম দিতে পারে?

এবার মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত কোরআনের আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করা যাক— "তিনি মানুষকে পোড়ামাটির মত শুষ্ক মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন," (৫৫:১৪) কিংবা —"তিনি তোমাদের মৃত্তিকা দ্বারা তারপর শুক্র দ্বারা, তারপর রক্ত পিণ্ড দ্বারা সৃষ্টি করেছেন,..." (৪০: ৬৭) এ কথাগুলি কি আল্লাহ্‌র? যারই হোক পূর্বোক্ত কথাগুলির সাথে এক নয়। আবার— "নিশ্চয় আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা কাদার শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।" (১৫:২৬) এবারের কথাটি সরাসরি আল্লাহর বলে ধরা যায়। তবে আগের আয়াতগুলির তথ্যের সাথে বস্তুগত মিল নেই। একই বিষয়ে আরও কিছু আয়াত কোরআনে আছে। যেমন—২২:৫; ২৩:১৩; ২৫:৫৪ ইত্যাদি। কিন্তু একটার সাথে অন্যটির তথ্যগত মিল নেই এবং বিজ্ঞানসম্মতও নয়।

কোরআনের এক স্থানে— "...তৎপর আল্লাহ্ তাকে একশ বছর মৃত রাখলেন, তাকে পুনর্জীবিত করলেন।..." (২:২৫৯) এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায় যে, কোন মৃত দেহের কি একশ বছর পর অস্তিত্ব থাকে? যদি বা কোন প্রক্রিয়ায় রাখা হয় (রাসায়নিক ব্যবহার করে) কিন্তু একশ বছর পর তো দূরের কথা এক বছর পরও কি মৃতদেহে প্রাণ আসে? পৃথিবীর ইতিহাসে (পুরাণের গল্প নয়) এর কি নজীর আছে? সুতরাং বলা যেতেই পারে কোরআনের এ বাক্যটিও আজগুবি ও অবৈজ্ঞানিক।

"... সে (নূহ) ওদের মধ্যে অবস্থান করেছিল সাড়ে নয় শত বৎসর,..." (২৯:১৪) কোরআনের এ কথাটি নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান বা মানুষের ইতিহাস স্বীকার করে কি?

"চলতে চলতে সে যখন সূর্যাস্ত স্থলে পৌঁছিল তখন সে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল, ..." (১৮ : ৮৬)

"... যখন সে সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছিল..." (১৮ : ৯০)

উপরের আয়াতগুলিতে উল্লেখিত 'সূর্যোদয়স্থল' ও 'সূর্যাস্তস্থল' বলে পৃথিবীতে কোন স্থান আছে কি? এবং পঙ্কিল জলাশয়ে কি সূর্য অস্ত যায়? বাস্তবতা বা বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের এ সকল বাক্যের সম্পর্ক আছে এমন কথা কোন শিক্ষিত মানুষই স্বীকার করতে পারে না, হয়ত অন্ধ বিশ্বাসীরা পারে।

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে— একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে, একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পরে তা বিকল হয়ে পড়বে।" (৬৯:১৩—১৬)

বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে কোরআনে বর্ণিত ছয়দিনের তত্ত্ব যেমন অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বলে আমরা আগেই দেখিয়েছি তেমনি উপরে বর্ণিত আয়াতে একদিনেই চরাচর কারো শিঙ্গার ফুৎকারে ধ্বংস হয়ে যাবে বিজ্ঞান এমন কথা বলে না। অনন্ত মহাকাশে সংখ্যাতীত সৃষ্টি ছয়দিনে ও একদিনে যথাক্রমে সৃষ্টি হয়েছে ও ধ্বংস হবে এটা কল্পনা বিলাসীর রূপকথা, তাতে বিশ্বাস করা অন্ধতা বৈ কিছু নয়। এর সাথে বাস্তবতা বা বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র নামে সব আজগুবি কথা চালানোর পেছনে যে একটা উদ্দেশ্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। এসব বিশ্বাসের নাম ধর্ম হতে পারে কি?

"ওরা কি ওদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি, এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই।" (৫০:৬)

এ আয়াতটি পড়লে মনে হয় আকাশ বস্তু দ্বারা গঠিত একটি অবিচ্ছিন্ন ছাদ যাতে কোন ফাটল নেই। এ বর্ণনার সাথে অশিক্ষিত অন্ধ বিশ্বাসীর ধারণার মিল থাকতেও পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

"এবং একটি প্রদীপ্ত দীপ সৃষ্টি করেছি।" (৭৮:১৩) এ আয়াতের 'প্রদীপ্ত দীপ' বলতে সম্ভবত সূর্যকে বোঝান হয়েছে। যদি তাই হয় তবে তা একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন অশিক্ষিত মানুষই সূর্যকে দেখে এ কথা বলতে পারে। কিন্তু অনুরূপ কিংবা আরও বড় প্রদীপ্ত দীপ আকাশে আছে এবং তাদের সংখ্যাও অজস্র সে কথা যে কোরআনে বলা হল না তা কোরআন প্রবক্তা যেই হোন তাঁর মহা অজ্ঞতা ছাড়া কিছু বলা যায় কি?

"ফেরেশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান হবে,..." (৬৯:১৭)

উপরোক্ত আয়াতের ফেরেশ্‌তার বাস্তবতার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু বিজ্ঞান আকাশের প্রান্তদেশ বলে কোন সীমানা নির্ধারণ করেছে কি? এই হল সর্বজ্ঞানের আকর বলে দাবিকৃত কোরআনের জ্ঞানের বহর!

"...এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর,..." (২২:৬৫) এ আয়াতে আকাশকে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় আকাশ বস্তু গঠিত ছাদ এবং তা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এ ধারণা বিজ্ঞানের সাথে একেবারেই সংশ্রবহীন।

"তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" (২৫: ৫৩) আবার অন্যত্র—"তিনি দুই সমুদ্রকে সম্মিলিত ভাবে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পরে মিলিত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে এক (অদৃশ্য) অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।" (৫৫:১৯,২০)

উল্লিখিত আয়াতগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন—(১) সমুদ্র কি মাত্র দুটি? (২) সমুদ্রের জল কি মিষ্ট ও সুপেয় হয়? (৩) সমুদ্রগুলির মধ্যে কি অনতিক্রম্য ব্যবধান আছে? এসব প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর হচ্ছে—'না'। তাহলে আয়াতগুলিতে প্রদত্ত সমস্ত তথ্যই ভুল ও ভৌগোলিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন। তদুপরি প্রথমোক্ত (২৫: ৫৩) আয়াতটিতে বলা হল 'অনতিক্রম্য ব্যবধান' অথচ পরেরটিতে (৫৫: ১৯) বলা হয়েছে 'সম্মিলিত ভাবে প্রবাহিত করেন'। পরস্পর বিরোধী কথা। এবং এখানেও লক্ষণীয় আয়াতগুলি আল্লাহ্‌র জবানিতে নয়।

"... তখন আমি মৃত্তিকা গর্ভ হতে নির্গত করব এক জীব, যা মানুষের সাথে কথা বলবে, ..." (২৭: ৮২)

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সত্য মিথ্যা অনেক কথাই বলা যায়, যেমন গণক ঠাকুররা বলে থাকেন (যদিও তারা সাধারণত সম্ভবপর কথাই বলেন)। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছে তা একেবারেই উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, অবৈজ্ঞানিক তো বটেই। প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্বগত ভ্রান্তিরও অভাব নেই কোরআনে। যেমন—"শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়," (৯১: ২) চন্দ্র ও সূর্য তো সর্বদাই

আবির্ভূত হয়ে আছে। তাছাড়া পৃথিবীবাসী আমরা কি সকল তিথি ও পক্ষে চন্দ্রকে সূর্যের পরই আবির্ভূত হতে দেখি? তাতো নয়। শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে নির্দিষ্ট কিছু তিথিতে দিনেও অর্থাৎ সূর্যকে যখন দেখি তখন চাঁদকে ও দেখা যায়। অথচ কোরআন কী বলল?

"শপথ দিনের যখন সে ওকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে" (৯১: ৩) "শপথ রজনীর, যখন সে ওকে সমাচ্ছন্ন করে।" (৯১: ৪) এই যে সূর্যকে প্রকাশ বা সমাচ্ছন্ন করা নিয়ে তথ্য দেওয়া হল এ সব কি খুবই গভীর জ্ঞানের কথা? এর জন্য কি আল্লাহ্‌র মত সর্বজ্ঞ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন? প্রকৃতির এ নিয়মটি তো যে কোন অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও চোখে পড়ে। বস্তুতঃ এ আয়াতগুলির বক্তব্যেও প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। কেননা দিন সূর্যকে প্রকাশ করে না, রাত্রিও সূর্যকে আচ্ছন্ন করে না। গোলাকার পৃথিবী স্বয়ং আবর্তিত হওয়ায় পর্যায়ক্রমে তার উপরিস্থিত স্থানগুলি সূর্যের সম্মুখীন হয় বা আড়ালে যায়। পৃথিবীর যে স্থানগুলি যখন সূর্যের সম্মুখে আসে সেখানে তখন দিন ও আড়ালে গেলে রাত্রি হয়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সাধারণ জ্ঞানটিও কোরআনের কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

"... এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযান সমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর, তাঁর অনুমতি ব্যতীত;..." (২২: ৬৫) উল্লেখ্য জলযান সমূহের অধীনতা বিষয়ে ১৪: ৩২ আয়াতেও অনুরূপ কথা আছে। এখানে প্রথমে লক্ষণীয়, বক্তব্য আল্লাহ্‌র জবানিতে নয়। দ্বিতীয়তঃ জলযান সমূহ তো মানুষেরই তৈরী এবং মানুষেই সেগুলি চালায়। তবে সেগুলি আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের অধীন হয়েছে— এ কথার অর্থ কী? তৃতীয়তঃ আকাশ সম্পর্কে যে ধারণা এখানে প্রকাশিত তা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক একটি মিথ্যে ধারণামাত্র। চতুর্থতঃ জলযানের মনুষ্যাধীন হওয়ার সাথে আকাশকে পতিত হতে না দেওয়া বা স্থির রাখার সম্পর্কটা কী? সর্বোপরি আকাশের পতিত হওয়া বা স্থির থাকার প্রশ্ন আসে কি? অতএব এই আয়াতটিও অসম্বদ্ধ প্রলাপের মতই মনে হয়। বস্তুতঃ কোরআন অজস্র অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও অর্থহীন কথায় ভরা।

৮ ॥ নামায (উপাসনা)

কোরআনে 'নামায' শব্দটির উল্লেখ প্রচুর। নামাযের বার বা দফা সম্পর্কে যে সকল আয়াতে উল্লেখ আছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ—

১। "তোমরা দিনের শেষ দুভাগে ও রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর;..." (১১:১১৪)

২। "সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করবে, এবং প্রভাতে নামায পাঠ করে, ফজরের নামায বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবে।" (১৭:৭৮)

৩। "এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (রাতের শেষার্ধের নামায) কায়েম কর, এ তোমার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য।..."(১৭:৭৯)

৪। ..."এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ফজর (ব্রাহ্ম মুহূর্ত) ও আসরের (অপরাহ্ন) নামায তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর এবং রাতে ও দিনেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (২০:১৩০)

৫। " সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় (মাগরেব) ও প্রভাতে (ফজর) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" (৩০:১৭)

৬। "এবং অপরাহ্নে (আসরের নামায) ও মধ্যাহ্নে (জোহরের নামায)। আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা তাঁরই।" (৩০:১৮)

৭। "সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর।" (৭৬:২৫)

৮। " রাতের কিছু অংশ তাঁর প্রতি সেজদাবনত হও, এবং গভীর রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" (৭৬:২৬)

উল্লিখিত আয়াতগুলির প্রথমটিতে (১১:১১৪) স্পষ্টতই তিনবার নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখিত (১৭:৭৮) আয়াতে সময়ের উল্লেখ থাকলেও বারের বিষয় নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তৃতীয় নম্বরে (১৭:৭৯) উল্লেখিত আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার কথা বলা হলেও তা কেবল মহম্মদের জন্যই অতিরিক্ত কর্তব্য হিসেবে। চতুর্থ নম্বরে (২০:১৩০) উদ্ধৃত আয়াতেও স্পষ্টভাবে বারের কথা বলা হয়নি। এবং যে তিনটি সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাও আয়াতটির শেষাংশে যে রাত ও দিনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যেই (overlaping) পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ নম্বরে (৩০:১৭,১৮) উদ্ধৃত আয়াত দুটিতে মোট চারটি সময়ের বা বারের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম নম্বরে (৭৬:২৫,২৬) উল্লেখিত আয়াত দুটিতে মোট চারটি সময়ে নামাযের কথা বলা আছে। কিন্তু তাও পূর্বোক্ত আয়াত (৩০:১৮) এর সাথে সময়ের মিল নেই।

বস্তুতঃ উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলির কোথাও পাঁচবার নামাযের কথা বলা হয়নি। অথচ আমরা দেখি ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ দিনে পাঁচবার নামায 'ফরজ' অর্থাৎ ধর্মের দিক থেকে অবশ্য কর্তব্য বলে মানেন এবং অনেকেই পড়েন। তাহলে দিনে পাঁচবার নামায পড়ার রীতি কি কোরআন বহির্ভূত এবং তার ভিত্তি কোথায়? তাছাড়া এটাও লক্ষ করার যে, উদ্ধৃত আয়াত সমূহের মধ্যে নামাযের সংখ্যা ও সময় সম্পর্কে মিল নেই। নামায সম্পর্কিত এতগুলি আয়াত নাজিল (অবতীর্ণ) করেও সুনির্দিষ্ট ভাবে

কোরআন প্রবক্তা সংশয় দূর করতে পারলেন না কেন? সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তো সময় ও বারের কথা সুনির্দিষ্ট করে নামায সম্পর্কিত একটি আয়াতই নাজিল করতে পারতেন। তাহলে কোন সংশয় বা প্রশ্ন থাকতো না। 'ইসলাম' নাকি পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলির নাম—নামায, রোজা, কলেমা, হজ্ব ও যাকাত। দেখা যায় প্রথম স্তম্ভটি হচ্ছে 'নামায'। সেই নামায নিয়ে কোরআন প্রবক্তা নিজেই যেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন স্পষ্টভাবে তাই ধরা পড়েছে পরিচ্ছেদের প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে। কিন্তু ইসলামী তত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ গনী তাঁর কোরআন অনুবাদের টীকায় লিখেছেন—"ইসলাম ধর্মের দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের এই একটি মাত্র আয়াতেই সবগুলো নামাযের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিনের প্রথম ভাগের নামায অর্থাৎ ফজরের (প্রাতঃকালীন) নামায, দিনের দ্বিতীয় ভাগের নামায-জোহর (দুপুর) ও আসরের (বিকালের) নামায, রাতের প্রথম ভাগের নামায-মগরেবের (সন্ধ্যা) নামায ও এশার (রাত্রির) নামায।" (১১:১১৪ এর টীকা পৃ:১৬৭) এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচেছ 'দিনের শেষ দুভাগে ও রাতের প্রথম ভাগে' (১১:১১৪) বলতে ডঃ গনী কোথা হতে পাঁচ বার আবিষ্কার করলেন উল্লেখ করেননি। কোরআন যাই বলুক নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার বোধ করি ইসলামী তত্ত্ববিদগণের জন্য সংরক্ষিত থাকে। তাঁর কোরআন অনুবাদের অনেক টীকায় ও পূর্বাভাষে এ কথাই স্পষ্ট। এ সব বিষয় নিয়ে তাঁকে ফোনে ও চিঠিতে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত "অটলবিহারী তসলিমা এবং"... , নামক বইটিতে তাঁকে লেখা একটি চিঠি সংকলিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখলেই তাঁর স্বরূপ বোঝা যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলি ডঃ গনী ইসলাম ধর্মকে মহনীয় করে তুলতে অন্য ধর্মের বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মের নিন্দায় এবং নানাভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুন্ঠিত হননি। "অটলবিহারী, তসলিমা এবং..." বইটি শ্রীমতী দীপা বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, পরিবেশক-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কোল-৭০০০৭৩।

পরিচ্ছেদের প্রথমেই উদ্ধৃত আয়াতগুলি পূর্বাপর একটু পর্যালোচনা করলে আরও কিছু প্রশ্ন মনে আসে। যেমন —কয়েকটি আয়াতের (১১:১১৪; ৩০:১৭,১৮) বক্তব্য আল্লাহ্র জবানিতে নয় এবং নামায সম্পর্কিত এ নির্দেশগুলি কোন কোন আয়াতে (১৭:৭৯; ২০:১৩০; ৭৬:২৫) 'তোমার' প্রতি আবার কোথাও (১১:১১৪; ৩০:১৭) 'তোমাদের' প্রতি দেওয়া হয়েছে। নামাযের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এলোমেলো, সংগতিহীন ও অস্পষ্টতাময় বক্তব্যকে কি সুচিন্তিত ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়? বস্তুতঃ বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব নিয়ে সুক্ষ্মভাবে দেখলে ইসলামের ইতিহাস, হাদিস ও কোরআন থেকেই এ কথা স্পষ্ট হবে, বর্তমানে আমরা যে ইসলাম, কোরআন ইত্যাদিকে পাই তা প্রাথমিক অবস্থা থেকে পরিবর্তন বা বিবর্তনের মধ্য

দিয়েই এখানে এসেছে।

উপরে নামায প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হয়েছে তা কোরআন ভিত্তিক। কিন্তু নামায কীভাবে পড়া হবে তার নির্দেশ সেখানে নেই। তা না থাকুক। ধরে নিচ্ছি, রসুল মহম্মদই নামায পড়ার নিয়ম বিধি তৈরী করে দিয়েছেন।

নামায অর্থাৎ ইসলামী উপাসনা, মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কাজ। মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য সৃষ্টিকর্তার ধ্যান, তাঁর প্রতি প্রেম ও আত্মনিবেদন, নিজকৃত মন্দ কাজের জন্য মার্জনা ভিক্ষা, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া ইত্যাদিই সাধারণত উপাসনার উদ্দেশ্য। আর এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন মানসিক স্থৈর্য্য, একাগ্রতা ও প্রশান্তি। তার জন্য চাই নিরবতা, নির্জনতা। অথচ ইসলামে প্রচলিত নামাযে এর বিপরীত ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। যত বেশী লোকের সাথে একত্রিত হয়ে নামায পড়া যাবে পুণ্য হবে তত বেশী — এ গ্যারান্টি দিয়েছেন নবী মহম্মদ।

সাধারণত দল বেঁধে দিনে পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া ও আরবী ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রায় সীমাবদ্ধ সময়ের এই অনুষ্ঠানে একটা কঠোর সামরিক শৃঙ্খলা আছে। যেটা অভ্যাসজনিত যান্ত্রিকতা গড়ে ওঠায় সাহায্য করে। তাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের যে প্রাণের একান্ত সম্পর্ক তা স্থাপন করা যায় কি? এর মধ্যে নিয়মে বাঁধা যান্ত্রিকতা, শৃঙ্খলা ও অনেকের মধ্যে দলীয় ঐক্যবোধ নিশ্চয় আছে। নেই ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় তন্ময়তার সুযোগ। দলবেঁধে নামাজ পড়ার একটি উদ্দেশ্য নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করা এবং ঐক্য সৃষ্টি।

৯ ॥ আল্লাহ্‌র সীমাবদ্ধতা, সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতা

যে সকল ধর্মে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে সে সে ধর্মে ভাষানুযায়ী তাঁর বিভিন্ন অভিধা— ঈশ্বর, গড, আল্লাহ্ ইত্যাদি। তবে তাঁকে অনাদি ও অনন্ত রূপে বিশেষত হিন্দু ধর্ম বর্ণনা করে। অথচ কোরআনে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এ ভাষায়—

"তিনি আদি, তিনি অন্ত ..." (৫৭:৩) — এ আয়াতটিতে আল্লাহ্‌কে অনাদি ও অনন্ত বলা হয়নি।

সৃষ্টিকর্তাকে অসীম বলেই বলা সঙ্গত। অসীমের নির্দিষ্ট রং ও রূপ থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র আছে। যেমন—"আমরা আল্লাহ্‌র রং ধারণ করেছি, আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর?..." (২:১৩৮)

"আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রক্ষকের উপাসনা করতে, যিনি একে

সম্মানিত করেছেন, সমস্ত কিছুই তাঁর।..." (২৭:৯১)

উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন—নিম্নরেখ দেওয়া শব্দ 'আমি'-টি কে? পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আয়াতগুলিতে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তবে ধরে নেওয়া যায় যে, 'আমি' অর্থাৎ মহম্মদ। এখন আসল প্রশ্ন— যাঁকে উপাসনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি 'এই নগরীর রক্ষক'। যদি তিনি আল্লাহ্ হন তবে উক্ত শব্দগুচ্ছ দ্বারা কি তাঁর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়নি? তিনি কি একটি নগরীরই রক্ষক, আল্লাহ্র সীমাবদ্ধতার আরেক প্রমাণ, তিনি শবে বরাতের রাতে প্রথম আশমানে নামেন।

" জাহান্নাম, এটিই আল্লাহ্র শত্রুদের পরিণাম, ..." (৪১:২৮)

"...আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন।" (৪:১২৫)

সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং মানুষ তাঁর দাস এ কথা কোরআনের (৩৭:১১১; ১৭:৩,৭) অনেক স্থানে বলা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ্র সৃষ্ট মানুষ যাকে দাস বলা হয়েছে সে কীভাবে তাঁর শত্রু বা বন্ধু হতে পারে? এ ধরনের বক্তব্যের দ্বারা কি আল্লাহ্ ছোট হয়ে গেলেন না?

"যদি সে কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।" (৬৯:৪৪,৪৫) মহম্মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ এ আয়াতে বলছেন—'আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম।' এতে কি মনে হয় না আল্লাহ্ দেহধারী একজন ব্যক্তি? আল্লাহ্ যিনি সমস্ত বিশ্বের মালিক ও সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি ইচ্ছা করলেই তো সব হয়, অথচ এখানে দেখা যায় হাত ধরার মত তুচ্ছ কাজও তিনি করতে চান।

" হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প করবেন।" (৪৭:৭) এ আয়াতে আল্লাহ্ বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কেননা যিনি ইচ্ছা করলে এবং 'হও' বললেই সব হয়ে যায় তিনি এখানে সামান্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাঁর সৃষ্ট এবং দাস মানুষের সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে পড়েছেন। বিষয়টা আল্লাহ্র ক্ষমতার দীনতাই শুধু প্রকাশ করে নাই, তাঁর 'সর্বশক্তিমত্তা' দাবির অসারতাকেও প্রকট করেছে। এবং বাক্যটি হাস্যকর ও অযৌক্তিকও বটে। যিনি তার সাহায্যকারীকে সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি কেন নিজেকেই নিজে সাহায্য করেন না? সর্বোপরি আয়াতটি কিন্তু আল্লাহ্র জবানিতে নয়। মহম্মদের কথা নয় তো?

অতএব সমগ্র কোরআন পড়লে এ কথাই মনে হবে—বিভিন্ন জবানিতে নানা উল্টা পাল্টা কথা বলে আল্লাহ্কে যতই শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান ইত্যাদি নানা গুণে বিভূষিত করে বর্ণনা করা হোক আসলে তিনি রসুলের শরণাপন্ন হয়েছেন আরাধ্য বা উপাস্য হওয়ার জন্য।

১০ ॥ আল্লাহ্ কি এক না একাধিক

"আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির, নিশ্চয় আমি সক্ষম।" (৭০: ৪০)— এই আয়াতে 'আমি' শব্দ দ্বারা নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজেকে বোঝাচ্ছেন। তাহলে তিনি যাঁর নামে শপথ করছেন তাঁকে 'উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা এটাই কি বোঝা যাচ্ছে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া আরও একজন প্রভু আছেন যাঁর নামে আল্লাহ্ নিজেই শপথ করছেন?

And '<u>We</u> saved him & those with him by a mercy from <u>Us</u> and <u>We</u> cut the rest of those who denied <u>Our</u> revelations and were not believers." – 7:72 (M.M.Pickthall, p-127)

উপরের উদ্ধৃতি ছাড়াও কোরআনে বহু জায়গায়, যেমন— ৫: ৪৪; ৬: ৮৪, ৮৫, ৯৩; ১০: ১৪,১৫, ২২; ১৫: ৭৯, ৮১, ৯০; ৪৩: ৩ (পূর্বোক্ত এম. এম. পিক্থল) আল্লাহ্ উত্তম পুরুষের বহুবচন শব্দটি অর্থাৎ 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। মানুষের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় বহুবচন শব্দ উত্তম পুরুষে 'আমরা' ব্যবহার করলেও একবচন 'আমিকে'ই বোঝানো হয়; কিন্তু তুলনাহীন সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে ভাষার এ নিয়ম খাটে না। তিনি কেন মানুষের ভাষার এ নিয়মের অনুবর্ত্তী হবেন? বস্তুতঃ মহম্মদ তৎকালীন বহুদেববাদী বংশপরম্পরাগত বিশ্বাস থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি বলেই এটা হয়েছে কি?

"And when <u>I</u> inspired the disciples (saying) Believe in <u>Me</u> and my messengers, they said : We believe. Bear witness that we have surrendered." 5:111 (M.M.Pickthall, p-107) এ আয়াতে আল্লাহ্ একবচন শব্দই ব্যবহার করেছেন। এরূপ একবচন শব্দের ব্যবহার আরও অনেক আছে। কিন্তু "And verily <u>We</u> have written in the scripture, after the reminder: <u>My</u> righteous slaves will inherit the earth." 21:105 (M.M.Pickthall, p-240)। এ আয়াতে বহুবচন দিয়ে শুরু করে আল্লাহ্ এক বচনে শেষ করেছেন। ভাষার এ অস্থিরতার কারণটা বোঝা কঠিন। সে যাহোক, একথা সত্য যে, মহম্মদ একেশ্বরবাদ এবং তার সঙ্গে নিজের নবীত্বই (রসুলত্বই) প্রচার করে গেছেন। কোরআনে এটাই সব চেয়ে বড় প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেখানে দেখা যায় আল্লাহ্ নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য অজস্রবার বিভিন্ন কিছুর নামে শপথ করেছেন। উদাহরণ অন্যত্র দিয়েছি। এরপরেও কোরআনের ৩৬: ১; ৩৭: ১; ৫৩: ১; ৭৫: ১-২, ৭৭: ১-৫; ৭৯: ১-২, ৮৬: ১, ১১-১২ নং আয়াতগুলি দেখুন। এগুলো সবই কিন্তু 'মক্কী' সূরা। তখনও মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হননি। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্ মানুষের সাহায্য প্রত্যাশীও হয়েছেন। (দেখুন কোরআন ৪৭: ৭)

বলতেই হয় উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির নামে আল্লাহ্‌র শপথ ও উত্তম পুরুষের বহুবচন 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করায় সন্দেহ হয় আল্লাহ্ এক না একাধিক। তাছাড়া বিভিন্ন কিছুর নামে শপথ ও মানুষের সাহায্য প্রত্যাশী হওয়াতে আল্লাহ্‌র দুর্বলতাই প্রকটিত হয়েছে বলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা মনে করবেন।

১১ ॥ হযরত মহম্মদ কি নিরক্ষর ('উম্মী') ছিলেন

বলা হয়ে থাকে হযরত মহম্মদ নিরক্ষর ছিলেন। কোরআনেও এ কথার স্বীকৃতি দেখা যায়— "যারা ঐ নিরক্ষর প্রেরিত নবীর অনুসরণ করবে, ... (৭:১৫৭); কিংবা "...অতএব তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর নিরক্ষর নবীর প্রতি (মহম্মদ) বিশ্বাস স্থাপন কর ..." (৭:১৫৮)। কিন্তু আবার এই কোরানেই আছে— "যদি সে কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।" (৬৯: ৪৪-৪৫) এ কথা পড়লে কি মনে হয় না যে, মহম্মদ লিখতে জানতেন? কেননা আয়াতটিতে বলা হয়নি যে, তিনি তো লিখতেই জানেন না। এবং মানুষ সাধারণত ডান হাত দিয়েই লেখে বলেই এখানে 'ডান হাত ধরে ফেলতাম' বলা হয়েছে। যাহোক, যদি 'তিনি লিখতে জানতেন' অথবা 'তিনি লিখতে জানতেন না'— এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটাই সত্য; অন্যটি মিথ্যা। কেননা একই সময়ে দু'টো বিপরীত তথ্য সত্য হতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন— কোরআন এ উভয় বিপরীত তথ্যকে সত্য বলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকাশ করে সংশয়ের সৃষ্টি করল কেন?

মহম্মদের নিরক্ষরতা বা সাক্ষরতা বিষয়ে তৎকালীন পারিপার্শ্বিকতা নিয়েও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। যদিও সে যুগে মক্কার অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ছিলেন, তবু সংখ্যায় কম হলেও সাক্ষর লোকও ছিলেন। ইতিহাসে তো বটেই, কোরআনেও এর প্রমাণ আছে। কাজেই মহম্মদের নিরক্ষরতা নিয়ে যা প্রচার করা হয়ে আসছে তা খুব একটা স্বাভাবিক, যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ—

১) মহম্মদ তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

২) মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ঐ পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। তাঁর জেঠতুতো ভাই আলীই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৩) যে বয়সে লেখাপড়া শুরু করার কথা সে বয়সে তাঁর পিতা না থাকলেও মা ও অভিভাবক ঠাকুরদা আবদুল মোতালেব জীবিত ছিলেন। মহম্মদের ছয় বছর বৎসর কালে তাঁর মা এবং আট বৎসর কালে স্নেহময় ঠাকুরদা মারা যান। এমনকি তারপরেও অভিভাবকহীন ছিলেন না তিনি। স্নেহময় জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য আবু তালেব (এঁরই ছেলে আলী) বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং লেখাপড়ার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না, একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

৪। কোরআনের অনেকস্থলেই বাইবেলের স্পষ্ট অনুকরণ আছে।[১] তাতে বেশ বোঝা যায় মহম্মদ বাইবেল পড়েছিলেন। তাঁর সাক্ষরতার এ-ও একটি প্রমাণ। বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত যে, বাইবেলের ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টকে ভিত্তি করেই নবী মহম্মদ কোরআন রচনা করেছিলেন। কৌশলগত কারণে তিনি আল্লাহ্কে দাঁড় করিয়েছেন।

'কোরআন প্রকৃতই কার বাণী' পরিচ্ছেদে আমরা কোরআন থেকে অনেকগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে যা আলোচনা করেছি, তাতে উক্ত গ্রন্থটি যে আল্লাহ্‌র বাণী তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না বলেই মত প্রকাশ করেছি। তাছাড়া স্ববিরোধিতায় ভরা কোরআনে মহম্মদের নিরক্ষরতা নিয়েও পরস্পর বিরোধী কথা আছে, উপরেই তা আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে হাদিসকে বরং আমরা অনেক নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করি। কারণ, হাদিস মহম্মদ লেখেননি। এবং বহু লোকই (ধর্ম নির্বিশেষে) হাদিসকে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে বিশ্বস্ত বলে মনে করেন। মহম্মদ যে নিরক্ষর ছিলেন না, তার স্পষ্ট প্রমাণ বিশ্বস্ত হাদিস 'বোখারী শরীফে'ও আছে। হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে 'বোখারী শরিফে'র বরাত দিয়ে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ মোঃ আকরাম খাঁ তাঁর রচিত 'মোস্তাফা চরিত'-এ লিখেছেন (পৃ-৪৭), "হাদিসে আছে— হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার ভার প্রথমে হজরত আলীর উপর পড়ে। তিনি লিখেছিলেন, "মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লার সহিত আমরা এই মর্মে সন্ধি করিলাম যে— ।" কোরেশগণ রাসুলল্লাহ শব্দে আপত্তি করিয়া বলিল, আমরা ত তোমাকে আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়া স্বীকারই করি না। আমরা ত তোমাকে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মহম্মদ বলিয়া জানি, তাহাই লেখ।' হজরত তখন লেখক আলীকে বলিলেন, "বেশ কথা, মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এই অংশটা কাটিয়া দিয়া মোহাম্মদ এবন আবদুল্লাহ লিখিয়া দাও।" লেখক তরুণ যুবক ইমানের তেজে দৃপ্ত। তিনি বলিলেন "ও কথা আমি কাটিতে পারিব না, ক্ষমা করিবেন।" তখন আলীর হস্ত হইতে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়া হজরত তাহাতে স্বহস্তে লিখিলেন— তিনি ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন না।"

উপরোক্ত হাদিসে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, মোহাম্মদ ভাল করে না হলেও লিখতে জানতেন।

তবুও যে তাঁকে নিরক্ষর ('উম্মী') বলে প্রচার করা হয়, তার কারণ কী? কারণ অবশ্যই আছে। এ প্রচারণা তাঁকে রসুল হিসাবে অসাধারণত্ব দেবার ও মহিমান্বিত করার একটা কৌশল মাত্র। এবং কোরআন যে নিরক্ষর লোকের দ্বারা রচিত হতে পারে না এটাও প্রামাণ হিসাবে বলা সহজ হয়।

১। 'কোরআন ও বাইবেলের মধ্যে মিল' শীর্ষক পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা আছে।

১২ ॥ কোরআন কি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য

পরবর্তীকালে মদীনায় অবতীর্ণ বলে কথিত কোরআনের আয়াত সমূহে যাই বলা হোক না কেন, কোরআন যে মক্কা ও তার আশে পাশের লোকেদের জন্যই রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সাক্ষী কোরআন নিজেই। যেমন—

"And this is blessed scripture, which We have revealed confirming that which (was revealed) before it that thou mayst warn the mother of villages (Mecca) and those around her those who believe in the Hereafter believe herein, and they are careful of their worship – 6:93 (M.M.Pickthall, p-115) এটি মক্কী সূরা অর্থাৎ মক্কায় অবতীর্ণ সূরা।

এখানে ছোট্ট একটি মন্তব্য করা দরকার যে, এই আয়াতটির ক্রমিক সংখ্যা ডঃ গনী দেখিয়েছেন '৯২', '৯৩' নয়। অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থের আয়াতগুলির ক্রমিক সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে কোরআন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে।

"... যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। ..." (৩২: ৩; মক্কী সূরা।)

"Lo! We have appointed it a lecture in Arabic that haply ye may understand." 43:3 (M.M.Pickthall, p-348) মক্কী সূরা।

"এইভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মক্কাবাসীদের সতর্ক করতে পারো..." (৪২: ৭, মক্কী সূরা)

"... বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। ..." (২৮: ৪৬, মক্কী সূরা)

".... আমি এ (কোরআন) তোমার ভাষায় সহজ করেছি, যাতে তারা (তোমার প্রতিবেশীরা) সহজে বুঝতে পারে।" (৪৪: ৫৮, মক্কী সূরা)

"... আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গী না হয়ে পেছনে থাকা এবং তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মক্কাবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়, ..." (৯: ১২০, মদনী সূরা)

উপরের উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে বার বার একই কথা বলা হয়েছে। এবং অন্তত এগুলিই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে, কোরআন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর অর্থাৎ মক্কা, তার কাছের এলাকা ও মদীনার লোকেদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই রচনা ও প্রচার করা হয়েছিল। লক্ষণীয় সর্বশেষে উদ্ধৃত আয়াতটি (৯: ১২০) ব্যতীত উপরোক্ত সকল

আয়াতগুলি মক্কায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে (যা আগে বোঝা যায়নি বা আশাও করা যায়নি) যে সমস্ত আয়াতে কোরআনকে বিশ্বজনীনতার রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে, তা যে উদ্দেশ্যমূলক হস্তক্ষেপের ফল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, উপরোক্ত দুটি আয়াতে (৩২: ৩ ও ২৮: ৪৬) বলা হয়েছে "... যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, **যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি।**" যদি কোরআন মক্কার বাইরের লোকেদের জন্যও হত তাহলে একথা বলা কি মিথ্যা ভাষণ হয়ে যায় না? কারণ মুসা, দায়ুদ, ইসা প্রভৃতি বহু সতর্ককারী মক্কার বাইরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৩॥ কোরআনে মহম্মদের বিশেষ ছাড় ও আল্লাহ্‌র তুল্য গুরুত্ব

মহম্মদ নবীত্ব (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব) দাবি করে যে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন তা পুনঃ পুনঃ কোরআন দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কোরআনের বহু জায়গায় তাঁর বিশেষ সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ আছে। নমুনা হিসেবে অল্প কয়েকটি আয়াত দেওয়া হল—

"তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।" (৩: ১৩২)

"কেউ রসুলের অনুসরণ করলে সে তো আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করলো, ..." (৪:৮০)

"... যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের, ... এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য স্বীকার কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও," (৮: ১)

"... যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র ও রসুলের ..." (৮: ৪১)

"... যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার জন্য আছে জাহান্নামের (নরকের) আগুন, সেখানে সে স্থায়ী হবে, ..." (৯: ৬৩)

"... যে (রসুল) শক্তিশালী আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। যাঁর আজ্ঞা সেখানে পালিত হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন। যে তোমাদের সাথী, সে (মহম্মদ) উন্মাদ নয়।" (৮১:২০ - ২২, মক্কী সূরা, অনুরূপ— ৯:৬১; ২৪:৫৪; ৩৩:৫৬-৫৭; ৫৭:১৯; ৫৮:১২-১৩; ৫৯:৬; ৭২:২৩ ইত্যাদি)

এবার উদ্ধৃত আয়াতগুলির উপর কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত সংকলিত করা হয়েছে এবং তাতে মূলতঃ আল্লাহ্‌র সাথে মহম্মদের গুরুত্ব সমান করেই দেখানো হয়েছে, একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। কেবল

মহম্মদের সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার সম্পর্কে একবার বলা হল তা আল্লাহ্ ও রসুলের (৮:১), আবার বলা হল এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও রসুলের (৮:৪১)। কোরআন একই বিষয়ে বিভিন্ন রকম কথা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া কোরআনের অনেক স্থানেই উল্লেখ আছে বিশ্বের সকল কিছুর মালিক আল্লাহ্। ["Unto Allah belongeth whatsoever is in heavens and whatsoever is in the earth; ..." 3:109, M.M.Pickthall, p- 71] যদি তা-ই হয়, তাহলে তুচ্ছ যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভারের সামান্য অংশ আল্লাহ্ দাবি করেন কেন তা বোঝা দুষ্কর। এখানে কিন্তু এই অর্থই দাঁড়ায় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ নবী নিজে নেবার জন্যই আল্লাহ্‌র নাম যুক্ত করেছেন।

একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মগুরুকে অধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কহীন ঘৃণ্য লুঠের মাল ও নীচ দৈহিক নারী ভোগের সুবিধা দিতে (দেখুন ঃ ৮: ৪১, ৩৩: ৫০-৫৩) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা আল্লাহ্‌র চিন্তা-ভাবনা থাকতে পারে তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। নিজের আখের গোছানোর জন্য মহম্মদ আল্লাহ্‌কে কতটা নীচে নামিয়েছেন তা ভাববার বিষয়।

এসব দেখে স্পষ্ট মনে হয় নবীর সমস্ত অসুবিধা দূর করে সুখ-সুবিধা করে দেওয়াই আল্লাহ্‌র একটি প্রধান কাজ হয়ে পড়েছিল।

"নবী বিশ্বাসীদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর, এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা স্বরূপ। ... " (৩৩: ৬)

মানুষ স্বভাবতই নিজেকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে; কিন্তু উদ্ধৃত আয়াতটিতে নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর বলে নবীকে চরমভাবে প্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা হয়েছে এবং দেখা যায় যে, নবীর স্ত্রীদের প্রতি যাতে বিশ্বাসীদের কারো নজর না পড়ে সে উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে (স্ত্রীগণকে) বিশ্বাসীদের মাতা স্বরূপ ঘোষণা করে তাদের (বিশ্বাসীদের) বিয়ের পথ বন্ধ করা হয়েছে। অপর পক্ষে বিশ্বাসীদের পত্নীরা নবীর মাতা স্বরূপ, একথা না বলে নবী তাঁর নিজের বিয়ের রাস্তা খোলা রেখেছেন। ইসলাম গ্রহণের পাঁচটি কলেমায়ই আল্লাহ্‌র সাথে মহম্মদের নাম আছে।

'আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না'— কোরআনে এ হুঁশিয়ারি বহুবার দেওয়া হয়েছে। যেমন, "... আল্লাহর শরিক করা গুরুতর অপরাধ, "... (৩১: ১৩)। অথচ আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে কি মহম্মদকে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র শরিক করা হয়নি? আল্লাহ্ দৃশ্যমান নন। তাঁকে বস্তুজগতের মত চাক্ষুস বা অন্য কোনভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর অস্তিত্ব, ক্ষমতা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বা তিনি কি করেন বা না করেন সবই একটা বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। কিন্তু মহম্মদ একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন এবং যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র

সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ও একমাত্র তাঁর সুপারিশই আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে (দাবিটি অবশ্য মহম্মদের ও তাঁর প্রচারিত কোরআনের)। যেমন, "তিনি তাঁর রসুলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য।" (৪৮: ২৮) "মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল (প্রেরিত দূত)।" ... (৪৮: ২৯) "... এবং রসুলের আনুগত্য কর, ..." (২৪: ৫৬)। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর গুরুত্ব অপ্রত্যক্ষ আল্লাহ্‌ কর্তৃক কোরআনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌কে মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলে মানুক বা না মানুক, তাতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় কিনা তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌কে মানলে এবং কোরআনকে বিশ্বাস করলে মহম্মদকে আরও বেশী করে গুরুত্ব দিয়ে মানতে হবে। বস্তুতঃ মুসলমানরা তাই করে। এটা তাদের আচরণে অত্যন্ত স্পষ্ট। সমগ্র কোরআন বিশ্লেষণ করলে এটা দেখা যাবে যে, আল্লাহ্‌র ভূমিকাটা খুবই গৌণ। প্রত্যক্ষভাবে মুখ্য ভূমিকাটি রসুল মহম্মদের। তাই হাদিস (মহম্মদের উপদেশ ও অনুমোদন) ও সুন্নৎ (যা মহম্মদ করতেন) কোন অংশেই কোরআনের চেয়ে মুসলমানদের নিকট বাস্তবতঃ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং সমভাবে পালনীয়। তাই অদৃশ্য আল্লাহ্‌র মতো অসীম ক্ষমতার (কাল্পনিক?) অধিকারী ও পূজনীয় না হলেও ব্যক্তি মহম্মদই ইসলামে প্রবেশ করার এবং ইসলাম বুঝবার প্রথম সোপান। কেননা, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মহম্মদুর রসুলুল্লাহ" (কলেমা তৈয়ব), অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ উপাস্য নন এবং মহম্মদ তাঁর রসুল। কোরআন তো তারই মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। মহম্মদ যা কিছু চেয়েছিলেন ও করেছেন, তা-ই কোরআন দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এমন কি তুচ্ছ মধু খাওয়া কিংবা পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করা, বহু বিবাহ করা ও বিয়ে ছাড়া দাসীদের ভোগ করা, যা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, তা নিয়েও কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে (দেখুন ঃ ৬৬: ১, ৩৩: ৪, ৫০)। নামাযের আজানেও মহম্মদের নাম আছে।

১৪ ॥ কোরআনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভীতি প্রদর্শন

রসুল মহম্মদ আল্লাহ্‌র নামে ইসলাম ধর্মের প্রতি 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী'— এই দুভাগে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ভাগ করে কোরআনের বহু জায়গায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভয়াবহ দৈহিক শাস্তি প্রদানের হুমকির পাশাপাশি পরম আকর্ষণীয় দৈহিক ভোগ সুখের প্রলোভন দেখিয়েছেন। এবং স্পষ্টতই তার দ্বারা মনুষ্যত্ব সৃজনের বিশ্বজনীন ঔদার্যের অপেক্ষা 'বিশ্বাসী' দল সৃষ্টির চেষ্টাই করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ইসলাম বা মুসলমানদের ইতিহাসেই তা প্রকট হয়েছে। দৈহিক শাস্তির ভয় বা

শারীরিক সুখভোগের লোভ দেখানো— এর কোনটাই মহৎ বা সুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। আধ্যাত্মিক বা মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য এসব মোটেই নীতি বা পথ হতে পারে না।

ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষেরা এ ধরনের সহজ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও তা যে খুবই নীচু স্তরের ব্যাপার, পণ্ডিত সমাজ, মনীষীগণ তাই বলেন। কোরআনে ভীতি প্রদর্শনের অজস্র উদাহরণ আছে। এর মধ্যে কয়েকটি মাত্র নিচে উদ্ধৃত হল—

পারলৌকিক ভীতি

"সেখানে (জাহান্নামে) তারা (অবিশ্বাসীরা) যুগ-যুগান্ত অবস্থান করবে। সেখানে ওরা কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নয়— কেবল ফুটন্ত পানি ও পূঁজের আস্বাদ গ্রহণ করবে।" (৭৮: ২৩-২৫, মক্কী সূরা)

"যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে নির্যাতন করেছে এবং পরে তওবা (অনুতাপ) করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি, দহন যন্ত্রণা আছে।" (৮৫: ১০, মক্কী সূরা)

"সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।" (৮৭: ১২-১৩, মক্কী সূরা)

"যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তামার মত, তা ওর উদরে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মতন। আমি বলব— ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে।" (৪৪: ৪৩-৪৭, মক্কী সূরা; অনুরূপ— ৭২:২৩; ২৩:১৬; ৯২:১৪; ৫৫:৪৪; ৮৮:৪ ইত্যাদি)

ইহলৌকিক ভীতি

" কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; ফলে ওদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এবং ওরা অসহায় অবস্থায় তা দেখছিল। ওরা উঠে দাঁড়াতে পারল না, এবং তা প্রতিরোধ করতে পারল না। আমি ওদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলাম,... (৫১: ৪৪-৪৬, মক্কী সূরা)

"কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছে রাতে ও দুপুরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।" (৭: ৪, মক্কী সূরা)

"কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, ..." (২১: ১১, মক্কী সূরা)

"... এবং অবিশ্বাসীদের (আল্লাহ্) ধ্বংস করেন।" (৩:১৪১, মদনী সূরা)

উল্লিখিত আয়াতগুলি ছাড়াও অজস্র আয়াত কোরআনে আছে, যাতে অতীতের ধ্বংসের কথা আল্লাহ্‌র বা অন্যের জবানিতে বলা হয়েছে। এখানে এটাও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ শেষ বিচারের পর অবিশ্বাসীদের পারলৌকিক শাস্তি দেবেন— এ হুমকি

দিয়েই নিশ্চিত হতে পারেননি, অধিকন্তু জাগতিক শাস্তির উদাহরণ উল্লেখ করেও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এটাও দেখবার যে, আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাসটাই এখানে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। বিচারটা সততা বা অসততার বিষয়ে নয়। এবং আদৌ অবিশ্বাস (আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি) যদি অপরাধ হয়েই থাকে, তবে তাদের শাস্তি দুবার (ইহকালে ও পরকালে) দেওয়া কি যুক্তি ও বিচার সম্মত? আরও একটা বিষয় এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে, ধর্ম (ইসলাম) একটা দলীয় রূপ লাভ করেছে। কোন মানবগোষ্ঠী অবিশ্বাসী হলেই যে তাদের সকলে অসৎ হবে এমন কথা বলা যায় কি? অথচ আয়াতগুলিতে ঢালাওভাবে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করার কথাই বলা হয়েছে। এবং এ ধ্বংস করার ভেতর সূক্ষ্মবিচার বুদ্ধির লেশমাত্র পরিচয় নেই। আছে শক্তির দম্ভ, আক্রোশ ও নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার কদর্য পরিচয়, যা সৃষ্টিকর্তার ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে।

১৫ ॥ কোরআনে প্রলোভন - ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

" যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং মহম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের মন্দ কর্মফলগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।" (৪৭: ২, মদনী সূরা)

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সত্যপরায়ণ ও শহীদ-সদৃশ। তাদের জন্য তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি আছে, ..." (৫৭: ১৯, মদনী সূরা)

কোরআনে অনুরূপ আয়াত প্রচুর। উল্লিখিত ৪৭: ২ নং আয়াতে দেখা যায় যে, কেবল মহম্মদ প্রচারিত বাণী সমূহকে আল্লাহ্র বাণী বলে ও তাঁকে আল্লাহ্র রসুল বলে বিশ্বাস করলেই আল্লাহ্ যে শুধু তাদের (বিশ্বাসীদের) অবস্থা ভাল করবেন তাই নয়, তাদের খারাপ কাজগুলোও ক্ষমা করে দেবেন। উদ্ধৃত অপর আয়াতটিতে (৫৭:১৯) বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সত্যপরায়ণ। অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করে হাজার মিথ্যাচরণ কিংবা অনৈতিক কাজ করলেও তারা সত্যপরায়ণ। দল পাকাবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ও ধর্মান্ধ মানুষকে প্রলুব্ধ করার এর চেয়ে জোরালো টোপ আর কী হতে পারে? এমন অযৌক্তিক, নীতিবিরুদ্ধ ও মূর্খামীপূর্ণ কথা কী করে কোরআনে থাকতে পারে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমি তার সদুত্তর দিতে পারিনি।

"অতঃপর আল্লাহ্ তাদের পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। ... " (৩: ১৪৮, মদনী সূরা)

"যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর, ..." (৮: ৬৯, মদনী সূরা)

" তাদের সেবায় (বিশ্বাসীদের) নিয়োজিত থাকবে চির-কিশোররা, পানপাত্র, কুঁজো ও প্রস্রবণ-নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালাসহ, ... ওরা তাদের পছন্দমত ফল-মূল পরিবেশন করবে, এবং তাদের ইপ্সিত পক্ষী-মাংস, এবং সুলোচনা সুন্দরীগণ, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, তাদের কাজের পুরস্কার স্বরূপ।" (৫৬:১৭-২৪, মক্কী সূরা)

"তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী থাকবে; ওদের আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি— ওদের চিরকুমারী করেছি, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা," (৫৬: ৩৪-৩৭, মক্কী সূরা। অনুরূপ— ৪৮:২০; ৫৫:৫৮,৭০,৭৪; ৭৮:৩১-৩৪ ইত্যাদি)

কোরআনের অজস্র আয়াতে বিশ্বাসীদের জন্য এরূপ মনোহারী ও যৌন উত্তেজক প্রলোভন দেখানো হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলির মধ্যে সাধারণ ভাবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মক্কী সূরা সমূহে পরকালীন নারীসম্ভোগের নিশ্চয়তা ও মদনী সূরাগুলিতে লুণ্ঠিত মাল ভোগের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।

কোরআনের কোথাও সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি বা স্বার্থশূণ্য প্রেমের মতো মহৎ আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ নেই। আছে আল্লাহ্ প্রদেয় দৈহিক শাস্তির ভয় ও অপর পক্ষে নানা প্রকার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্পদ লাভ ও নারী সম্ভোগের নিশ্চিত আশ্বাস। আল্লাহ্ ও রসুলের উপর কেবলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করলেই তুচ্ছ সম্পদ লাভ ও স্থূল যৌন তৃপ্তির উগ্র বাসনা পূরণের ব্যবস্থা হবে। আত্মা-ভিত্তিক মুক্তির বিষয় কোরআনের কোথাও নেই। সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে নিম্নস্তরের, স্বার্থভিত্তিক একটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের কথা আছে। তাও সরাসরি নয়, মহম্মদের মাধ্যমেই হতে হবে তা। কোরআন কোন মহান আত্মিক নন্দন ভিত্তিক আদর্শ স্থাপন করেনি। ইহলোকের তো বটেই, পরলোকের সুখ বর্ণনায়ও স্থূল দেহজ ভোগ বা দুর্ভোগের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ফলে পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত ভীতি ও প্রলোভনের পার্থিব ও পারলৌকিক ব্যবস্থা স্বভাবতই দেহধারী সাধারণ মানুষকে যুগপৎ চরমভাবে ভীত ও প্রলুব্ধ না করে পারে না। ধর্মের দলীয় প্রচারের এই কৌশলটা চতুর মহম্মদ সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এর পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রেখেছিলেন। কেননা আল্লাহ্র কাছে সরাসরি যাওয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই।

কোরআন রচয়িতা যিনিই হোন, বোঝা যায় তিনি নিশ্চিত ভাবে জানেন যে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই দৈহিক সুখগুলির মধ্যে যৌন সম্ভোগ সর্বাপেক্ষা তীব্র সুখদায়ক ও আকর্ষণীয়। বিশেষত আরবের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, লোকদের খাদ্যাভ্যাস, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি তাদেরকে প্রচণ্ড আবেগ-প্রবণ, দুর্ধর্ষ প্রকৃতি বিশিষ্ট ও

প্রবল যৌনসম্ভোগ বাসনার অধিকারী করেছে। সুতরাং কোরআন বার বার বেহেশ্‌তের সুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে অপূর্ব দৈহিক সুষমামণ্ডিত অল্পবয়স্কা কুমারী নারী ও কিশোরদের পাবার নিশ্চয়তা দিয়েছে। এর সাথে সেখানে থাকবে আনুষঙ্গিক সুরা, পক্ষীমাংস, ফলমূল, মূল্যবান ও দৃষ্টি-নন্দন পোষাক, সুপেয় জলের নদী ও প্রস্রবণ, সবুজ বৃক্ষরাজী শোভিত ছায়াময় স্থান। আর মরুময় আরবে এ সকল দুর্লভ বলেই পরম কাঙ্খিত। লক্ষ করার বিষয় যে, বিশ্বাসী পুরুষদের মত বিশ্বাসী নারীদের ভোগের ব্যাপারে কোরআনে তেমন কিছুর উল্লেখ নেই বললেই চলে। একথা মনে হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে, কোরআন প্রধানতঃ পুরুষদের সুখ-শান্তির কথা মাথায় রেখেই স্বর্গের বর্ণনায় বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ করা হয়েছে। নারীদের ভোগের বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন, মুসলিম মেয়েদের বেহেশ্‌তে গিয়েও সতীনের ঘর করতে হবে। কারণ, বেহেশতের সর্বনিম্ন পদাধিকারীরও ৭২ জন স্ত্রী থাকবে।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে উল্লেখিত 'আত্মা' শব্দটির মোটামুটি ইংরেজী প্রতিশব্দ 'সোল'(soul) এবং এর আরবী প্রতিশব্দ 'রুহ্'। এই আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক যাই থাক, একে স্বীকার করেই এর মুক্তি আছে বলে কোন কোন ধর্মে একটি বিশ্বাস আছে। বিশেষত ভারতীয় ধর্মগুলিতে আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভ বলে মৃত্যু পরবর্তী পরম কাঙ্খিত অবস্থা বর্ননা করে গভীর তাৎপর্যপূণ্য প্রচুর আলোচনা আছে। খ্রীষ্টধর্মেও 'Salvation of soul' বলে একটি বিষয় দেখা যায়। এই মুক্তি বা মোক্ষলাভকে স্বর্গের অনাবিল সুখেরও উর্ধ্বে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সাথে আত্মার সংযোগ বা 'লীন' হওয়ার অবস্থাকে বোঝায়। স্বর্গে সুখভোগের একদিন শেষ হয়। তারপর আবার জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদির জ্বালা-যন্ত্রণা। সে সব থেকে অব্যাহতি পেতেই মুক্তি বা মোক্ষলাভের চরম সাধনা। ধর্মীয় চিন্তার এই দিকটি নিঃসন্দেহে গভীর, ব্যাপক ও সুন্দর। অথচ বিস্ময়ের বিষয় কোরআন তথা ইসলামে এরূপ চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। দোজখ ও বেহেশ্‌তের শারীরিক স্থূল দুর্ভোগ ও সম্ভোগের দু'টি মাত্র সঙ্কীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক চেতনার বাইরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে রুহের মিলনের স্বার্থলেশহীন উদার প্রেমের চিন্তা মহম্মদ বা কোরআন করতে পারেনি। এ অক্ষমতাকে ভগবৎ প্রেমীরা কোরআন তথা ইসলামের সীমাবদ্ধতা বলেন।

চৌদ্দশ বছরের কম সময়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের দ্রুতগতির সাথে অপর ধর্মগুলির গতির তুলনা হয় না। ইসলামের পক্ষ থেকে এর কারণ হিসেবে বলা হয়— ইসলামের একেশ্বরবাদিতা, মানুষের মধ্যে বিভেদ না করা, সৃষ্টিকর্তার প্রতীক বা প্রতিমা পূজা বিরোধিতা ইত্যাদি। এখানে প্রশ্ন ওঠে— একেশ্বরবাদিতা কি আর কোন ধর্মে নেই? ইসলাম কি মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেনি? প্রতিমা পূজা বিরোধিতা

বা নিরাকার উপাসনা কি ইসলামের একচেটিয়া? প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যাক। একেশ্বরবাদিতা সনাতন হিন্দুধর্ম সহ আরও কিছু ধর্মে আছে। ইসলামে আরব অনারবদের মধ্যে আরবদের, আরবদের মধ্যে কোরেশদের এবং কোরেশদের মধ্যে হাশেমী বংশের প্রাধান্য দেখা যায়। তারপর নারী ও পুরুষদের মধ্যে পুরুষদের প্রাধান্য ইসলাম দিয়েছে। আর শিয়া, সুন্নী, কাদিয়ানী, আহ্‌লে হাদিস, খারেজী ইত্যাদি অজস্র দল, উপদলে বিভক্ত হয়ে মুসলমানরা যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েই আছে তার সাক্ষী ইতিহাস। সর্বোপরি মুসলিম অমুসলিম হিসাবে মানুষের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর বিভেদ ইসলাম কোরআন মারফত করেছে তা এক কথায় সর্বনাশা। এরূপ একটি বিধানে বলা হয়েছে — "তোমারাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে উদ্ভুত হয়েছে, ..." (৩:১১০)

আল্লাহ্ 'চিরকালীন ব্যবস্থাপত্র' কোরআন মারফত অমানবিক দাসত্ব প্রথা বাতিল করেননি। বরং ক্রীতদাস ও প্রভুর অসাম্যকে সমর্থন করেছেন (দেখুনঃ কোরআন ১৬:৭৫, ৭৬) এই হচ্ছে সাম্যের ধর্ম ইসলাম! আধুনিক বিশ্বে ক্রীতদাস প্রথা কি বেআইনী নয়?

নরহত্যার বিচারে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে জঘন্য বৈষম্যের ব্যাপার সহী বোখারী, সহী মুসলিম ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে যা যা বলা হয়েছে তার সবই মুসলিমের অনুকূলে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইসলামী বিচারে একজন অমুসলমান অন্য অমুসলমানকে হত্যা করলে তার প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু হত্যাকারী অমুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার আর প্রাণদণ্ড হবে না। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে সুবিধা অনেক!

তাহলে ইসলামের দ্রুত বিস্তারের কারণ কী? কারণ একাধিক। তবে দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধি ছাড়া প্রধান কারণ দু'টি। এক ঃ ভীতি প্রদর্শন। ইহলোকে জেহাদ ও শাস্তির ভীতি, পরলোকে অমুসলিমদের জন্য নিশ্চিত অনন্ত দোজখের ভীতি। দুই ঃ প্রলোভন। ইহলোকে লুটের মালের (নারীসহ) ভোগ। চারটি বিয়ে ছাড়াও দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগ বৈধ করে আল্লাহর ঘোষণা আছে কোরআনে। এই বিধানের বাস্তব ব্যাখ্যা খুবই মারাত্মক। একজন মুসলমান আইন না ভেঙেই সমস্ত জীবন বিয়ে করে যেতে পারে। ব্যাপারটি এ রকম— চারটি বিয়ে করার পর ৫ম বিয়ে করার সময় একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে দাসী করে রাখা। শোনা যায়, বর্তমান সৌদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে সৌদ এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ৩০০টি বিয়ে করেছিলেন। এরূপ মজাদার বিধানের সঙ্গে আছে বেহেশ্‌তে যাবার নিশ্চিত গ্যারান্টি। এবং সে বেহেশ্‌তে তারা কী পাবে তার বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামে যৌন সম্ভোগের ব্যবস্থা একটি চরম আকর্ষণীয় স্তম্ভ।

১৬॥ কোরআনে অত্যন্ত সাধারণ কিছু কথা, কিছু ভুল ও আরবদের স্বার্থ

কোরআনে মানুষ সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে যা আছে তা কোন গভীর জ্ঞান-প্রসূত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়। যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই তা বলতে পারে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অধিকাংশ জায়গায় আছে পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা বিষয়ক কথা, মানুষের যুগপৎ দৈহিক শাস্তির ভীতি ও সুখ ভোগের প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা মহম্মদ ও তাঁর প্রচারিত ইসলাম মতবাদে বিশ্বাস স্থাপনের প্ররোচনা। এবং এর সঙ্গে মহম্মদকে শ্রেষ্ঠতম ও শেষতম নবী হিসাবে মেনে নেওয়ার আহ্বান। না, ঠিক আহ্বান নয়, কঠোর নির্দেশ। বস্তুতঃ সৃষ্টিকর্তা বলে যে শক্তির অস্তিত্ব অনেক মানুষের মনে শেকড় বিস্তার করে রয়েছে, তা নিতান্তই বিশ্বাসের বিষয়। এ নিয়ে বিতর্কও আছে যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলী বর্তমান থাকলে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার নাও করা হয়, তবে সৃষ্টিকর্তার বা সাধারণ মানুষের কিছু আসে যায় না নিশ্চয়ই। আর যদি সৃষ্টিকর্তা বলে কোন শক্তির অস্তিত্ব থাকেও, তবে তা কেবল ইসলামেই আছে তা হতে পারে না। এবং ইসলাম ধর্মেই শুধু ভাল মানুষ আছে তা হয় কি করে? আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক, কোরআনে আল্লাহ্‌, রসুল, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী বলে যে চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের মনে তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই মহম্মদ ও তাঁর জাতি আরববাসীর মঙ্গল হবে। এবং ইসলামের বিস্তারে আরবদেরই অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রকারে লাভ হবে। কেননা ইসলাম অনারব মানুষকে তাদের জাতীয় চেতনা ও স্বকীয়তা ভুলিয়েই ক্ষান্ত হয় না, উগ্রভাবে মহম্মদ ও মক্কামুখী করে তোলে। ইসলামের ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে এবং এখনও করে চলেছে। সম্পূর্ণ কোরআনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই ধরা পড়বে সকলের কাছে।

এখানে কোরআন থেকে সামান্য কয়টি আয়াত উদ্ধৃত করে এই পরিচ্ছেদের বক্তব্যের অনুকূলে প্রমাণ পেশ করছি —

'হে নবী! যারা ঘরের পেছন হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।' (৪৯: ৪) 'তুমি বের হয়ে ওদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করত তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত।' (৪৯: ৫-মদনী সূরা)

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে নবীকে যারা ঘরের পেছন থেকে ডেকেছিল অথচ নবীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি তাদের নির্বোধ বলা হয়েছে। এবং তাদের আচরণ যে ব্যক্তিগতভাবে নবীর পছন্দ নয় তা বোঝা যায়। কিন্তু এইসব তুচ্ছ কথা আল্লাহ্‌র জবানিতে কেন বলা হল তা ভাবতে অবাক লাগে।

'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থি সমূহ একত্রিত করতে পারব না? বস্তুত আমি ওর অঙ্গুলীগুলি পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। (৭৫: ৩,৪-মক্কী সূরা) উদ্ধৃত আয়াতটিতে কোন্ মহৎ দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত করলেন প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্? বিশ্বভুবন সৃষ্টির দাবিদার আল্লাহ্‌র কি সন্দেহ হচ্ছে যে, মানুষ তাঁর শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না? যিনি সমগ্র কোরআনে নিজেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বজ্ঞ বলে কতবার আস্ফালন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, তিনি এখানে কেন মানুষের অঙ্গুলী পুনর্বিন্যাসের সামান্য ক্ষমতার দাবি করছেন তা ভাবলে হাসি পায়। বস্তুতঃ এ তুচ্ছ দাবি দুর্বলতার পরিচায়ক ও সৃষ্টিকর্তার চরিত্রানুগ নয়।

'শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির, যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, যারা অভিযান করে প্রভাত কালে, ও সেই সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে ... ' (১০০ : ১-৫)

উদ্ধৃত আয়াত সমূহের শপথকারী বক্তা কে তা স্পষ্ট নয়; কিন্তু ওগুলোতে যে কোন গভীর বা মহৎ তত্ত্ব নেই তা খুবই স্পষ্ট। ধর্মগ্রন্থে প্রয়োজনহীন কথা ।

'হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ করো না।' ... (৩৩:৫৩)

আমরা বাহুল্য বিবেচনায় সম্পূর্ণ আয়াতটিকে উদ্ধৃত করলাম না। এখানে যদিও আয়াতের ক্রমিক নং ৫৩; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ওতে আট লাইনে ছয়টি আয়াত (বাক্য) আছে। এও একটি ত্রুটী। যাহোক, এই ৩৩ নং সূরাটি মদীনায় প্রাপ্ত এবং এর আদি ক্রমিক নং ৯০। মহম্মদের মদীনায় আসার পর প্রাপ্ত এটি চতুর্থ সূরা। এই সূরার প্রায় সবটাই নবীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও তাঁর সুবিধা-সুযোগের কথায় ভরা। এ আয়াত পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে সময়টায় প্রতিদিন নবীর ঘরে অনেক লোক আহার করতো। কেন করতো তার ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কথা আসবে এবং সেগুলি ভাল কথা নয়। কিন্তু উদ্ধৃত কথাগুলো খুবই তুচ্ছ কথা। ধর্ম সংক্রান্ত কোন উপদেশ নয়।

'সূরা যারিয়াত' (মক্কী)- এর বর্তমান ক্রমিক নং ৫১ এবং আদি নং ৬৭। এর প্রথম দিকের আয়াতগুলি যথাক্রমে —

'১) শপথ ঝঞ্ঝা বায়ুর, ২) শপথ মেঘপুঞ্জের, ৩) শপথ স্বচ্ছন্দগতি জলযানের, ৪) শপথ সম্পাদনকারী ফেরেশ্‌তাগণের'। এতগুলি সৃষ্ট বিষয়ের নামে শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। কিন্তু কেন করলেন? এর উত্তর ৪ নং আয়াতে — 'তোমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।' তিনি যেন সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু কী তাদের প্রতিশ্রুতি? ফেরেশ্‌তাগণ, যাদের অস্তিত্বই বিতর্কিত, তাদের ছাড়া আর যাদের নামে শপথ করা হোল তারা কি জীব? প্রতিশ্রুতি দিতে পারে? এবং যদি দিয়েও থাকে তো সে কথা বলার জন্য অসীম ক্ষমতা ও ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের কি তারই সৃষ্ট ওসবের নামে শপথ বাক্য উচ্চারণের কোন প্রয়োজন আছে? বুদ্ধিমান

পাঠক লক্ষ করুন, এর পরই ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী'। এই বক্তব্য কি আগের কথাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? যদি ধরে নেওয়া যায়, এই কর্মফল দিবসের প্রতিশ্রুতিই তারা দিয়েছিল, তবে তা কি সত্য? কোরআনের বহু স্থানে অন্য কেউ নয় আল্লাহ্ই কর্মফল দিবসের হুমকি দিয়েছেন বার বার। এরপর আবার — ৭) 'শপথ তরঙ্গিত আকাশের,'। কিন্তু কেন এই শপথ? ৮নং আয়াতে বলা হচ্ছে, ' তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথা বলছ।' এখন এই 'তোমরাটা' কারা? ধরে নেওয়া যায় - অমুসলমানগণ। তাহলে যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হচ্ছে — এই কথা বলার জন্য কি আল্লাহ্র শপথের প্রয়োজন আছে?

"যদি আমি এ কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে তা নত হয়ে আল্লাহ্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ..."(৫৯:২১) ৫৯ নং সুরার প্রথম হতে অধিকাংশ আয়াতের বক্তা কোন ব্যক্তি, আল্লাহ্ নয়। এবং ১৮ নং আয়াতে সেই ব্যক্তিই বিশ্বাসীগণকে সম্বোধন করে বলছেন, তারা যেন আল্লাহ্কে ভয় করে। অথচ উল্লিখিত ২১নং আয়াতটির বক্তা আল্লাহ্ নিজেই। কিন্তু ওতে 'তুমি' বলে তিনি কাকে উদ্দেশ্য করেছেন তা স্পষ্ট নয় (এমন অস্পষ্টতা কোরআনে বহু)। যা হোক, আয়াতটির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন ওঠেই, যেমন ঃ—

১) মহম্মদ 'ওহী' (আল্লাহর বাণী) পেয়ে তা মনে রাখতেন এবং পরে সে সব শিষ্যদের বলতেন। কিন্তু নিস্প্রাণ পর্বতের উপর কেমন করে কোরআন অবতীর্ণ করাতেন? সে কি শুনতে পায়?

২) নির্জীব পর্বত কি তা প্রচার করতে পারতো?

৩) প্রাণহীন পর্বতের ভয় পাওয়ার প্রশ্ন আসে কি?

৪) ধরা যাক পর্বতের প্রাণ আছে; কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পরম করুণাময় এবং পর্বত নিরপরাধ, এমতাবস্থায় তার ভয়ের হেতু কী?

৫) মহম্মদের ক্ষেত্রে 'জিবরাইল' বার্তাবহনকারী অথচ পর্বতের ক্ষেত্রে খোদ আল্লাহ্ কেন?

৬) আয়াতটির বক্তব্যে বোঝা যায় পর্বত ভয়ে বিদীর্ণ হতো বলেই তার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়নি, মহম্মদকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা কি ঠিক?

এমন প্রশ্ন আরও করা যায়। এবং এই প্রশ্নগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি যুক্তিহীন ও অকিঞ্চিৎকর। তবে তদানীন্তন সরল (বস্তুতঃ গোঁয়ার ও অন্ধবিশ্বাসী) আরবদের মনে রসুল ও কোরআনের গুরুত্ব এবং আল্লাহ্র ভয়ংকরতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এমন একটা যুক্তিহীন অসার দম্ভপূর্ণ বাক্যের প্রয়োজন ছিল, অন্য কিছুর জন্য নয়।

আমরা উপরে বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি সহ আলোচনা করে দেখিয়েছি, কোরআনে অনেক অবান্তর ও সাধারণ কথা আছে। সকল উদ্ধৃতি দিতে গেলে বোধকরি

কোরআনের এক দশমাংশ পেশ করতে হবে। কিন্তু কোরআন অনুসারীরা কি এ সিদ্ধান্ত মানবেন? কারণ যদিও প্রতিটি ধর্মের বেশীরভাগ অনুসীরাই যুক্তির চেয়ে অন্ধবিশ্বাসে অনড়, তবে ইসলাম এ বিষয়ে সবচেয়ে কট্টর, কঠোর এবং তুলনাহীন। মুসলমানরা প্রায় সকলেই অন্ধের মত বিশ্বাস করেন, কোরআনে যা আছে তা পৃথিবীর মহার্ঘতম জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং আল্লাহ্‌র অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় একমাত্র বিশুদ্ধ বাণী। এখানে এরূপ অন্ধ বিশ্বাসের একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। মাওলানা মোবারক করীম জওহর মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিরাট পণ্ডিত। দেওবন্দ, দিল্লী, আলিগড়, ইউ.পি. ও কলকাতা থেকে বহু তকমা পেয়েছেন তিনি। তাঁর 'কোরআন শরীফ' বঙ্গানুবাদ (হরফ প্রকাশনী) -এর ৩৮৪ নং পৃষ্ঠার টীকা নং ১৩১ এর এক স্থানে লিখেছেন— '...ইবনেজরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি এবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হলেই জেহাদের জন্য বের হয়ে যেত। এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তালা-সূরা-ক্বদর নাজিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। ...' ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্ণনায় উক্ত উন্মতের (অনুসারী) সারারাত এবাদত (আরাধনা) ও সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকতো বলে উল্লেখিত। খাওয়া বা ঘুমের কথা নেই। না-ই বা থাকলো। কিন্তু এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস কোন ব্যক্তি এমনটা করতে পারে একথা বলা ও বিশ্বাস করতে হলে বিশেষ বস্তু সেবন করা প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সে বস্তুর বদলে আছে অবিচল বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস। আবার বলছি - কোরআনে অত্যন্ত সাধারণ কথা যা ধর্মগ্রন্থে স্থান পাবার যোগ্য নয় তা প্রচুর আছে। অথচ মুসলমানরা ওগুলোকে অসাধারণ বলে মান্য করেন। যুক্তি-অযুক্তির ধার ধারেন না। আর করীম জওহর বললেন, সারাদিন জেহাদকারী নাকি আল্লাহ্‌র চোখে শ্রেষ্ঠ। করুণাময় আল্লাহ্‌র কী নিষ্ঠুর বিচার!

যে সকল শিক্ষিত মুসলমান কোরআনকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন তাদের মধ্যে একজনও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নেই। ১০০ জন কোরআন পড়ুয়ার কাছে প্রশ্ন করে জানা গেছে তাদের মতে আলাদা করে বিজ্ঞান শেখার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, বিজ্ঞানের সব কথাই কোরআনে আছে। আসলে সাধারণ মুসলমানরা কোরআন পড়েন পুণ্য লাভের জন্য। কোরআনে কি আছে তা জানার বা বোঝার প্রয়োজন মনে করে না। বহুকালের বহুশ্রুত প্রচারণা দ্বারা একটা অন্ধ বিশ্বাস তাদের বিচার বুদ্ধিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে এর ভুল-ত্রুটি, অকিঞ্চিৎকরতা ও যুক্তিহীনতা তাঁদের অনেকের চোখেই পড়ে না। যে গ্রন্থকে অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয় ও ঐশীবাণী বলে তাঁদের বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, তা যে উক্ত বিশ্বাস হতে বহু দূরে সে কথা তাঁদের মনেই আসে না। কিছু অসাধারণ বাঙালী মুসলমান আছেন যাঁদের অধিকাংশ কোরআন পড়েন প্যান-ইসলামের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। তাঁরা কোরআনের সামান্য ক'টি ভাল কথা

প্রচার করেন, যেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নেই। পক্ষান্তরে অজস্র খারাপ কথা চেপে যান, যেগুলোকে ভিত্তি করে ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

তবে আলি সিনা (কানাডা), আবুল কাশেম (সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া), সালমান রুশদী, করিমভাই চাগলা, আনোয়ার শেখ, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, আরজ আলী মাতুব্বর, তসলিমা নাসরিনের মত সামান্য দু'চার জন মনীষী তথাকথিত ধর্ম, গোঁড়ামি ও আচ্ছন্নতা হতে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও মানবিকতাকে বিচারের মাপকাঠি করেছেন।

কোরআনের মূল বক্তব্য আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে একই সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন ও প্রলোভনের দ্বারা মানুষকে (হয়ত মক্কা ও মদীনা এলাকার) আরব জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রসুলের অনুসারী করা। বিশুদ্ধ মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা নয়। বরং সম্প্রদায় এবং ধর্মের নামে দলীয় উগ্রতা সৃষ্টিই হচ্ছে সেই পথ। এ কথার সপক্ষে কোরআন থেকে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণ এই— "... সুতরাং যে কেউ এই (কাবা) গৃহের 'হজ্ব' ও 'ওমরা' সম্পন্ন করে, এই দুটো প্রদক্ষিণ করলে তার কোন পাপ নেই। ... " (২: ১৫৮) এর সোজা অর্থ, কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ অর্থাৎ 'হজ্ব' পালন করলে ঐ ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে। নৈতিকতা ধ্বংসের এর চেয়ে বড় টোপ আর কী হতে পারে! আর হজ্ব পালন দ্বারা মক্কা, মদীনা তথা আরবের অর্থনীতি মজবুত হবে তাতে সন্দেহ কী?

১৭ ॥ কোরআনে স্ব-বিরোধিতা

কোরআন তথা ইসলাম ধর্ম মতে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ প্রণম্য নন। এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সেজদা (প্রণাম) করা হারাম বা মহাপাপ। অথচ আল্লাহ্ নিজেই এ মহাপাপের কাজটি করতে বলেছেন। কোরআনের একাধিক স্থানে তার উল্লেখ আছে। যেমন— "ফেরেশ্তাগণকে বললাম, তোমরা **আদমের প্রতি প্রণত হও**, ..." (২:৩৪)

"... তারপর ফেরেশ্তাগণকে বলেছিলাম যে, **আদমকে সেজদা *(প্রণাম)* কর**, ..." (৭:১১)

অথচ কোরআনেই বলা হয়েছে, "... তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সেজদা আল্লাহ্কে ... " (৪১: ৩৭) এ সব কি স্ববিরোধিতা নয়?

কোরআনে জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম স্বীকৃত নয়। মৃত্যুর পর স্বর্গে বা নরকে (জান্নাতে বা দোজখে) অনন্ত জীবনের উল্লেখ আছে বহুবার। যেমন, 'ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে (স্বর্গে) আর মৃত্যুর আস্বাদন করবে না, ..." (৪৪: ৫৬)। কিন্তু, "**প্রথম মৃত্যুর পর** এবং আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না।" (৩৭: ৫৯) এ

আয়াতে প্রথম মৃত্যু বলা তো পরোক্ষে জন্মান্তরের কথাই বলা হল। নয় কি?

"তারা বলে ইহুদী ও নাসারা ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে দাখেল হবে না (অর্থাৎ স্বর্গে নেওয়া হবে না)। এসব তাদের মনগড়া কল্পনা মাত্র। তুমি বল তোমরা প্রমাণ নিয়ে এস যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।" (২:১১১)

" হে বিশ্বাসীগণ। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করোনা, ... আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (৫:৫১)

এই আয়াত দুটিতে ইহুদীদের বিপক্ষে বলা হয়েছে। একটিতে তাদের দাবি মিথ্যা বলা হয়েছে। অপরটিতে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটিতে খ্রীষ্টানদিগকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার— "তোমরা বল... এবং মুসা ও ইসাকে যা দেওয়া হয়েছিল, এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালক হতে যা দেওয়া হয়েছিল, সমস্তের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। ..." (২:১৩৬)

"... এবং যারা ইহুদী, সাবেইন ও খ্রীষ্টান, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে; বস্তুত তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না।" (৫:৬৯) এবং ২:৬২ নং আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

উপরে উদ্ধৃত আয়াত দুটিতে স্পষ্টতঃই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে স্ব-বিরোধিতা হল নাকি?

ইহুদীদের সম্পর্কে কোরআনের এই স্ব-বিরোধিতার কারণটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত আনোয়ার শেখ লিখিত 'ইসলাম আরবদের জাতীয় আন্দোলন' নামক পুস্তকের (ইংরেজী হতে বাংলা অনুবাদ) ৫৫ নং পৃষ্ঠায়, এই ভাবে— 'ইসলামকে আব্রাহামের ধর্ম বলে ঘোষণা করে মহম্মদ অধিকাংশ ইহুদী নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মূলতঃ তিনি ইহুদীদের সাথে তাঁর নিজের গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন, যাতে তিনি ইহুদীদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং সেই জন্য তিনি ইহুদীদের চমৎকারিত্বের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইহুদীরা তাদের জাতীয় পরিচয় হারাতে নারাজ, তখন তিনি তাদের প্রতি সরাসরি ঘৃণা প্রকাশ করে অবিমিশ্র আরব জাতির প্রতিষ্ঠা করলেন।"

"ধর্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নেই, ... " (২:২৫৬) — এই বাণীটি কোরআন তথা ইসলামের ঔদার্য প্রকাশ করে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিছু সংখ্যক মুসলিম কোরআনের এই আয়াতটিকে ইসলামের মহত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে প্রচার চালাচ্ছেন। তাদের মুখে শুনে হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিজীবীও তোতা পাখীর মত ঐ কথা আওড়ান ভয় পেয়ে অথবা সরকারী পুরস্কারের লোভে। কিন্তু মুসলিম আলেমরা যে এ বাণীটি গর্বের সাথে পুনঃ পুনঃ ইসলামের শান্তি নীতির নজীর হিসাবে উপস্থাপিত

করেন, তা বিধর্মীকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কেননা, কোরআনের বহু জায়গায় এর বিপরীতধর্মী অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ইসলাম প্রচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন—

১। "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যা বৈধ করেছেন, তা বৈধ জ্ঞান করে না, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সত্য ধর্ম স্বীকার করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যে পর্যন্ত তারা অধীনতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিজিয়া দান না করে।" (৯:২৯) জিজিয়া কর বলতে বুঝায় মুসলমান রাজত্বে অমুসলমানদের জন্য নির্দ্ধারিত দেয় কর; ভাষান্তরে জরিমানা।

২। "... সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না, এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (২৫: ৫২)

৩। "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস সমূহ বিগত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে, বধ করবে; তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ মুক্ত করে দেবে; ..." (৯: ৫) *অংশীবাদী বলতে বুঝায় তাদেরকে, যারা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ বহুদেববাদী এবং প্রতিমা-পূজক।*

এই ধরনের হিংসা, বল প্রয়োগ ও নরহত্যার নির্দেশ দান কোরআনে প্রচুর বিদ্যমান। এগুলি যে কোরআনের বল প্রয়োগ না করার উপদেশের (২:২৫৬) বিপরীত নির্দেশ তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?

কোন দিকে ফিরে নামায পড়তে হবে, সে ব্যাপারে কোরআন বলছে —

" পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই; অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও সেই দিকই আল্লাহ্র দিক, ... " (২: ১১৫)। এ আয়াতটিতে নামায কোন মুখী হয়ে পড়বে, সে সম্পর্কে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অথচ— "... অতএব তুমি পবিত্রতম মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফেরাও, তোমরা যেখানেই থাক না কেন ওর দিকে মুখ ফেরাও, ... " (২: ১৪৪)। আবার— "এবং তুমি যেখান হতেই বের হও, পবিত্র মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও, এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ওর দিকে মুখ ফেরাও, ..." (২: ১৫০) তাহলে দেখা যাচ্ছে, একই অধ্যায়ে (সূরায়) নামাযের দিক সম্পর্কে স্ব-বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে।

"আমি শপথ করছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির, ..." (৭০: ৪০) —এই আয়াতটি সম্পর্কে আগেও একবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রসঙ্গটি এই যে, উদয়াচল ও অস্তাচল প্রতিটিই এখানে একাধিক নয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এবং তা বাস্তব বা প্রকৃতি সম্মতও বটে। কিন্তু "তিনি পূর্বে দুই উদয়াচল ও পশ্চিমে দুই অস্তাচলের প্রতিপালক।" (৫৫:১৭) এই আয়াতে উদয়াচল ও অস্তাচল

যথাক্রমে দুইটি করে বলাতে পূর্ব আয়াতের (৭০:৪০) বিরোধী হল নাকি? আর উদয়াচলই হোক কি অস্তাচলই হোক তা' কি দুটো করে?

কেয়ামত/কিয়ামত বলতে ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের পর মানুষের পুনরুত্থান ও আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের কর্মফলের চূড়ান্ত বিচারের দিন বুঝায়।

কোরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে, কেয়ামতের দিন মানুষ ও জ্বিনদের (এরূপ কোন প্রাণীর অস্তিত্ব বাস্তব বা বিজ্ঞান সম্মত কি?) কৃতকর্মের বিচার স্বয়ং আল্লাহ্ করবেন। এবং বিচারে পাপ ও পুণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী দোজখে (নরকে) বা জান্নাতে (স্বর্গে) তাদের স্থান হবে। যেমন—

"একদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেটাই শাস্তির দিন।" (৫০: ২০) এ আয়াতে অনির্ধারিত এক ভবিষ্যতের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু— "... এবং পরে ওদের জাহান্নামে উপস্থাপিত করা হয়েছিল; ... " (৭১: ২৫)

"... অতঃপর ওদের পরিণাম এই হল যে, ওদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" (৪৬:২৫)

"... অতঃপর আমি ওদের কৃতকর্মের পরিণাম রূপ লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তির কশাঘাত হানলাম।" (৪১: ১৭)

"ওদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম, ... " (২৯: ৪০)

উপরের আয়াতগুলির প্রথমটিতে (৫০:২০) ভবিষ্যৎ কেয়ামতের বিচারের ইঙ্গিত করা হয়েছে অথচ পরের আয়াতটিতে (৭১:২৫) অতীতেই অর্থাৎ কেয়ামতের আগেই জাহান্নামে উপস্থাপিত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং পরের আয়াতগুলিতে দেখা যায়, পৃথিবীতেই পাপীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাহলে ভবিষ্যৎ বিচারের বা কেয়ামতের কথা উল্লেখিত যে সমস্ত আয়াত, যথা— ২১:১; ২৭:৯০; ৩০:১২; ৩৬:৫১; ৫০:২০; ৫১:১৩ ইত্যাদির বক্তব্যের সাথে স্ব-বিরোধী হল না কি? অবশ্য তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ইহ্ জাগতিক শাস্তির পর পুনরায় পারলৌকিক শাস্তিও দেওয়া হবে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এক অপরাধের জন্য দু'বার শাস্তির ব্যবস্থা কি পরম দয়ালু সর্বোচ্চ বিচারক আল্লাহ্‌র অবিচার বা যথেচ্ছাচারিতা হয়ে যায় না?

যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার নিয়েও কোরআনে স্ব-বিরোধিতা আছে। যেমন— "... যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যসম্ভার আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের, ..." (৮:১) আবার বলা হয়েছে, "... যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র ও রসুলের এবং রসুলের আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃহীন য়্যাতীম[১] ও দরিদ্র এবং পথিকদের জন্য ..." (৮:৪১)। লক্ষ করার ব্যাপার, প্রথমে উদ্ধৃত ৮:১ নং আয়াতে বলা হল, যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যসম্ভার আল্লাহ্ ও তার রসুলের। একটু পরেই ৮:৪১ নং আয়াতে অন্য রকম বলা হল। আশমানী কিতাব কোরআনে কেন এই স্ব-বিরোধিতা?

আবার এই ৮:৪১ নং আয়াতের পরবর্তী অংশটুক হচ্ছে— "... যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস কর এবং যেদিন উভয় দল সম্মিলিত হয়েছিল, সেই মীমাংসার দিবসে আমি স্বীয় দাসের উপর যা অবতীর্ণ করেছিলাম, তার প্রতি বিশ্বাসী হও। এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।" এ অংশে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হলে কী হবে তা মোটেই স্পষ্ট হল না। এবং 'উভয় দল' বলতে যদি 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' হয় তবে 'সম্মিলিত হয়েছিল' বোধকরি যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল; কিন্তু তখন 'কী' অবতীর্ণ হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই এবং প্রথম অংশের সাথে শেষ অংশের কোন মিল নেই। এবং কে বক্তা তাও বোঝা যায় না। ঐশী বাণীই বটে।

সমুদ্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত পর পর আয়াত দুটি শুধু স্ব-বিরোধীই নয় ভৌগোলিক বাস্তবতারও বিরোধী। কেননা সমুদ্র তো শুধু দুইটি নয়। অথচ বলা হল, " তিনি দুই সমুদ্রকে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়। (৫৫: ১৯)

" কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না (কেউ কারো সাথে মিলিত হয় না)। " (৫৫:২০)

উদ্ধৃত প্রথম আয়াতটিতে বলা হল, সম্মিলিতভাবে দুটি সমুদ্রকে প্রবাহিত করার কথা অথচ পরবর্তী আয়াতটিতে বলা হল ওদের মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় ব্যবধান।

" এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের গালি দিও না। ..." (৬:১০৮; মক্কী সূরা) — এ আয়াতটির বক্তা আল্লাহ্ এবং লক্ষ্য মহম্মদ। যদিও এর পূর্ববর্তী ১০১ নং হতে ১০৬ নং আয়াত পর্যন্ত বক্তা একজন নন। যাহোক, আল্লাহ্ মহম্মদকে যাদের গালি দিতে নিষেধ করলেন, সেই দেব মূর্তিগুলিকে মহম্মদ শুধু গালি নয়, মদীনা হতে এসে নিজের হাতে লাঠি দিয়ে ভেঙ্গেছেন কার নির্দেশে? কোরআনের এও আর এক স্ব-বিরোধিতা। এতে বোঝা যায় মহম্মদ মক্কায় যখন দুর্বল ছিলেন তখনকার নীতি ও মদীনায় এসে তাঁর শক্তিশালী হওয়ার পরবর্তী নীতি পরস্পর বিরোধী।

কোরআন কয়েকস্থানে মহম্মদ পূর্ববর্তী অনেক নবীকে মানুষের সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল এমন উল্লেখ আছে। যেমন, "নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, ... প্রকাশ্য সতর্ককারী। (১১:২৫)

অথচ ৩৬:৬ নং আয়াতে আবার বলা হল, "যাতে তুমি সতর্ক করতে পার, এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ..." এদুটি আয়াত কি স্ব-বিরোধী হল না?

আসমান-জমিন সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনে আছে, "আল্লাহ্ই আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন— 'হও'; অমনি তা হয়ে যায়।" (২:১১৭) অনুরূপ কথা কোরআনে একাধিক স্থানে আছে। যেমন— ৩: ৪৭; ১৯: ৩৫; ৩৬: ৮২; ৪০: ৬৮ ইত্যাদি। লক্ষণীয় এ দাবি আল্লাহ্

করছেন না। অন্য কেউ তাঁর সম্পর্কে বলছেন। কোরআনেই আসমান, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কোথাও আল্লাহ্‌র, কোথাও বা অন্যের জবানিতে বলা হয়েছে। "আমি আসমান ও জমিন এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি, ..." (৫০: ৩৮)। "আল্লাহ্ যিনি আসমান ও জমিন ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। ..." (৩২:৪)। অনুরূপ কথা— ৭:৫৪; ১১:৭; ৫৭:৪ আয়াতগুলিতে আছে। কিন্তু ৪১নং সূরার (সূরা হা-মীম-আস-সিজদাহ) ৯ হতে ১২নং আয়াতগুলির ফিরিস্তি মোতাবেক দেখা যায়, পৃথিবী দু'দিনে, খাদ্যাদি চার দিনে ও সপ্ত আকাশ দুদিনে অর্থাৎ মোট আট দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন আমাদের মনে ধন্দ উপস্থিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র 'হও' বললেই সব হয়ে যাওয়া কিংবা ছয়দিনে অথবা আট দিনে আসমান জমিন ও তাদের অন্তবর্তী সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে বলে কোরআনের বিভিন্ন বক্তব্যগুলির কোন্‌টা সত্য বলে মানবো? সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র অভ্রান্ত কোরআনের এ বিভ্রান্তি কোন ইসলামী তত্ত্ববিদ নিরসন করলে আমাদের কিছু জ্ঞান হতে পারে।

"হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা ...। কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? ..." (৬০:১) আল্লাহ্‌র স্পষ্ট সরাসরি নির্দেশ শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব না করার। অথচ ঐ একই সূরার ৭ নং আয়াতে আর কারো ভাষায় বিরুদ্ধ কথা বলা হল— "যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে **সম্ভবত** আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন;..." (৬০:৭) বিরুদ্ধ কথা তো বটেই আবার আল্লাহ্‌র করণীয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংশয় প্রকাশকারী বা অনুমানকারীটা কে?

নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত দুটি স্পষ্টভাবে স্ব-বিরোধী—

"তারা (সৃষ্টির অন্তর্গত জীবজন্তু ও ফেরেশ্‌তাগণ) তাদের সমুন্নত প্রতিপালককে ভয় করে এবং **যা অদিষ্ট হয় তা করে থাকে**।" (১৬:৫০)

"... সে (ইবলিস) তার প্রতিপালকের (আল্লাহ্‌র) **আদেশ অমান্য করল**, ..." (১৮:৫০)

সকল মানুষই অকৃতজ্ঞ বা পাপী নয়। কিন্তু কোরআন মাঝে মাঝে অন্য কথা বলে। যেমন, "মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ।" (৮০:১৭) এই আয়াতটিতে 'মানুষ' ও 'সে' একবচন হলেও মানুষ জাতই বক্তব্যের লক্ষ্য। কোরআনের অনেক স্থলে এরূপ একবচন শব্দ দ্বারা জাতি বোঝান হয়েছে (৮২:৬-৮)। আয়াতটি যে আল্লাহ্‌র ভাষায় নয়, তা পরবর্তী আয়াতগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। যা হোক, এখানে সকল মানুষকে অকৃতজ্ঞ বলে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে। এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ৮০ নং সূরাটির (সূরা আবাসা) ১ নং হতে ১৬ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র জবানিতে এবং বিষয়বস্তু একেবারে ভিন্ন ধরনের যার সাথে পরবর্তী

আয়াতগুলির বক্তব্যের কোন সংগতি নেই।

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন মানুষ কবর হতে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। ওরা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! ..." (৩৬: ৫১- ৫২) এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় নাকি যে, সকল মানুষই পাপী? কেননা তাদের 'হায় আমাদের দুর্ভোগ' এ আক্ষেপ হতেই তা স্পষ্ট। কিন্তু সকল মানুষ পাপী তা কি হতে পারে? তা যে পারে না, কোরআনের অন্যত্র তার প্রমাণ আছে— "এবং নিশ্চয় গ্রন্থানুগামীগণের মধ্যে এরূপ অনেকে আছে, যারা আল্লাহ্‌র নিকট হতে, এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত হয়ে তাতে বিশ্বাস করে, ... (৩:১৯৯) অতএব এ আয়াত দুটি পরস্পর বিরোধী। আরও একটি উদাহরণ, যেমন, "অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশে সুস্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন প্রতিপন্ন হবে। এবং তা মানব জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। তখন ওরা বলবে— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে শাস্তি রহিত কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।" (৪৪: ১০-১২)

উল্লিখিত আয়াতে 'তুমি'টি কে তা স্পষ্ট নয়, কেননা এর আগের ও পরের আয়াতগুলিতেও তার উল্লেখ নেই। তা না হলেও এ 'তুমি' হয়ত মহম্মদ। কিন্তু মহম্মদ বা অন্য কোন মানুষ কি এতটা দীর্ঘজীবী হতে পারে যে, কেয়ামত (কবে হবে তারও নিশ্চয়তা নেই) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে? যাহোক, আসল কথা হচ্ছে, আয়াতটিতে মানব জাতির জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বিধানের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল সকল মানুষই পাপী। আবার নিম্নলিখিত আয়াতে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়েছে— "... সেদিন (কিয়ামত) একদল জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করবে।" (৪২:৭) অর্থাৎ বোঝা গেল সব মানুষই পাপী নয়।

কোরআনের অনেক আয়াতে কিয়ামতের বিচারের পরই মানুষের বেহেশ্‌ত বা দোজখ ভোগের কথা বলা আছে। যেমন— "ফলে কিয়ামত কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত," (৫৬: ৩) "যারা ডান পার্শ্বে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান!" (৫৬: ২৭) " যারা বামদিকে থাকবে, কত হতভাগ্য তারা," (৫৬: ৪১)

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ঘোষণা করা হয়েছে, বেহেশ্‌ত বা দোজখ ভোগের ব্যবস্থা কিয়ামতের বিচার হওয়ার পর। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি প্রশ্ন ওঠাতে হয় যে, ডান ও বাম পার্শ্বের কথা বলা হয়েছে যথাক্রমে পুণ্যবান ও পাপীদের সম্পর্কে, কিন্তু কার ডান বা বাম পার্শ্ব তার উল্লেখ নেই। না থাকলেও এটা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র ডান বামের কথাই বলা হয়েছে। এবং তাই যদি হয় তবে একটি মারাত্মক প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ্ নিরাকার হলে তার ডান বামের কথা কেমন করে সম্ভব হয়? যা হোক, আমরা বলছিলাম যে, কিয়ামতের বিচারের পরেই মানুষের পুরস্কার বা শাস্তির কথা কোরআন ঘোষণা করেছে। অথচ এর বিপরীত কথা কোরআনেই আছে। যেমন—"এই দিন

জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে।" (৩৬:৫৫) কিংবা, "...পরে ওদের জাহান্নামে উপস্থাপিত করা হয়েছিল... " (৭১: ২৫)

অথবা, "অনন্তর তারা যা বলেছিল, তজ্জন্য আল্লাহ্ প্রতিদান-স্বরূপ তাদের জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করিয়েছেন। ..." (৫: ৮৫)

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে বোঝা যাচ্ছে কিয়ামতের বিচার হওয়ার পূর্বেই বিশ্বাসীদের জান্নাতে এবং অবিশ্বাসীদের দোজখে প্রেরণ করা হয়েছে। একি স্ব-বিরোধিতা নয়?

মদ খাওয়া সম্পর্কেও গ্রন্থটিতে পরস্পর বিরোধী কথা আছে। মদ বর্জন করতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে কোরআনে — "হে মোমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ কর, ..." (৫:৯০)

আবার মদ খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ নয়, এমন কথা কোরআনেই আছে। যেমন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা মদ্যপান অবস্থায় উপাসনার নিকটবর্তী হয়োনা, যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা বুঝতে না পার।" (৪:৪৩)

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, বল উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, ..." (২:২১৯)

কোরআনেই আবার মদের ঢালাও ব্যবস্থার কথা আছে নেক্কার (পুণ্যবান) বিশ্বাসীদের জন্য; তবে তা বেহেশতে। কোরআনের ভাষায়— "তাদের মোহর করা পাত্র হতে বিশুদ্ধ সুরা পান করান হবে।" (৮৩: ২৫) কোরআন আরো বলছে, "...আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, ..." (৪৭: ১৫) "তাদের ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা পরিবেশন করা হবে।" (৩৭: ৪৫) কিন্তু পৃথিবীতে যে মদ হারাম করা হয়েছে, তাকে বেহেশ্‌তে পান করানো হবে কোন যুক্তিতে? অথবা এটাই কি বুঝবো যে, মানুষকে আকৃষ্ট করতে মিথ্যে প্রলোভন দেখানো হয়েছে?

আল্লাহ্ কোরআনে ঘোষণা করেছেন, তিনি আরবী ভাষায় কোরআনকে সহজ করেছেন, যাতে মহম্মদ ও তাঁর প্রতিবেশীরা সহজেই তা বুঝতে পারে (দেখুনঃ ৪৩:৩; ৪৪:৫৮; ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০)। অথচ, সুরা আল ইমরান-এর (৩নং সূরা) ৭নং আয়াতে বলা হল, "... এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার অর্থ কেউই জানেন না।" স্ব-বিরোধিতা হল না কি?

কোরআনের বহু জায়গায় অবিশ্বাসীদের অর্থাৎ অমুসলমানদের জন্য পরলোকে দোজখ বা নরকের শাস্তির অনন্ত ব্যবস্থা করা আছে। যেমন, "... যারা অবিশ্বাস করে তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, ওরাই সৃষ্টির অধম।" (৯৮:৬)

আবার অজস্র আয়াতে বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য বেহেশ্‌তের অঢেল দৈহিক সুখের ব্যবস্থা আছে। যেমন, " আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

কর ... তাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে।" (৫৭:৭)

উল্লিখিত আয়াতগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে মানুষকে 'বিশ্বাসী' এবং 'অবিশ্বাসী' হিসেবে ভাগ করে যথাক্রমে পারলৌকিক পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে এই আয়াতটি— "... যারা মন্দ কাজ করে, তিনি (আল্লাহ্) তাদের মন্দ ফল দেন, যারা ভাল কাজ করে, তিনি তাদের ভাল ফল দেন" (৫৩: ৩১) আগের আয়াতগুলির (৯৮: ৬ ও ৫৭: ৭) বিরোধী হয়ে গেল না কি? কেননা 'বিশ্বাসীরা' যদি মন্দ কাজ করে, কিংবা 'অবিশ্বাসীরা' যদি ভাল কাজ করে তখন আল্লাহ্ কী করবেন?

" আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে; সুতরাং ওরা যেন তোমার সাথে এই ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর,..." (২২:৬৭)

পরিষ্কারভাবে মহম্মদকে লক্ষ করে আল্লাহ্র জবানিতেই আয়াতটি বলা হয়েছে। এ আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ্ বললেন প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য তিনি ধর্ম-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তারা তা-ই পালন করে। অথচ আয়াতটি শেষ দিকে বলা হল, 'তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর'— এই অংশটুকু স্ব-বিরোধী। এবং যে কোরআন কেবলমাত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রচিত হয়েছে, সেখানে "আমি প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে..." ইত্যাদি বলাটা একেবারেই স্ব-বিরোধিতা; অথচ কোরআনে স্ববিরোধিতা নেই বলে দাবি করা হয়েছে। (দেখুন ৪/৮২)

ইসলাম ধর্মের বিদগ্ধ পণ্ডিত মোঃ আকরাম খাঁ তাঁর 'মোস্তাফা চরিত'-এর ২৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "আমাদের আলেমগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, কোরআনের দুইটি আয়াত যদি পরস্পর বিরোধী হয়, এবং যদি তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উভয় আয়াতই পরিত্যাজ্য হইবে।"

আমাদের প্রশ্ন - আলেমগণ কোরআন না পড়েই উপরোক্ত কথাটা বলেছেন বলে কি যৌক্তিক মনে হয়? বরং আমরা যেমন বুঝেছি, আলেমগণও (তাঁরা মুসলমানই) তেমনি বুঝেছেন যে, কোরআনে স্ব-বিরোধিতা আছে। না হলে তাঁরা বিশেষত মুসলমান হয়ে একথা বলবেন কেন? কিন্তু "বাঁশবনে ডোম কানা" বলে একটা প্রবাদ আছে। পণ্ডিত প্রবর খাঁ সাহেব 'মোস্তাফা চরিতে' অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, আমরা সেজন্য তাঁর প্রশংসা করি। কিন্তু কোরআন ও রসুল সম্পর্কে তিনি ঐ বাঁশবনের কানা ডোমের ভূমিকা পালন করেছেন। তাই উপরোক্ত ২৪৬ নং পৃষ্ঠার ফুট-নোটে মন্তব্য করেছেন— "লেখক এই মত স্বীকার করেন না, কারণ এই প্রকার আত্মবিরোধ কোরআনে থাকাই অসম্ভব।" এ হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাসের ভাষা, যুক্তির ভাষা নয়। খাঁ

সাহেবের অন্ধ ভক্তির আরও অনেক নমুনা তাঁর গ্রন্থটিতে আছে।

কোরআনের স্ববিরোধিতার ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে দু'টি মত আছে।

এক: স্ব-বিরোধী আয়াত সবগুলিই পরিত্যাজ্য।

দুই : স্ব-বিরোধী আয়াতগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াত বাতিল করে পরবর্তী আয়াতটি গৃহীত হবে।

এখন আলেমগণের মত দু'টির পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় মতটি যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও একটি প্রশ্ন ওঠে। তা হচ্ছে — তবে কি আল্লাহ্‌র ভুল হয়? কিংবা তিনি কি তাহলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত নন? এই প্রশ্নের উত্তর যদি এই হয় যে, স্ববিরোধী আয়াতগুলি আল্লাহ্‌র নয় তবে আবার দু'টি প্রশ্ন আসে। এক: কোনটি আল্লাহ্‌র নয়? দুই: যদি কোন একটি আল্লাহ্‌র না হয়, তবে কোরআনে মানব রচিত অংশ আছে বলে প্রমাণিত হয়।

এতক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় 'কোরআনে স্ব-বিরোধিতা' প্রসঙ্গে যা বলেছি তা যথেষ্ট। যদিও অনুরূপ উদাহরণ কোরআনে আরও আছে। বস্তুতঃ গ্রন্থটির অনেক কথাই পরস্পর বিরোধী, বিভ্রান্তিকর, অস্বাভাবিক, পারম্পর্যহীন ও অসংলগ্ন। অবশ্য এর জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী। আমাদের মতে সেগুলি হচ্ছে—

১) কোরআন প্রবক্তার যখন যেখানে যেটা খাটে সেটাই বলার প্রবণতা।

২) স্মৃতি-বিভ্রম।

৩) ভাষার উপর যথাযথ দখল না থাকা।

৪) প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বহুদিন পর সংকলনের সময় সংযোজন, অঙ্গচ্ছেদ, স্থানান্তর, পরিবর্তন ইত্যাদি ত্রুটি। এবং

৫) দীর্ঘকাল ব্যাপী (প্রায় তেইশ বছর) বিপুল সংখ্যক (ছয় হাজারের বেশী) আয়াতের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সমন্বয়ের অভাব।

১। য়্যাতিম (এতিম) অর্থ পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক-বালিকা।

১৮ ॥ ইব্‌লীস ও অন্যান্য ফেরেশতা সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন

" তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে ছিল জ্বীনদের একজন,... " (১৮: ৫০) এই আয়াতে এবং কোরআনের আরও অনেক আয়াতে (২:৩৪, ৩৬, ৬:১৪২, ৭:১১, ১৪-২২, ২৭) ইব্‌লীস অর্থাৎ শয়তান একজন বলা হয়েছে। অথচ— 'ফলে শয়তানরা উর্দ্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না, ...' (৩৭: ৮) এ আয়াতে এবং

আরও কয়েক স্থানে (২৬: ২১১-২২২) শয়তানের সংখ্যা একাধিক বলা হয়েছে, যদিও নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই। এবং এটাও উল্লেখ নেই যে, এক হতে তাদের একাধিক হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা। সময়ের ব্যবধান যাই হোক ধরে নেওয়া যাক, শয়তান বংশ বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব হল? তাদের স্ত্রী ছিল এমন কথা তো কোরআনে দেখি না। অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ, যথা— জিব্রাইল, মিকাইল, আজরাইল, ইস্রাফিল, কিরামান, কাতেবিন, মুনকীর, নাকির ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, শয়তানের মত তাদেরও কি বংশবৃদ্ধি ঘটেছে? যদি ঘটে থাকে, তবে কোরআনে তার উল্লেখ দেখি না কেন? এবং এদের মধ্যে অন্তত আজরাইল (প্রাণ হরণকারী ফেরেশ্‌তা), কিরামান, কাতেবিন (মানুষের কাঁধে বসে থেকে তাদের সকল কর্মের হিসাব রক্ষক দুইজন ফেরেশ্‌তা) মুনকির, নাকির (মানুষের মৃত্যুর পর প্রশ্নকারী দুই ফেরেশ্‌তা) ইত্যাদির বংশ বৃদ্ধিই বা কীভাবে ঘটলো? মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি না ঘটলে সেইসব কাজ সম্পন্ন হয় কীভাবে? মানুষের মতই যদি তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে, তবে মনে রাখতে হবে তাঁদের নাকি মৃত্যু নেই। এমতাবস্থায় অর্থাৎ তাঁদের মৃত্যু না ঘটলে সংখ্যাটা কী দাড়াঁতে পারে ধারণা করা যায় কি? কোরআনে কিন্তু এসব নিয়ে কোন কথার উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই কোন নারী ফেরেশ্‌তারও।

আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিল শয়তান (কোরআন ২:৩৪; ৭:১১-১২)। এতে বোঝা যায়, সে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত সব কিছু হয় না। কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত শয়তান কাজ করেনি। সে কারণে আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশ্‌ত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারেননি। বরং শয়তান এতদূর শক্তিশালী যে, সে আল্লাহ্‌র শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে আদম ও হাওয়াকে (বাইবেল ও কোরআনের মতে আদি মানব মানবী) কুমন্ত্রণা দিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে তাদের স্বর্গচ্যুত করেছে এবং তাদের বংশধর মানুষদের নাকি পথভ্রষ্ট করবার জন্য পেছনে লেগে আছে। (দেখুন ঃ কোরআন - ৭:১৬-১৭)

প্রসঙ্গক্রমে বলি— 'সূরা সাফ্‌ফাত' (৩৭ নং সূরা) এর ৭ হতে ১০নং আয়াত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই যে, আল্লাহ্‌ আকাশকে শয়তানদের হাত হতে সুরক্ষিত করেছেন ওদের প্রতি অবিরাম উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের ব্যবস্থা করে, যাতে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে না পায়। তবু যদি কেউ (শয়তানদের) হঠাৎ কিছু শুনে ফেলে, তাহলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। কোরআনের এই বিবরণ সম্পর্কে কয়েকটি সংগত প্রশ্ন—

১) উল্কাপিণ্ড সম্পর্কিত জ্যোতির্বিজ্ঞানে বর্ণিত তত্ত্ব কি ভুল?

২) আল্লাহ্‌র আশমান রক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কি ত্রুটিপূর্ণ? (কেননা তাঁর ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও শয়তানদের কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেলে কী করে?)

৩) ঊর্ধ্ব জগতের 'কিছু'-টা কী এবং শয়তানরা শুনে ফেললেই বা কী, যেহেতু আল্লাহ্ তো ইচ্ছা করলেই তার প্রতিবিধান করতে পারেন? এবং

৪) বোঝা যায় শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে না পায় এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। যদি তাই হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে 'হও' বললেই তাঁর ইচ্ছাটা পূর্ণ হল না কেন? এত উল্কাপিণ্ডের জটিল ব্যবস্থাপনার চেয়ে সেটাই সোজা ছিল না কি? বস্তুতঃ উল্কাপিণ্ডের পতনের কারণ নিয়ে শয়তানদের জড়িয়ে কোরআনের এই বর্ণনাটা অবৈজ্ঞানিক লোক প্রচলিত 'একটা রূপকথা' গোছের কথা বৈ কিছু নয়। আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্ব অধঃ বলে কিছু আছে কি? গোলাকৃতি পৃথিবীরই কি একটা নির্দিষ্ট ঊর্ধ্ব দিক বলে কিছু আছে?

১৯ ॥ কোরআনের অযৌক্তিক ও বুদ্ধি-অগ্রাহ্য কিছু কথা

যিনি 'হও' বললেই সব হয়ে যায় (কোরআন ১৯: ৩৫, ৩৬: ৮২, ৪১: ৬৮ ইত্যাদি), যিনি যাকে ইচ্ছা সৎ বা অসৎ পথে চালিত করেন ("... আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ পায়। এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।" ১৮: ১৭), যিনি মানুষের দৃষ্টি, কর্ণ ইত্যাদি সীল মোহর করেন (কোরআন ১৭: ৪৬) এবং যিনি আগেই স্থির করেছেন, জ্বিন ও মানুষ দ্বারা দোজখ পরিপূর্ণ করবেন (কোরআন ৩২:১৩) সেই সর্বজ্ঞ স্বেচ্ছাচারী ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কেন যে কোরআন শরীফের মত বিরাট পুস্তকের অধিকাংশ স্থানে বার বার ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে সকল মানুষকে 'বিশ্বাসী'[১] অর্থাৎ মুসলমান করে তুলতে প্রাণান্ত হয়েছেন সে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এতে তো তাঁর সর্বশক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল না। যদি তর্কের খাতিরে বলা যায় মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য (৭৬: ২), তবে তার উত্তরে বলতে হয় যিনি সর্বজ্ঞ তিনি তো আগেই জানেন ভবিষ্যতে কী হবে। পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হবে, কে হবে না। সুতরাং পরীক্ষার যুক্তিটা ধোপে টেকে না। তাছাড়া আল্লাহ্ যখন নিজেই বহুবার কোরআনে বলেছেন, তিনি তাঁর ইচ্ছামত মানুষকে সৎ বা অসৎ পথে পরিচালিত করেন, কাজেই সৎ বা অসৎ হওয়ার জন্য মানুষকে দায়ী করা যায় কি ? অতএব, কোরআনে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করা কিংবা ভয় ও লোভ দেখানো দ্বারা ইসলামে বিশ্বাসী করে তোলার এই পুনঃপৌনিক একান্ত প্রয়াস একেবারেই অযৌক্তিক, সামঞ্জস্যহীন, স্ব-বিরোধী বক্তব্য ছাড়া আর কি?

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, 'লূত' নামের মহম্মদ পূর্ববর্তী একজন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের

সাথেই উপগত হও (যৌন মিলন)। এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরা তো সীমালঙঘনকারী সম্প্রদায়।" (২৬:১৬৫-১৬৬) এই 'লূত' এর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব কোরআনের মত গ্রন্থ ছাড়া কোথাও আছে বলে জানা যায় না। যাহোক, তাঁর বক্তব্যটি একেবারেই অবাস্তব ও যুক্তিহীন। কেননা একটি সম্প্রদায়ের সকল পুরুষ বিপরীত লিঙ্গ নারীদের বর্জন করে অস্বাভাবিকভাবে কেবল পুরুষদের সাথে মৈথুন করতে পারে না। যদি কোরআনের উক্ত বক্তব্য সত্য বলে ধরা হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে— সে সম্প্রদায়ের নারীরা পুরুষ ব্যতীত কী করে গর্ভধারণ করত? যদি তা সম্ভব না হয়, তবে উক্ত সম্প্রদায়ের বংশবৃদ্ধি কী করে হয়েছিল? আল্লাহ্‌র অভ্রান্ত বাণী (?) কোরআনে এরূপ আজগুবি ও যুক্তিহীন কথার অভাব নেই।

উক্ত কেতাবে নবী ইউনুস সম্পর্কে বলা হয়েছে— "পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে হল ধিক্কারযোগ্য। যদি সে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত মৎস্য গর্ভে।" (৩৭:১৪২-১৪৪) বক্তব্যটি একান্ত বাস্তবতাবর্জিত ও উদ্ভট কল্পকাহিনী। যদি কোন মানুষকে কোন বৃহদাকার মাছ গিলেই ফেলে (এটা অসম্ভব নয়) তবে ঐ মানুষটির মৃত্যু নিশ্চিত। অথচ এখানে বলা হয়েছে, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাকে থাকতে হত মৎস্য গর্ভে'। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রায় চৌদ্দশ বছর কেটেছে; কিন্তু,'পুনরুত্থান দিবস' অর্থাৎ কিয়ামত এখনও আসেনি। ঐ কিয়ামত কবে আসবে তাও উল্লেখ করা হয়নি কোরআনে। অথচ সেই অনিশ্চিত সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ পর্যন্ত মাছটি এবং তার গর্ভস্থ মানুষটি যে বাঁচতে পারে না তা অবধারিত। কিন্তু সেই নিশ্চিত প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করে ঐ অদ্ভুত ও অবাস্তব কথা আয়াতটিতে ঘোষণা করা হয়েছে। এই হচ্ছে সর্বজ্ঞ, পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র অভ্রান্ত কোরআন। মনে রাখতে হবে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতা মেনেও আমরা এমন কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে পাই না, যেখানে প্রকৃতির নিয়ম ও কার্য-কারণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে।

"... আল্লাহ্ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন... (৩১:২০) এই আয়াতটিতে উল্লেখিত 'তোমাদের' বলতে মহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বোঝান হয়েছে, তা পূর্বাপর আয়াতগুলি পড়লে বোঝা যায়। কিন্তু এ আয়াতের বক্তব্য কি কোন অর্থেই সত্য ও যৌক্তিক? অনন্ত আকাশের সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কি মানুষের ('বিশ্বাসী' হলেও) অধীন হতে পারে? জমিনের অর্থাৎ পৃথিবীর দৃশ্য, অদৃশ্য সব কিছু কি মানুষের অধীন? লাগামহীন এই বক্তব্য পাগলেও বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

"নিশ্চয় তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করবার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, তারা তোমাকে সেখান হতে বহিষ্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পরে তারাও সেখানে

অল্প কালই টিকে থাকত।" (১৭:৭৬)

উল্লেখ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আমরা মহম্মদের জীবনী থেকে জানি, মক্কাবাসী কোরেশদের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি মক্কা থেকে মদীনায় নিজের জীবন রক্ষার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরেশরা দেশত্যাগ করেনি। তারা সেখানে ছিল বরাবরই। পরবর্তীকালে নবী যখন মক্কা জয় করলেন তখন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাহলে উপরোক্ত ১৭:৭৬ নং আয়াতের বক্তা কী বললেন? যা বললেন, তাতে দু'টি কথা স্পষ্ট হয়েছে। এক, ওরা অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরেশরা মহম্মদকে বহিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। দুই, যদি সফল হত অর্থাৎ মহম্মদ বহিষ্কৃত হত তাহলে কোরেশরাও অল্পকালই সেখানে টিকে থাকত।

কিন্তু আল্লাহ্‌র (??) এই যে বক্তব্য তা কি ঐতিহাসিক সত্য? ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। ইতিহাস বলে—মহম্মদ বহিষ্কৃত হয়েছিলেন মক্কা থেকে। এবং কোরেশরা সেখানে টিকে থেকেছে। অতএব, কেউ যদি বলে কোরআনে এমন বহু কথা আছে যা সত্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবে কী উত্তর দেবেন কোরআন অনুসারীরা?

এর পরেই ৭৭নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে—"আমার রসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল, তুমি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।" এ কথাও সত্য নয়। মুসা, যীশুর মত ব্যক্তিরা অনেকেই তাঁদের দেশে টিকে থাকতে পারেননি। এর পর ৭৮নং আয়াত হতে ৮৪নং আয়াতগুলিতে গোটা পাঁচেক প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, তার একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য নেই।

এর পরেই ৮৫নং আয়াতটিতে দেখা যায় একেবারেই অন্য একটি প্রসঙ্গ— 'রূহ' (আত্মা)। বলা হল, "তোমাকে ওরা 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, তুমি বল—রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ। এ বিষয়ে তোমাদের অতি অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" ৮৬নং আয়াতটিতে এসেছে অন্য প্রসঙ্গ। তা একেবারেই তুচ্ছ কথা, আলোচনার অযোগ্য।

৮৫নং আয়াতটিতে আত্মা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? আল্লাহ্ মহম্মদকে বলতে আদেশ করলেন যে, রূহ (আত্মা) 'আমার' (মহম্মদের) প্রতিপালকের আদেশ। এবং রূহ বিষয়ে তোমাদের অর্থাৎ কোরেশদের অতি অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে—রূহ (আত্মা) কি আল্লাহ্‌র আদেশ? এবং আত্মা বিষয়ে কোরেশদের প্রশ্নের এই আয়াতটি কি যথার্থ উত্তর? এ কিন্তু আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ্ বা মহম্মদের অজ্ঞতা বশতঃ এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

১। ইসলাম ধর্মমতে মুসলমানরাই বিশ্বাসী। অন্য কোন ধর্মে সৎ মানুষ বা বিশ্বাসী হতে পারে বলে আল্লাহ্ কোরআনে বলেননি। দেখুন : কোরআন- ৩:১৯, ৮৫; ৪:১৩৬।

২০ ॥ কোরআনে দ্বি-জাতি তত্ত্ব

"যারা নামায কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদেরই জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পদমর্যাদা এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে।" (৮:৩-৪; মদনী সূরা)

"আল্লাহ্‌র নিকট অবিশ্বাসকারীরাই নিকৃষ্ট জীব, যেহেতু তারা *(ইসলাম ও নবীকে)* অবিশ্বাস করে। (৮ : ৫৫)

'বিশ্বাসী' অর্থাৎ মুসলমান ও 'অবিশ্বাসী' অর্থাৎ অমুসলমান। মানব-মণ্ডলীকে স্থান-কাল নির্বিশেষে এই দুভাগে ভাগ করে নিরন্তর যুদ্ধ ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে মহান আল্লাহ্‌র সুললিত বাণী বলে দাবিকৃত ও অপরিবর্তনীয় এই কোরআন; ঘোষণা করেছে— "বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে; নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য স্বীকার করে। তাদেরই আল্লাহ্ কৃপা করেন, ..." (৯:৭১; মদনী সূরা)

"হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।" (৯:৭৩)

" কিন্তু রসুল এবং যারা তার সাথে বিশ্বাস করেছিল, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছিল, তাদের জন্যই কল্যাণ আছে, এবং তারাই সফলকাম।"(৯ : ৮৮)

"তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ধর্ম *(অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম)* প্রতিষ্ঠিত না হয়। ..." (২:১৯৩; ৮:৩৯; মদনী সূরা)

"... আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করছি। অতএব, তাদের কণ্ঠ সমূহের উপর আঘাত কর, এবং তাদের অঙ্গুলির সংযোগ সমূহে আঘাত কর। এটি এই জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল, ..." (৮ : ১২-১৩)

"...অংশীবাদীদের[১] যেখানে পাবে, বধ করবে; তাদের বন্দী করবে অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত[২] দেয়, তবে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেবে; ..." (৯: ৫)

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য, "... আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন, তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়।" (৯:৩০) অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচনা দিতে কোরআনের নির্দেশ— "যদি তোমরা আভিযানে বের না হও, তবে

তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন। ..." (৯:৩৯)

" সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করোনা, এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (২৫:৫২)

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে কোরআন অস্বীকার করেছে এই ভাষায়— "এবং যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসরণ করলে তা কখনও তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট গৃহীত হবে না, এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্গত হবে।" (৩: ৮৫; মদনী সূরা) "নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম। ... " (৩:১৯)

"... এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মরোনা।" (৩:১০২)

" তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে উদ্ভুত হয়েছ, তোমরা সৎকাজের আদেশ দান কর ও অসৎকাজে নিষেধ কর, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।... " (৩:১১০) (অনুরূপ— ৯:৮৬; ৪৯:১০,১৪; ৮:৭৪; ৯:২৮,২৯; ৩৩:৬১ ইত্যাদি)

উপরোক্ত আয়াতগুলিই যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হিংসা, বিদ্বেষ ও অপর ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্ররোচনা দিতে কোরআন অমানবিক একটি ভয়ঙ্কর দল সৃষ্টিতে তুলনাহীন এক অধার্মিক গ্রন্থ। আয়াতগুলি একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, উস্কানীমূলক উগ্র হিংসাত্মক সূরাগুলি প্রায় সবই মদীনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলিতে তেমন উগ্রতা বা হিংস্রতা দেখা যায় না। সেগুলি আকারেও ছোট এবং অনেকটা আবেদন মূলক। এই পার্থক্য দেখে এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, মক্কায় অবস্থান কালে মহম্মদ ক্ষমতার দিক দিয়ে মোটেই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন না। ইতিহাসও তা-ই বলে। মদীনায় গিয়ে নবী শক্তিশালী হওয়ার ফলে সূরাগুলির দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতিগত পরিবর্তন স্পষ্ট হয়েছে। যদিও দু'একটি সূরার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—"ধর্ম সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ নেই, ..." (২:২৫৬ - মদনী সূরা) কিংবা "... এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (২৫:৫২; মক্কী সূরা) কিন্তু এই আয়াতগুলির পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওগুলি সংকলন কালে ভ্রমবশত ঃ 'মক্কীর' পরিবর্তে 'মদনী' কিংবা তার বিপরীত ভাবে স্থানান্তর হয়েছে। এর নজীর ২৮নং সূরার ৮৫নং আয়াত, যা "সূরা ও আয়াত সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলা" ও "কোরআন ও তার সংরক্ষণের ইতিহাস" শীর্ষক পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতগুলি ছাড়া আরও বহু আয়াত আছে যাতে এ পরিচ্ছেদের শিরোনামে বর্ণিত বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুতঃ কোরআন মানুষকে সৎ ও অসৎ হিসাবে গণ্য করার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে সে ইসলামে বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী। এবং এই একটি মাত্র নীতি দ্বারা বিশ্বের মানুষকে বিভক্ত করা হয়েছে দুটি গোষ্ঠীতে এবং বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছে অবিশ্বাসীদেরকে ঘৃণা করতে ও যে কোন উপায়ে

ধর্মান্তরিত করতে কিংবা হত্যা করতে।

কোরআন যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে উৎসাহ দান করেছে এ ভাষায়—

১। "... যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের, ..." (৮: ১; মদনী সূরা)

২। "... যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র ও রসুলের..." (৮: ৪১) " যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর,..." (৮:৬৯)

৩। "যারা বিশ্বাস করেছে (ইসলামে), দ্বীনের (ধর্মের) জন্য গৃহত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।" (৮: ৭৪)

কেবল কোরআন দ্বারাই নয়, মহম্মদ নিজেও বিশ্বাসীদের লুণ্ঠনে উৎসাহিত করেছেন, তারও উল্লেখ আছে বিশ্বস্ত হাদিসে। 'মোস্তাফা চরিত'-এর ৪৮ নং পৃষ্ঠায় মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন — "বোখারীতে (বোখারী শরীফ, ১৬ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা) হযরত আলী কর্তৃক একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বদর সমরে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া হযরত বলিয়াছেন— 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিয়া যাও, (তাহাতে, তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না) তোমাদের জন্য বেহেশ্ত নিশ্চিত'।"

'জেহাদ' ইসলাম ধর্ম প্রসারের এক ভয়ংকর অধার্মিক সামরিক বলদর্পী কৌশল। অন্য কোন ধর্মে বিশেষত ভারতীয় কোন ধর্মে যুদ্ধ মারফত ধর্ম বিস্তারের কোন নীতি বা ইতিহাস নেই। অথচ কোরআন এ বিষয়ে এক অগ্রহণীয় ও অনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 'জেহাদ' সম্পর্কিত অজস্র আয়াত কোরআনে আছে। তার কয়েকটি হচ্ছে — ২:১৯৩, ২১৬, ২৪৪; ৪:৭৪, ৭৫, ৭৬; ৯:৫, ২৯, ৩৬, ৪১,৭৩; ৪৭:৪; ৬৬:৯। এবং এগুলি সবই নবী মহম্মদের মক্কাত্যাগের পর মদীনায় থাকাকালীন প্রচারিত, যখন তিনি সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন।

'জেহাদ' শব্দটিকে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বলে কিছু কিছু মুসলিম পণ্ডিত (সুফীরা) বর্ণনা করেন। সেটা যে তাঁদের অপর ধর্মাবলম্বীদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা বা ভণ্ডামি তার সাক্ষী স্বয়ং কোরআন। কেননা কোরআনে স্পষ্টতই জেহাদকে অস্ত্রের মারফত যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে। এর সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন সম্পর্কই নেই। আর কিছু কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী (?) যে প্রেমে গদগদ হয়ে জেহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেন সেটা তাঁদের বুদ্ধিহীন মুসলিম তোষণ, অজ্ঞতা ও নীচ স্বার্থ আদায়ের পন্থা ছাড়া কিছু নয়।

জেহাদ সম্পর্কে ইসলামী তত্ত্ববিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত থমাস পেট্রিক হিউজ (Thomas Patrick Hughes) তাঁর 'ডিকশনারী অব ইসলাম'-এর (রূপা অ্যাণ্ড কোং, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯) ২৪৩ নং পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ—

" 'জিহাদ' — 'একটি আক্রমণ, অথবা কঠোর আক্রমণ।'

'মহম্মদের ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ। এটি কোরআন নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য। এবং পরম্পরাগত পালনীয় পবিত্র অনুশাসন যা বিশেষ করে ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেয়। এবং মুসলিমদের অমঙ্গলকে দূর করে।

যখন কোন মুসলমান শাসক কর্তৃক অবিশ্বাসীদের রাজ্য জয় করা হয়, তখন ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের নিকট নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়ঃ—

১। 'ইসলাম' গ্রহণ, যে ক্ষেত্রে ঐ বিজিত জাতি মুসলিম রাজ্যের স্বীকৃত নাগরিক হবে।

২। ব্যক্তি-কর (জিজিয়া) প্রদানের দ্বারা ইসলামে অবিশ্বাসীরা সুরক্ষা পাবে এবং যদি তারা আরবের পুতুল পূজারী না হয় তবে 'জিম্মী'বলে পরিগণিত হবে।

৩। যারা ব্যক্তি-কর (জিজিয়া) না দেবে তাদের তরবারির দ্বারা হত্যা করা হবে।"

বর্তমান খ্রীষ্টান জগতের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ বেনেডিক্ট (Benedict XVI) জার্মান বংশোদ্ভুত। বয়স ৭৯ বছর। চতুর্দশ শতকের বাইজান্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েল প্যালিওলোগাস পারস্যের এক মুসলিম পণ্ডিতের সাথে যে আলোচনা করেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন পোপ ১৩/৯/২০০৬ তারিখে জার্মানির রেজেনবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে দেওয়া ভাষণে। বাইজান্টাইন সম্রাট পারস্যের উক্ত পণ্ডিতকে বলেছিলেন, "হজরত মহম্মদ নতুন কী এনেছিলেন তা আমাকে দেখান। আপনি দেখতে পাবেন, মহম্মদ যা এনেছিলেন তা শুধুই পাপ ও অমানবিক (only evil and inhuman)। যেমন, তিনি যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, তরবারির সাহায্যে সে ধর্মের বিস্তার ঘটানোর আদেশ দিয়েছিলেন।"

পোপের মতে, পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভবের ফলে ইউরোপীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণ ঘটেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ ধর্মবিশ্বাসকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। পোপের দেওয়া উপরোক্ত ভাষণে মুসলিম দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আলকায়দার ইরাক শাখা 'মুজাহিদিন কনসালটেটিভ কাউন্সিল' এর মাধ্যমে জানিয়েছে, 'ইসলাম অথবা মৃত্যু-এর বাইরে কিছু নেই। যতদিন না তামাম পশ্চিমী দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা ওড়ানো সম্ভব হবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলবে।" ওই বিবৃতিতে পোপকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "খ্রীষ্ট ধর্মের পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। খ্রীষ্টানদের পবিত্র ক্রুশকে গুঁড়িয়ে দেব আমরা..." ইত্যাদি।

অল্প কিছুদিন আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ প্রেসিডেন্ট বুশকে পত্র দিয়ে জানিয়েছেন, ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র সত্যধর্ম, আমেরিকাকে

বাঁচতে হলে ওই ধর্মকে গ্রহণ করতেই হবে। তিনি আরও বলেন, ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলকে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়াই আমার লক্ষ্য। আর পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গীরা বহু আগেই জানিয়েছে তারা তামাম ভারতকে ইসলামের অধীন না করা পর্যন্ত তাদের জেহাদ থামাবে না।

উপরের এসব তথ্যসহ আরও অনেক কথা একটি নিবন্ধে লিখেছেন বিখ্যাত সাংবাদিক পবিত্র কুমার ঘোষ, যা প্রকাশিত হয়েছে ২১/৯/২০০৬-এর কলকাতার 'বর্তমান' পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায়। কোরআন থেকে প্রেরণা পেয়েই যে মুসলমানরা জঙ্গী ও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে তা উপরোক্ত তথ্যগুলি কি প্রমাণ করে না? কোন মুসলমান ওসব হুমকি ও তৎপরতার একটি প্রতিবাদও করেনি।

প্রচলিত ধর্মগুলির ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ইত্যাদি ধারণা প্রমাণযোগ্য না হলেও সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে কিছুটা উপযোগিতা আছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এ কথাটা বলা যায়। কিন্তু তার 'দারুল ইসলাম', 'দারুল হরব্' ও 'জেহাদ'-এর তত্ত্ব যা ইসলামী বিশ্ব প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসাবে মহম্মদের সময় হতে মান্য ও প্রয়োগ করে আসছে তা মানবতা ও বিশ্ব শান্তির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি হচ্ছে— কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। এগুলি অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য। আরবী ভাষায় বলে 'ফরজ'। কিন্তু মুসলমানদের কয়জন পাঁচটি কলেমা অর্থসহ জানেন? কয়জন প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়েন? কয়জন রমজান মাসের প্রতিটি রোজা রাখেন? সক্ষম ও সম্পন্ন মুসলমান কয়জন হজ্ব পালন করেন? কয়জন বিধান মত যাকাত দেন? যদি এই প্রশ্নগুলির হাঁ-সূচক উত্তর মুসলমানদের শতকরা হিসাবের একটা সন্তোষ জনক সংখ্যায় দেওয়া যেতো তবে প্রশ্নটা উঠতো না। কিন্তু বাস্তবিক আমরা দেখেছি সংখ্যাটা নগণ্য। অবশ্য তাতে আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না বা হতাশাও প্রকাশ করি না। বরং আমরা বলতে চাই যে, ওগুলি কঠোরভাবে পালন না করেও যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা প্রকৃতই সৎ হতে পারেন এবং তাদের মুসলমানীত্বও বজায় থাকে, তবে জেহাদের মত ভয়ঙ্কর পরধর্ম বিদ্বেষী অমানবিক কোরআনের বিধান ইসলাম থেকে বাদ দিলে কোন্ ক্ষতিটা হয়? অপর পক্ষে যদি তাতে অন্য ধর্মগুলির সাথে সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়, মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও শান্তি ফিরে আসে, তবে মৌলবাদিতাকে উস্কে দিয়ে বিশ্বব্যাপী নিরীহ মানুষ মারার রক্তাক্ত প্রচেষ্টায় নগণ্য সংখ্যক জেহাদী মুসলমানের বিরুদ্ধে বেশীরভাগ মুসলমান সহ জগতের সকল মানুষ একত্রিত হয়ে পাল্টা জেহাদে নামলে করুণাময় আল্লাহ অখুশী হলেও মানুষ বাঁচে; কিন্তু ইসলাম মরে না। ইসলামী মৌলবাদিতা মানবতার পক্ষে বিপদজনক। অন্য ধর্মের পক্ষে তো অবশ্যই।

কোরআন বার বার ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও কোরআনে বিশ্বাস

করলেই মানুষ ইহকাল ও পরলোকে (অনন্তকাল) সর্বপ্রকার দৈহিক সুখভোগের অধিকারী হবে। অপর পক্ষে অবিশ্বাসীরা যতই মানবিক গুণের অধিকারী হোক, তাদের জন্য আছে ইহকালে আল্লাহ্ ও বিশ্বাসীদের দ্বারা লাঞ্ছনা ও পরলোকে চিরকালীন নরকভোগ। কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে— আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম একটাই; এর নাম ইসলাম। কোরআনের ভাষায়— "... আজ তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম, ..." (৫ : ৩)

'কাফের' একটি আরবী শব্দ যার ধাতুগত অর্থ নাকি— 'সত্যকে আবৃতকারী'। তা হতে পারে। কিন্তু কোরআনের বহু জায়গায় এ শব্দটি আছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ ডঃ গনী সহ অনেকেই— 'অবিশ্বাসী', 'অত্যাচারী', 'সীমালঙঘনকারী' ইত্যাদি করেছেন। যদিও মূলত ঃ উক্ত 'কাফের' শব্দটি দ্বারা তাদেরই বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্, রসুল ও কোরআন মানে না। অনেক বুদ্ধিজীবী মুসলমান অন্যকে ধোঁকা দিতে এবং কিছু মূর্খ ও ইসলাম তোষণকারী হিন্দু না বুঝেই বলেন 'কাফের' শব্দটি হিন্দুদের জন্য প্রযোজ্য নয়, যেহেতু হিন্দুরাও একেশ্বরবাদী। বস্তুতঃ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেও হিন্দুরা যেহেতু আল্লাহ্, রসুল ও কোরআন অনুসারী নয় সুতরাং মুসলমানদের চোখে তারা কাফের বৈ কিছু নয়। এবং কে না জানে মুসলমানদের প্রতি কোরআন নির্দেশ দিয়েছে অবিশ্বাসীরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে (উদ্ধৃতি যথাস্থানে দেওয়া আছে)।

বর্তমানে যে নরহত্যা ও সম্পদ ধ্বংসের ইসলামী সন্ত্রাস বাংলাদেশ এবং ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে তার উৎসও ঐ কোরআন। অনেক আয়াত উদ্ধৃত করা বাহুল্য। শুধু দু'টি আয়াতের অংশ বিশেষই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ্ স্বয়ং অমুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন। এবং মুসলমানদেরও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য প্ররোচনা দিচ্ছেন এই ভাষায় — "... আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি (terror) সঞ্চার করছি। ..." (৮:১২) "... তার দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রুকুল ও তোমাদের শত্রুকুলকে ভয় প্রদর্শন ও সন্ত্রস্ত কর (terrify), ..." (৮ :৬০)

আর একটি কথা অনেকেই জানেন এবং আলহাজ্ব কাজী মাওলানা মোঃ গোলাম রহমান প্রণীত বিখ্যাত 'মকছুদোল মোমেনীন বা বেহেশ্‌তের কুঞ্জী' নামক পুস্তকের ৪৪ নং পৃষ্ঠায় বলা আছে, মুসলমানের সাথে মুসলমানের দেখা হলে বলতে হবে 'আচ্ছালামালাইকুম' অর্থাৎ তোমার উপর খোদার শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু কোন স্থানে মুসলমানদের সাথে অমুসলমান আছে এমন সন্দেহ হলে বলতে হবে 'আচ্ছালামু-আলা মানিত্তাবায়াল হুদা' অর্থাৎ কেবল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির ধর্ম ইসলাম, যা মুসলমানরা জোর গলায় বিশ্বময় বলে বেড়ান।

আর একটি ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শুনলে একজন মুসলমানকে বলতে হয়— 'ইন্নালিল্লাহে-ওয়া-ইন্না-এলায়হে রাজেউন' অর্থাৎ তার আত্মা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করুক। অথচ অমুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শুনলে মুসলমানকে বলতে হয়— 'ফিনারে জাহান্নামে খালেদীন আফিহা' অর্থাৎ তার আত্মা নরকে (জাহান্নামে) যাক। এই যে বৈষম্য মূলক আচরণ করতে মুসলমানকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু সৎ বা অসতের বিচার করে নয়। বরং 'বিশ্বাসী' না 'অবিশ্বাসী' এই জঘন্য দলীয় মনোভাব থেকে। ইসলাম সত্যিই মহান।

'ধর্ম' বলতে মানুষের মনে যে প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ উদার মনোভাবের উদয় হয় তার সাথে উপরোক্ত আচরণগুলির আদৌ কোন সংশ্রব আছে কি? সীতারাম গোয়েল তাঁর 'সেক্যুলারিজম রাষ্ট্রদ্রোহের আর এক নাম' শীর্ষক পুস্তিকায় লিখেছেন— "ইসলাম-খ্রিষ্টানীয় সমুত্থানের আগে বিশ্ব ইতিহাসে উপাসনা নিয়ে কোন রক্তপাতের খবর পাওয়া যায় না।" (পৃঃ ৩) "কিন্তু ইতিহাসই এ বিষয়ে মস্ত সাক্ষী যে একেশ্বরবাদের অনুবর্ত্তীরা যখনি বল প্রয়োগ করেছে, তখন তারা শাস্ত্রভাষা কিংবা ইতিহাস পুস্তকের মধ্যে তাদের বলপ্রয়োগের শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে মুক্তকণ্ঠে ও কাজের পোষকতা করে থাকে।" (পৃঃ ৫) "দ্বিতীয়ত শেষ পয়গম্বরের আবির্ভাবের পর মানবজাতি দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল পয়গম্বরের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং তিনি যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথে চলতে শুরু করে। অন্য দল পয়গম্বরের প্রতি সংশয় জ্ঞাপন করে অথবা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ... প্রথম দলের কাছে একেশ্বরের হুকুম আসে, অন্য দলের বিরুদ্ধে অনবরত জেহাদ করে করে তাকে হয় পয়গম্বরের শরণাগত হতে বাধ্য করবে অথবা (মেরে কেটে) নাস্তানাবুদ করবে।" (পৃঃ ১১) "ইসলাম-খ্রীষ্টানির কেতাব তাদের পরম্পরা এবং ইতিহাস অধ্যয়নে স্পষ্ট বোঝা যায় এই মতবাদগুলি কোন অর্থেই ধর্মের যোগ্য নয়। উল্টোদিকে বরং এই মতবাদগুলি সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সারই বাহক।" (পৃঃ ২৪)

মহম্মদের কাল থেকে পৃথিবীতে মুসলমানরা যে ভাবে যুদ্ধের আগুন জ্বেলেছে তার মূল ঐ কোরআন ও রসুলের 'জেহাদী' ডাক। কোরআনের 'জেহাদ' সম্পর্কে যে দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও রূপকধর্মী ব্যাখ্যা কেউ কেউ দেন সেটা হয় ভুল নয় তো ভণ্ডামী। আর তাতে মুসলমানরা কেউ আমল দেয় না বললেই চলে। আর কদাচিৎ কেউ দিলেও তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কিন্তু যারা মধ্যযুগে তরবারি-বর্শা ও এ যুগে বোমা-বন্দুক নিয়ে শিশু-বৃদ্ধ-নারী সহ নিরীহ মানুষ মেরে চলছে, নিজেরাও মরতে উৎসাহিত হচ্ছে তারা ইসলাম বিস্তারের জন্যই কোরআন-হাদিসের জেহাদী তত্ত্বে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী। তারা নিশ্চিত যে, একাজে প্রাণ গেলে সাথে সাথে তারা বেহেশ্‌তে অনন্ত-কালের জন্য স্থায়ী হবে (দেখুন- ৪:৭৪ এবং ৯:১১১)।

এই বেহেশ্‌তে পান-ভোজনের ব্যবস্থা অফুরন্ত, যৌন সম্ভোগের জন্য অজস্র

অপরূপা চিরকুমারী হুরীর মেলা, দুঃখের লেশ মাত্র নেই সেখানে, আছে সুখের অনন্ত প্রবাহ। (৪৪: ৫৪; ৫৫: ৫৬; ৫৬: ১৭-২৪)

ইউরোপের ডেনমার্কের সংবাদপত্র 'জিলান্দস পোস্তেন'। তাতে 'কেয়ার ব্লুইটগেন' নামক একজন লেখকের শিশুদের জন্য নবী মহম্মদের একটি জীবনী প্রকাশিত হয় ২০০৫, ৩০শে সেপ্টেম্বর। শিশুদের জন্য অকর্ষণীয় করতে এই বই-এ মহম্মদের বারোটি ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) দেওয়া হয়। ছবিগুলির প্রথমটিতে দেখা যায় মহম্মদের দাড়ি-সমন্বিত ভয়ানক ক্রুদ্ধ মুখ, হাতে বিশাল ছোরা, পেছনে দু'টি বোরখা পরিহিতা নারী, তাদের চোখগুলি দেখা যায়। একটি ছবিতে লাঠি হাতে পাগড়ি মাথায় মহম্মদ চলছেন, হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি ছোট গাধা। একটিতে মহম্মদের আবক্ষ ছবি, তার পাগড়ি র উপর পলতে দেওয়া বোমা। একটি ছবিতে দেখা যায় মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে মহম্মদ কতকগুলো লোকের প্রতি কিছু বলছেন ইত্যাদি। হয়ত অনেক কথার সঙ্গে শিল্পী এ-ও বোঝাতে চেয়েছেন যে, বর্তমান বিশ্বে জঙ্গীবাদী মুসলমানদের বোমাবাজির প্রেরণা নবী মহম্মদ।

সবাই জানেন কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র একটি মহৎ ও বুদ্ধিদীপ্ত শৈল্পিক ভাষা, যা সমাজ বা ব্যক্তি মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও খারাপ দিকগুলিকে তীর্যকভাবে ইঙ্গিত করে। সকল শিল্পের যে মহৎ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য থাকে এখানেও তা-ই। অথচ মহম্মদের জঙ্গী অনুগামীরা ঐ ব্যঙ্গচিত্রগুলির মর্মার্থ না বুঝে পৃথিবীময় ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি করছে। ২২/২/০৬ তারিখে পশ্চিম বাংলার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় "ব্যঙ্গচিত্র : বিশ্বজুড়ে ঘটনার ঘনঘটা" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে ১৭ অক্টোবর '০৫ থেকে ২০/২/০৬ পর্যন্ত সময়সীমায় ইসলাম পন্থীদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কুড়িটির বেশী নর-হত্যা, অগ্নিসংযোগ সহ নানা ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ হচ্ছে 'উল্টা বুঝিলি রাম'। ব্যঙ্গচিত্রের বহুকালের ইতিহাস আছে। হাজার হাজার বিখ্যাত ও ক্ষমতাশালী মানুষের অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্র এ যাবৎ আঁকা হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে কেউ অশান্তি করেনি; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজ দোষ স্খালনের চেষ্টাই করেছেন। অথচ শান্তির বার্তা বাহক ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলে দাবিকৃত নবী মহম্মদের জঙ্গী অনুসারীরা ঐ ব্যঙ্গচিত্রগুলি নিয়ে যা করছে তা মূর্খামী ও পরমত অসহিষ্ণুতার জ্বলন্ত উদাহরণ।

যে কোন কারণেই হোক নর-হত্যা যতটা অবাঞ্ছিত ও ভয়ের তার চেয়ে বেশী ভীতিকর ও অনাকাঙ্খিত হচ্ছে আত্মহত্যা। অথচ মৌলবাদী জঙ্গী মুসলমানরা এ উভয় কাজ পরম উৎসাহে করে চলেছে কোরআন ও নবীর নির্দেশে। আমরা অকারণে বা ভিত্তিহীনভাবে কোরআন ও নবী মহম্মদের সমালোচনা করছি না। আমাদের উদ্দেশ্য মুসলিম জঙ্গীবাদীরা কোরআনের যে অংশ ও মহম্মদের যে কার্যাবলী থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে এ যাবৎ হিংসাত্মক কাজ করে আসছে তার বিশ্লেষণ করা,

যাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ধর্ম থেকে অকল্যাণকর ও অমানবিক বিষয় গুলি বর্জন করেন। ইসলামকে এক মহান ধর্মে পরিণত করে মানব সমাজকে শান্তির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

কোরআন কোন কোন স্থানে শান্তির কথা বলেছে বটে; কিন্তু সে শান্তির উপায় নির্দেশ করেছে একটিই পথে- ইসলাম প্রতিষ্ঠায়। আর তা প্রধানত জেহাদ বা যুদ্ধ, লুণ্ঠন ইত্যাদির মাধ্যমে (দেখুন— ২: ১৯১, ১৯৩; ৮:১, ১২, ১৩, ৪১, ৬৯; ৩:৮৫; ৯:৫, ২৮, ২৯; ২৫:৫২ ইত্যাদি)। এবং কোরআন নির্দেশিত যুদ্ধ, হত্যা, নারী ও সম্পদ লুণ্ঠন, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি রূপায়নে মহম্মদ নিজে ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতি মানুষের সুকুমার বৃত্তি সঞ্জাত সর্বপ্রকার চারুকলা, সৃজনশীলতা এবং অমুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান— এক কথায় সভ্যতাকে সর্বতোভাবে ধ্বংসের মাধ্যমে কলেমা, নামায, হজ্ব, রোজা ও জাকাত তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ফলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এ অশান্তি যে অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষেই শুধু সৃষ্টি হচ্ছে তাই নয়, বরঞ্চ কোরআন যে ভোগবাদ ও হিংসার আগুন জ্বেলেছে মুসলমানরাও তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব তো নয়ই ইসলামী ভ্রাতৃত্বও সৃষ্টি করতে পারেনি এই কোরআন। ইতিহাস তারই সাক্ষ্য নিশ্চিতভাবে দিয়ে চলেছে।

আল্লাহ কোরআনে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ঘোষণা করলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা অপবিত্র ব্যতীত নয়। ..." (৯: ২৮)। অন্যত্র কোরআন ঘোষণা করেছে— "... Which (Koran) none toucheth save the purified." [56:79, M.M.Pickthall, p-386]। সুতরাং কথাটা দাঁড়ালো, যেহেতু মুসলমান ছাড়া সকলেই অংশীবাদী এবং অপবিত্র তারা কোরআন স্পর্শ করবে না, পড়া তো দূরের কথা। কিন্তু স্পর্শ করলে বা পড়লে অংশীবাদীদের জন্য কোরআন কী বিধান দিয়েছে তা আমরা জানবো কি করে? সে যাহোক, অমুসলমানরা যাতে কোরআন পড়তে না পারে আল্লাহ্ কেন সে নির্দেশ দিলেন সে ব্যাখ্যা কোরআনে নেই। বরঞ্চ কোরআন যদি পবিত্র পুস্তকই হত তবে তা পড়ে পাপীর দল তো সংশোধিত হতেও পারতো— আল্লাহ্‌র এ চিন্তাটাই হওয়া উচিত ছিল। অথচ সে পথে আল্লাহ্ যাননি। আমাদের বিশ্বাস, কোরানের রচয়িতা বা সংকলকের উদ্দেশ্য ছিল কোরআন নামক কিতাবে অমুসলমানদের প্রতি যে হিংসার বীজ বোনা আছে এবং যে সব অন্ধ বিশ্বাস, অযৌক্তিক ও হিংসাত্মক বিধান আছে তা যেন তারা (অমুসলমানরা) না জানতে পারে। নিজের দলের দুর্বলতার কথা ও গোপন যুদ্ধ কৌশল অপরকে জানতে না দেওয়া মানব মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোরআনে, যেহেতু ইসলাম ব্যতীত অপর কোন ধর্মের স্বীকৃতি নেই

(আংশিক ব্যতিক্রম খ্রীষ্ট ও ইহুদী ধর্ম), সুতরাং একে বিশ্ব মানবতাবোধের শুধু পরিপন্থীই নয়, বরঞ্চ এক বিপদজনক নীতি বলাই যুক্তি সঙ্গত। অথচ মুসলিম ধর্মাবলম্বী যারা কোরআনকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য বলে দাবি করেন, তাঁরা বোধ করি এ কথাটাই বোঝাতে চান যে, বিশ্বের সকল মানুষই তাদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে কেবল ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করুক। **কিন্তু এ কথাটা কি গণতান্ত্রিক এবং গ্রহণযোগ্য হতে পারে?** শুধু তাই নয়, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, তাতে কি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে? মুসলমানদের ইতিহাস এ পর্যন্ত এর বিপরীত সত্যই প্রমাণ করেছে। সুতরাং, অবিসংবাদিত ভাবে এ প্রশ্নটা আসেই যে, মানুষের প্রতি মানুষকে ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ করে যে গ্রন্থ যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও হত্যার উৎসাহ দেয় তাকে কি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মানা যায়? কোরআনের দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিষ সাধারণ মুসলমান এমনকি তাঁদের অনেক বুদ্ধিজীবীকেও এতটা প্রভাবিত করেছে যে, তাঁদের বিচারবুদ্ধি নিরপেক্ষতা বজায় রাখাতে পারে না। যেমন— মুসলিম শাসিত দেশেও দরিদ্র মুসলমান আছে। কিন্তু তাদের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে তাদের বক্তব্য, আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই তা ঘটে (দেখুন কোরআন ১১/৬)। অথচ তাঁরাই অমুসলমান শাসিত দেশে যেসব মুসলমান গরীব, তাদের দরিদ্রতার কারণ হিসেবে সরকারের (অমুসলমান) দোষের কথা উল্লেখ করেন।

১। অংশীবাদী— যারা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী নয় বা বহুদেববাদী ও প্রতিমা পূজক।

২। যাকাত— বাৎসরিক সঞ্চিত উদ্বৃত্ত ধনের শতকরা আড়াই ভাগ গরীবদের উদ্দেশ্যে দান করা।

২১॥ কোরআনে আল্লাহ্র চরিত্র

মানুষই বিভিন্ন কালে ও দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে সব ধর্মই সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের অধিকারী ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একটি ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বর্ণনা করেছেন। হিন্দু ধর্মে তিনি ঈশ্বর বা ভগবান, খ্রীষ্ট ধর্মে গড, ইসলাম ধর্মে (আরবী ভাষায়) আল্লাহ্ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও সৃষ্টিকর্তা ন্যায় শাস্ত্রানুযায়ী অবশ্যই এক ও অভিন্ন। কিন্তু মহানবী প্রচারিত কোরআনের আল্লাহ্ ইসলাম ব্যতীত অপর সকল ধর্ম, ধর্মানুসারী ও তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন না, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে, কালে ও ভাষায় মানুষ যে নামেই ডাকে, আমাকেই ডাকে। তার একমাত্র কারণ আল্লাহ্ চরিত্রটি মহম্মদের সৃষ্ট। এই আল্লাহ্র মধ্যে স্ববিরোধিতা, অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, নীতিহীনতা ও নিষ্ঠুরতার অন্ত

নেই, যা আমরা এ পুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্‌র যে চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা পরাক্রমশালী, দাম্ভিক, স্বেচ্ছাচারী, তোষামোদ প্রিয়, পক্ষপাতদুষ্ট, সঙ্কীর্ণচিত্ত ও দলাদলিতে উৎসাহদাতা এক গ্রীক, রোম বা কিছুটা পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীর মতো। তাঁর সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, প্রতিহিংসা ইত্যাদি অত্যন্ত প্রবল। ভারতীয় উপনিষদে 'ব্রহ্ম' বলে যাঁর বর্ণনা আছে, তিনি সুখ-দুঃখের অতীত, নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। এর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র চরিত্রে নেই। স্পষ্ট ভাষায় পুনঃ পুনঃ একঘেয়ে ভাবে একই কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর প্রদত্ত বিধান অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে এবং তাঁর রসুল মহম্মদের শরণ না নিলে কারও রেহাই নেই। যদিও কোরআনে ইব্রাহিম, মুসা, যীশু প্রমুখ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম তাঁরই (আল্লাহ্‌র) বলে উল্লেখ আছে, তবুও আল্লাহ্ বলছেন, "এবং যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসরণ করলে তা কখনও তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট গৃহীত হবে না। এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩: ৮৫) এ ছাড়া আরও অনেক আয়াতেই (যেমন ৩: ১৯, ১০২; ৯: ২৮, ২৯,৩০,৩৩) এ কথা বলা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের স্বীকৃতি কোরআনে নেই।

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ও রসুল মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম বহির্ভূত লোকদের জন্য যে সকল ভয়াবহ শাস্তির কথা কোরআনে অজস্রবার বলা হয়েছে তাতে আল্লাহর তুলনাহীন প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পেয়েছে, যদিও কোরআনে 'পরম দয়ালু' বলে বার বার তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে অন্যের জবানিতে। এটা এজন্য হতে পারে যে, ভয় দেখানোর দ্বারা মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করা যাতে 'ইসলাম' গ্রহণের মারফত মানুষ স্বকৃত সমস্ত অপরাধের মার্জনা পেয়ে পরকালে অনন্ত দৈহিক সুখভোগ ও ইহকালে অশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে উৎসাহী হয়।

আল্লাহ্ প্রাক ইসলামিক সকল ধর্মকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি, মহম্মদ-পরবর্তী কোন ধর্মই যাতে কোনদিন স্বীকৃতি না পায়, সে ব্যবস্থা করেছেন মহম্মদকে শেষ নবী বলে ঘোষণা করে। কোরআনের ভাষায়— "... এবং সকল নবীর শেষ নবী, ..." (৩৩: ৪০) এই বিধানটির সমালোচনা করতে গিয়ে ইসলামকে 'ফুল স্টপ' দেবার ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওয়াদুদ।

আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, কোরআনে আল্লাহ্‌কে পরাক্রমশালী শাস্তিদাতা, একদেশদর্শী এবং একই সঙ্গে পরম দয়ালু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিজের ভাষায় নিজের শক্তির দম্ভ ও ধ্বংস করার ক্ষমতার কথা বহুবার বলেছেন। "তিনি পরম দয়ালু"— অপরের জবানিতে এ কথা অজস্রবার বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ্‌র লাভ হোক বা না হোক, মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের লাভটা যে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব তা অস্বীকার করার কোন পথ নেই। ইতিহাস এ সত্যটাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

আল্লাহ্ সরাসরি বলেছেন— "... এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" (২:৪০)

"আল্লাহ বলেন— তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করোনা। আমিই একমাত্র উপাস্য, অতএব আমাকেই ভয় কর।" (১৬: ৫১) (এখানে বক্তা আল্লাহ্ নন; অন্য কেউ)

"... বিশ্বাসী হলে আমাকেই ভয় করা উচিত।" (৯: ১৩)

"হে মানবগণ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, ..." (৪: ১)

"সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ..." (৫: ৩)

উল্লিখিত আয়াতগুলি ছাড়াও অজস্র আয়াতে অনুরূপ কথাই আছে একাধিক জনের জবানিতে। বক্তব্য কিন্তু একটাই অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ বা নির্দেশ। আল্লাহ্ প্রকৃতই কোরআনের বর্ণনানুযায়ী এতটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আছেন কিনা জানা যায় না। তা না যাক, কিন্তু এই যে ভয় ও লোভ দেখানো, এতে তাঁর প্রেমময় উদার কিংবা অসীম নির্লিপ্ত চরিত্র ব্যক্ত না হয়ে ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর চিত্তের একটা রূপ (ব্যক্তিত্ব) প্রকাশিত হয়েছে। মানুষকে দেহ-ভিত্তিক ভোগ-বাসনায় ও যৌন কামনায় উত্তপ্ত করাটা ('কোরআনে ইহ- লৌকিক ও পারলৌকিক প্রলোভন' পরিচ্ছেদ দেখুন) আল্লাহ্‌র চরিত্রকে আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় প্রেম ও সীমাহীন পবিত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেনি; করেছে ঘুষ দিয়ে দল ভারী করার আধুনিক নোংরা কূটবুদ্ধিপরায়ণ ভোটলিপ্সু কোন রাজনৈতিক নেতার স্থূল চরিত্র সৃষ্টি। কোরআনের এ নীতি বা 'স্ট্রাটেজি' একজন চতুর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মানুষেরই হতে পারে। ফলে সুখ-দুঃখের অতীত, মোহমুক্ত, অকল্পনীয় ও মানববুদ্ধির অগম্য সৃষ্টিকর্তাকে কোরআন যেন অশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের পর্যায়ে এনেছে। এবং এই কোরআন বর্ণিত আল্লাহ্‌র চরিত্রটি অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধি-প্রসূত একটি সৃষ্টি বলেই প্রতিভাত হয়, যে বুদ্ধি মহৎ শিক্ষা দ্বারা শাণিত ও মার্জিত হয়নি এবং চিন্তার গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত করে ভূমার পথের সন্ধান দিতে পারেনি।

স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে শিক্ষানীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্য নীতি, শিল্প ও সাহিত্য নীতি ইত্যাদি যত প্রকার নীতি মানুষ অনুসরণ করে তা মানুষেরই সৃষ্টি এবং একটি মাত্র লক্ষ্যেই তা প্রণীত। সেটা হচ্ছে লোক-কল্যাণ। 'ধর্ম' সেইরূপ মানুষেরই কল্পিত ও উদ্ভাবিত একটি নীতিই। কোন মানুষ বা মানবগোষ্ঠী যতই অন্য কোন ভাবে এর ব্যাখ্যাও প্রচার করুক না কেন তা আকাশ হতে আবির্ভূত কোন বিষয় হতে পারে না এবং সে জন্যই কাল ও স্থান ভেদে তার সংস্কার ও পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কেননা স্থান ও কালের পরিবর্তনে মানুষের পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনেরও বদল হয়। মানব কল্যাণের জন্য কোন নিয়ম অনেক বা সুদীর্ঘ কালের হলেও চিরকালের হতে পারে না। যদি কোন ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা চিরকালের বলে দাবি করা হয়ে থাকে তাকে অভ্রান্ত বলা যায় না। এমনকি সৃষ্টিকর্তার নামে হলেও নয়। কেননা সৃষ্টিকর্তার

অস্তিত্ব মেনে নিলেও এটা মানতেই হয় যে, তাঁর সৃষ্টি এ বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবসমাজ পরিবর্তনশীল। কিন্তু কোরআন চিরকালের ব্যবস্থা বলে মানব সমাজের সে পরিবর্তন ও গতিময়তাকে অস্বীকার করেছে যা একান্ত অবাস্তব, অবিবেচনা প্রসূত ও অনৈতিহাসিক। একটু ভাল করে এবং অবশ্যই মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে বিচার করলে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোরআন কার সৃষ্টি সে প্রশ্নটা কারো কারো নিকট বিতর্কিত হলেও এই গ্রন্থে যে আল্লাহ্‌র চরিত্রটি বর্ণিত হয়েছে তা যতই অসাধারণ হোক, বর্ণনাকারীর অজ্ঞতায় বা অজ্ঞাতসারে তা মানুষের পর্যায়ে এসেছে, ঐশী থাকেনি। সর্বোপরি একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সমগ্র কোরআন একাধিক জবানিতে রচিত হলেও যে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে তা এই—

১) হযরত মহম্মদের স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা (বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌র কথা বলা হলেও তা মূল লক্ষ্য নয়, অবলম্বন মাত্র।)

২) মুসলমানদের (প্রধানত আরব দেশের) স্বার্থ রক্ষা করা।

৩) স্থায়ীভাবে মানুষকে মুক্তবুদ্ধিতার পথে অগ্রসর হতে না দিয়ে উপরোক্ত দুটি লক্ষ্য অর্জন করা।

৪) বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে দল বৃদ্ধি করা।

উল্লিখিত লক্ষ্যগুলিতে পৌছবার জন্য কোরআন তথা আল্লাহ্ মানুষকে সৎ বা অসৎ হিসেবে চিহ্নিত না করে 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' হিসেবে চিহ্নিত করে চিরদিন জেহাদ বা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফরমান জারি করে পৃথিবীকে অনবরত হিংসামুখর ও অশান্ত করেছেন। ফলে, তিনি মহিমান্বিত, শ্রদ্ধেয় ও অনন্ত প্রেমের আধার হতে পারেননি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব বা অকল্পনীয় ব্যাপ্তি ও তার মধ্যস্থিত প্রাণ ও জড়ের সার্বিক পরিচালনার অন্তরালে মানববুদ্ধির অগম্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম কাজ করে চলেছে, তাতে ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা ঐ জাতীয় কোন শক্তির অস্তিত্ব বাস্তবিক সম্ভব কিনা বলা কঠিন। তবে তাকে কল্পনা বা বিশ্বাস করে একটা আপাত সমাধানে পৌছানোর চেষ্টাটাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু কোরআনে কখনও আল্লাহ্‌র বা অপরের জবানিতে আল্লাহ্‌র যে পরাক্রমের কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হয়েছে, তার লক্ষ্য শুধু অনন্ত বিশ্বের মাঝে তুচ্ছ গ্রহ এই পৃথিবীর বাসিন্দা সামান্য দেড় কি দুশো কোটি মানুষ (মহম্মদের সময়ে)। এবং এই অকিঞ্চিৎকর বিষয়টাকে যে-আল্লাহ্ এত গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, তাতে তাঁর শক্তির অসীমতার দাবিটাকে হাস্যকর ও প্রভুত্বকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কোরআন আল্লাহ্‌র চরিত্রকে বস্তুতঃ খাটোই করেছে। আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি, ধ্বংস, পালনের একমাত্র কর্তার মতো মহৎ করা হয়নি।

কোরআনে মানুষকে 'বিশ্বাসী' অর্থাৎ মুসলমান বানাতে আল্লাহ্‌র (নাকি মহম্মদের) যে আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তা খুবই অযৌক্তিক ও হাস্যকর মনে হয়। কেননা তিনি তো 'হও' বললেই সব হয়ে যায়। (২:১১৭; ৩: ৪৭ ইত্যাদি) কাজেই

তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ অবিশ্বাসী হয় কী করে? অথবা অবিশ্বাসীদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, অথচ এর চেয়ে অনেক কঠিন ও নিষ্ঠুর কাজ, যেমন— কোন কোন এলাকার মানব গোষ্ঠীকে ভাল মন্দ নির্বিশেষে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং দম্ভের সাথে সে ঘোষণা কোরআনেই করেছেন (৭: ৪; ৪৬: ২৫; ৪৭: ১৩)। কাউকে শাস্তি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য থাকে শোধরানো। কিন্তু আল্লাহ্র বিচারে সেটা লক্ষ করা যায় না। যেহেতু অবিশ্বাসীদের জন্য সে সুযোগের অবকাশ রাখেননি তাদের অনন্ত দোজখ বাসের ব্যবস্থা করে (৭২: ২৩; ৯৮: ৬ ইত্যাদি)। এসব বিচারবুদ্ধিহীন, খামখেয়ালী ও নিষ্ঠুর কার্যাবলী সত্ত্বেও তাঁকে সুবিচারক ও রহমানুর রহিম (পরম দয়ালু) বলা সঙ্গত হয় কি? একটি জনপদের সকল লোকই (তাদের মধ্যে শিশুও আছে) কি খারাপ হতে পারে? তবু নির্বিচারে তিনি যে জনপদ ধ্বংস করেছেন, তা একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ভয়ঙ্কর আক্রোশী সমর নায়কের হতে পারে, সৃষ্টিকর্তার নয়। আর 'বিশ্বাসী' মাত্রই সৎ এবং 'অবিশ্বাসীরা' সকলেই অসৎ এভাবে মানব জাতিকে বিভক্ত করে যথাক্রমে তাদের অনন্ত বেহেশ্ত ও চিরকালীন দোজখের ব্যবস্থা যিনি করেন, তাকে স্থূলবুদ্ধি ও ঈর্ষাপরায়ণ মনে না করে দয়ালু ও সুবিচারক হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি?

১১১ নং 'সূরা লাহাব'-এ পাঁচটিই মাত্র আয়াত। সেগুলি হচ্ছে—

(১) "আবু লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক, এবং সেও ধ্বংস হোক।

(২) তার ধনসম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসবে না।

(৩) অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে,

(৪) এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন (কাঠ) বহন করে;

(৫) তার গলদেশে খর্জুর বৃক্ষের আঁশের পাকানো রজ্জু নিয়ে।"

কোরআনকে মহান আল্লাহ্র বাণী বলে মুসলমানরা প্রচার করে আসছেন। তাতে এ ধরনের ব্যক্তি বিশেষের (তা তিনি যত খারাপই হোন) প্রতি 'আক্রোশমূলক' কথা অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েলোকদের ঝগড়াকালীন শাপ শাপান্তকে মনে করিয়ে দেয়; আল্লাহ্র সহনশীলতার কথা বিন্দুমাত্র প্রকাশ করে না। তাছাড়া উপরোক্ত শব্দ 'অচিরেই' বলতে কি বোঝায় না যে, কিয়ামতের আগেই ঐ ব্যবস্থাটা হবে? তাহলে এটাও তো আল্লাহ্র কথায় হেরফের হল। কেননা কিয়ামতের বিচার শেষেই তো মানুষের পারলৌকিক শাস্তির ব্যবস্থা হবে বলে কোরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটির প্রথম আয়াতে 'সেও ধ্বংস হোক' এই শব্দগুচ্ছের আগে 'আবু লাহোবের দু'হাত ধ্বংস হোক' বলার অর্থ আছে কি? একটা মানুষের সার্বিক ধ্বংস হওয়ার সাথে কি তার সকল অংগ-প্রত্যঙ্গের ধ্বংস বোঝায় না? ঝগড়াকালীন সাধারণ

মানুষের মুখ দিয়ে যেমন অসংলগ্ন কথা-বার্তা বেরিয়ে আসে এবং আক্রোশবশত বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে— এ কথাগুলি তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং সৃষ্টিকর্তার চরিত্রের সাথে কীভাবে এর সমন্বয় হতে পারে, তা সুস্থ মানুষের মাথায় আসে না। বরং মনে হয় এসব অবশ্যই মহম্মদের ব্যক্তিগত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা পরিষ্কার করার জন্য উল্লেখ করা যাচ্ছে, আবু লাহাব-এর আসল নাম ছিল আঃ ওজ্জা এবং "আবু লাহাব নবী করিমের আপন চাচা ছিলেন।" (তরজমা-এ-কুরআন মজীদ, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট, কলিকাতা, পৃঃ ১২২৮)। প্রতিবেশী এই চাচা আবু লাহাবের সাথে মহম্মদের ঘোরতর শত্রুতা ছিল।

যাহোক, সূরা লাহাব-ই নয়, কোরআনের বহু স্থানেই মহম্মদের ব্যক্তিগত তুচ্ছ সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আল্লাহ্‌র যথেষ্ট মাথাব্যথার নমুনা বর্তমান, যা আমাদের মতো মানুষের বুদ্ধিঅগম্য। এতে আল্লাহ্‌র চরিত্র কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ পাঠক তা সহজেই বুঝবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মবিশ্বাসী মানুষই মনে করেন সৃষ্টিকর্তা চরম নীতিপরায়ণ। কিন্তু নবী মহম্মদ একজন আগ্রাসী ও পররাজ্যলোভীর মন নিয়ে আল্লাহ্‌র চিত্র এঁকেছেন। আজ কিছু মুসলমান সহ বিরাট সংখ্যক মানুষ নবীসৃষ্ট আল্লাহ্‌কে কদর্য ও নীতিহীন বলেই মনে করেন। কিন্তু ইসলামের কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রতিহিংসার ভয়ে অনেকেই মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই যে কথা দিয়ে শুরু করা যেতো তা-ই দিয়ে এখন সমাপ্তি টানছি। বাইবেল ও কোরআন মতে প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ ফেরেশ্‌তাদের একজন 'ইবলিস'। ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে সে-ই আদমকে সেজদা (প্রণাম) করার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েও তা করেনি। অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌ত হতে বের করে দেন। সে শয়তান নামে অভিহিত হয়। আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সে তার বংশধরদের নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত রাজ্যের যত নষ্টামী ও মানুষদের বিভ্রান্ত করতে থাকবে (দেখুন ২:৩৪; ৭:১১, ১২; ১৫:৩১; ১৭:৬১; ১৮:৫০; ৩৮:৭৫-৮৫)।

কোরআনের এসব বর্ণনা পড়লে খুব সংগত কারণেই যে সব প্রশ্ন ওঠে :—

১। আল্লাহ্ কি জানতেন না ইবলিস অবাধ্য হবে?

২। তিনি ইবলিসকে শায়েস্তা করতে বা হত্যা করতে পারেলেন না কেন?

৩। ইবলিস (শয়তান) সৃষ্টি করা ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার মূল তো তাহলে আল্লাহ্, যেহেতু সবই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হচ্ছে। এমতাবস্থায় শয়তানের দোষ কোথায়?

আর প্রশ্ন নয়। দেখা যাচ্ছে কোরআন বর্ণিত আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন না সকল মানুষ সৎ হোক। তিনি আগেই স্থির করে রেখেছেন জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন (৩২:১৩)। তিনি শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন মানুষকে

বিভ্রান্ত করতে, তিনি সর্বজ্ঞ হয়েও আবার পরীক্ষা নেন, পরম দয়ালু হয়েও মানুষের সীমিত অপরাধের জন্য শোধরানোর সুযোগ না দিয়ে নরকের ভয়াবহ আগুনে অনন্তকাল পোড়ানোর ব্যবস্থা করেন।

"... আল্লাহ্ অনাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদান করেন না।"(৯:১৯,২৪) কোরআনের এই কথাটাও আল্লাহ্র নয়। এবং অনুরূপ বাক্য কোরআনের অনেক স্থানে আছে, যা অযৌক্তিক। অযৌক্তিক এই কারণে যে, যিনি পথভ্রষ্ট মানুষদের সৎপথে আনার জন্যই রসুলদের বারে বারে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন তিনি কেন অনাচারী মানুষদের সৎপথ প্রদর্শন করবেন না? তবে কি সদাচারী মানুষদেরই সৎপথ প্রদর্শন করার প্রয়োজন আছে? আল্লাহ্কে পরম করুণাময় বলে বর্ণনা করে অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাঁকে বিচারবুদ্ধিহীন ও বিভ্রান্তিকর চরিত্রের বলে মনে হয় না কি?

কোরআন বর্ণিত এরূপ চরিত্রের আল্লাহ্ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা হিসাবে বেমানান, অসমীচীন ও অবিশ্বাস্য। তবু মুসলমানরা যে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল বলে ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছেন তা বিশ্বের মানুষ বিশেষত অমুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা বৈকি। কেননা আল্লাহ্ ক্ষমাশীল কেবল বিশ্বাসীদের (মুসলমান) জন্য। অবিশ্বাসীদের (অমুসলমান) জন্য তিনি চরম নিষ্ঠুর হয়ে তাদের সীমাহীন যন্ত্রণাময় দোজখের চিরকালীন ব্যবস্থা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি স্থূল কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'জিহোবা ইহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা মাত্র। ... '

মহম্মদ প্রবর্তিত কোরআন ও ইসলাম স্পষ্টতই সেই অনুন্নত ইহুদী ধর্মের নিকট ঋণী। কোরআনে আল্লাহ্ ইহুদীদের জিহোবার তুল্য রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতদুষ্ট দাম্ভিক প্রকৃতির অশেষ ক্ষমতাশালী হিসেবে বর্ণিত একটি ব্যক্তিত্বমাত্র।

পাঠক, ঠাণ্ডা মাথায় সংস্কারমুক্ত হয়ে আপনারাই বিচার করুন এমন চরিত্রের আল্লাহ্কে কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক বলে মান্য করা যায়?

২২॥ 'হরফুল মোকাত্তা'-র রহস্য

কোরআন শরীফের বেশ কিছু সূরার প্রথম আয়াতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অক্ষর (আরবী) দেখা যায়। যেমন, 'আলিফ্-লাম্-মীম' (২:১; ৩:১-মদনী; ২৯:১; ৩০:১; ৩১:১; ৩২:১-মক্কী)। 'আলিফ্-লাম্-রা' (১০:১; ১১:১; ১২:১; ১৪:১; ১৫:১, মক্কী সূরা)। 'আলিফ্-লাম্-মীম, সা'দ' (৭:১, মক্কী সূরা)। 'কাফ-হা-ইয়া, আ'ঈন-সাদ' (১৯:১ মক্কী)। 'ত্বা-হা' (২০:১; মক্কী)। 'ত্বা, সীন, মিম' (২৬:১; ২৮:১-মক্কী)।

'ত্বা, সীন; (২৭:১-মক্কী)। 'ইয়া-সীন' (৩৬:১-মক্কী)। 'স্বা'দ' (৩৮:১-মক্কী)। 'হা-মীম' (৪০:১; ৪১:১; ৪২:১; ৪৩:১; ৪৪:১; ৪৫:১; ৪৬:১-মক্কী)। 'ক্বাফ' (৫০:১- মক্কী)। 'নূন' (৬৮:১- মক্কী)। আলিফ-লাম্-মীম্-রা (১৩:১ মদনী)

ডঃ গনী তাঁর কোরআনের বাংলা অনুবাদের টীকায় লিখেছেন (পৃ-৩১), "এই বিচ্ছিন্ন অক্ষর গুলোকে আরবী ভাষায় 'হরফুল মোকাত্তা' বা 'মোকাত্তায়াত' বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ বিছিন্নতা, কোরআন শরীফের বহু সূরার প্রারম্ভে এই নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। যাদের **প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না।** হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন— 'ঐ সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণের মধ্যে কোরআন শরীফের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে।' হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক স্বর্গীয় গ্রন্থে এমন কতগুলো গূঢ় বিষয় আছে, যার অর্থ কেবল আল্লাহ্ই জানেন, বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো ঐ নিগূঢ় তত্ত্বের বাহন। এই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান সহচরগণ) ঐরূপ অক্ষরগুলোকে নিগূঢ় তত্ত্বের বাহন বুঝতে পেরেছিলেন, এবং নিগূঢ় **তত্ত্বের কিছু কিছু বুঝেছিলেন,** যা প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তি বিশেষের নিকট মাত্র।"

৪০নং সূরার (সূরা মুমিন) ১নং আয়াতের (হা-মীম) টীকায় ডঃ গনী লিখছেন, "এর গূঢ় তত্ত্ব একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। মহানবী বলেন, এ আল্লাহ্র একটি নাম। আবার বলেন, ..." ইত্যাদি (পৃষ্ঠা- ৩৫৫)

তাহলে উপরোক্ত টীকা ও বর্ণনায় অনেক পরস্পর বিরোধী কথা এসে গেল। সেগুলি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

যদি কোরআনের কোন আয়াতের গূঢ় অর্থ থাকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা না বোঝেন, তাহলে কোরআনকে সহজবোধ্য বলে **আল্লাহ্ যে ৪৪:৫৮ এবং ৫৪:১৭, ২২ ও ৪০নং আয়াত সমূহে ঘোষণা করেছেন, তা মিথ্যা হয়ে গেল না কি?**

আবার "মহানবী বলেন, এ আল্লাহ্র একটি নাম।" তাহলে তো হয়েই গেল। সব রহস্য গেল মিটে! কিন্তু গনী সাহেবের খেয়াল হল না যে, ঐ কথা বলায় আর একটি নতুন প্রশ্ন উঠলো। ডঃ গনী তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের ৫১৬ - ৫১৮নং পৃষ্ঠায় আল্লাহ্র (আল্লাহ্ সহ) ১০০টি নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। প্রতিটি নামের অর্থও দিয়েছেন। সেখানে তো আল্লাহ্র উক্ত 'হা-মীম' নামটির নামগন্ধও পাওয়া গেল না। তাহলে এই নতুন নামটি এলো কোত্থেকে? এটা কোরআনের খোদার উপর খোদকারী কর হল না তো? বানানো কথায় জটিলতা বাড়ে বৈ কমে না।

এবং উপরে প্রদত্ত ডঃ গনীর টীকায় হযরত আবু বকর ও হযরত আলীর বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, ঐ গুলির মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। আলী আরও একটু বেশী বলেছেন, "যার অর্থ কেবল আল্লাহ্ই জানেন।" ডঃ গনী তাঁর টীকায় একবার বললেন, "একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না।" আবার বললেন, "নিগূঢ় তত্ত্বের কিছু কিছু বুঝেছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ।" পরে বললেন, "একমাত্র আল্লাহ্

ও তাঁর রসূল ব্যতীত আর কেউ জানেন না।" এই ব্যাপারেই আবু বকর ও আলীর ব্যাখ্যায়ও কিছুটা ফারাক দেখা যাচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো এসে যাচ্ছে—

১। কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মন্তব্যগুলির মধ্যে মিল নেই কেন?

২। যদি আল্লাহ্ ছাড়া কেউ 'হরফুল মোকাত্তা'র অর্থ না বোঝেন তবে তা বলার অর্থ কী? কোরআন সকলের বোঝার জন্য নয় কি?

৩। রসূল এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা কোরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কেন? আর তিনি বলার পরেও রহস্যটা মিটল না কেন?

৪। সাহাবায়ে কেরামগণ (নবীর সহচর) কিছু কিছু বুঝে থাকলে তা প্রকাশ না পেয়ে হারিয়ে গেল কেন?

বাহুল্য এড়াবার জন্য আর প্রশ্ন উত্থাপন করা হল না।

বস্তুতঃ এ সব পরস্পরবিরোধী কথায় এটা স্পষ্ট যে, উক্ত কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য নয়। মনগড়া কথা মাত্র। এবং মহম্মদের সময় ঐ 'হরফুল মোকাত্তার' অস্তিত্বই ছিল না। থাকলে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই নিজে অথবা জিজ্ঞাসিত হয়ে সবিস্তারে বলে যেতেন। যাতে এ সব অস্পষ্টতার সুযোগই থাকতো না। মহম্মদ যে বলেছেন, ওটা আল্লাহ্র একটা নাম— এটাকে আমরা বানানো গল্প বলে মনে করি। এ ব্যাপারে আমরা মিঃ এম. এম. পিকথলের মন্তব্য উল্লেখ করব। তিনি বলেছেন—

"Three letters of the Arabic Alphabet. Many Suras begin with thus with letters of the Arabic Alphabet. Opinions differ as to their significances, the prevalent views being that, they indicate some mystic words,... Some have opined that they are merely the initials of the scribe. They are always included in the text and recited as part of it." (M.M.Pickthall, p-34. Foot-note)

সব দিক বিবেচনা করলে পিকথল সাহেবের এই সিদ্ধান্তই যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত এবং সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

এ বিষয়ের আরও একটি দিক দিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। তা হচ্ছে, উক্ত 'হরফুল মোকাত্তা' যতগুলি সূরার প্রারম্ভে আছে, তার মধ্যে তিনটি মদনী সূরা। বাকী ২৬-টি মক্কী সূরা। এও একটি তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার ব্যাপার যা ডঃ গনীর টীকায় বর্ণিত "নিগূঢ় তত্ত্ব যা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না' ইত্যাদি ভাবনার একান্ত পরিপন্থী। এই 'হরফুল মোকাত্তা' যদি একান্তই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার হত তবে কোরআনের ১১৪-টি সূরার মধ্যে মাত্র ২৯-টিতেই থাকল কেন? আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, একই ধরনের 'হরফুল মোকাত্তা' বেশ কয়েকটি সূরার

প্রারম্ভে আছে। গভীর কোন তত্ত্ব হলে এরূপ হত না। অতএব, নিগূঢ় তত্ত্ব বলে একে গুরুত্ব আরোপ বা রহস্য সৃষ্টির চেষ্টাটা যে একেবারেই যুক্তিহীন ও হাস্যকর তা বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ মানুষ মাত্রেই বুঝবেন।

অতএব সংগতভাবেই সিদ্ধান্ত হতে পারে যে, এগুলি মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত সূরার অংশ নয়। বস্তুতঃ অর্থহীন বা সহজ বিষয়ও যদি কোন কারণে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে এবং তা যদি নিজের বা নিজেদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হয়, তবে তাকে মহনীয়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গভীর ভাবদ্যোতক ও রহস্যময় কিছু বলে বর্ণনা করার একটা প্রবণতা মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এটা হাস্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা যেতে পারে। একজন পাগলাটে লোক এক শহরের প্রান্তে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত বিরাট একটা গাছের গোড়ায় আপন খেয়ালে বিভিন্ন বর্ণের কিছু রং লাগাচ্ছিল। তাতে কাকতালীয়ভাবে বিচিত্র বর্ণের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত মনোরম চিত্রের সৃষ্টি হয়। এমন সময় একজন বিদেশী পর্যটক সেখানে হাজির। দৃশ্যটি তার নজরে আসে। পর্যটকের মনে হল, এটা অতি আধুনিক ইঙ্গিতধর্মী রহস্যময় কোন বিমূর্ত্ত শৈল্পিক চিত্রকর্ম এবং এটি যিনি এঁকেছেন, তিনি (ঐ পাগলাটে লোকটি) একজন উঁচুদরের শিল্পী। অমনি সে তার ক্যামেরা দিয়ে সেই বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত গাছের গোড়ার সেই অংশটুকুর কয়েকটি ছবি তুলল। ঐ আলোকচিত্রগুলি অচিরেই একটা নামকরা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় চারদিকে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ঘটনাটি অস্বাভাবিক ও হাস্যকর মনে হলেও এমনটা ঘটে। 'হরফুল মোকাত্তা' নিয়ে সার্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তাকেও এমনই একটা ঘটনা বলে মনে করা অসংগত নয়। তুচ্ছ কোন ঘটনা অনেক সময়ই অজ্ঞতা অথবা উদ্দেশ্যমূলক কারণে ও প্রচারে পরবর্তীকালে বিরাট আকার ধারণ করে, তার নজীর অনেক আছে। তবে সত্য শেষ পর্যন্ত বের হয়েই আসে।

২৩॥ কোরআনে চ্যালেঞ্জ

কোরআনে বহু জায়গায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে দুটি বিষয়ে। প্রথমতঃ এর রচনা-শৈলীর অতুলনীয়তা, অভ্রান্ত ঐশী বাণী ও বিশ্বের সকল জ্ঞানের আকর বলে দাবি করে। যেমন—

"... তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর... এবং কখনই করতে পারবে না, ... " (২:২৩-২৪)

"তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কেতাব উপস্থিত কর।" (৩৭:১৫৭)

"ওরা যদি সত্যবাদী হয়, তবে এর সদৃশ কোন রচনা আনয়ন করুক।" (৫২:৩৪)

"... তুমি বল - যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে আন, ..." (১১:১৩)

আরবী ভাষায় রচিত কোরআন শরীফের রচনা রীতি ও কাব্যময়তা ইত্যাদি সম্পর্কে তুলনাহীন বলে দাবি করা হয়েছে উপরোক্ত আয়াত গুলিতে এবং এ দাবি বহুল ভাবে প্রচার করা হয়ে আসছে। বর্তমান লেখক আরবী ভাষা জানে না। সুতরাং এ বিষয়ে তার মন্তব্য করার অধিকার নেই এ কথা সত্য। কিন্তু কোরআনের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ পড়ে অনুবাদকদের সযত্ন প্রয়াস ও ক্ষমতা সত্ত্বেও মুগ্ধ হবার মত কোন কাব্যিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করা গেল না। গভীর তত্ত্বপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও বিশুদ্ধ নান্দনিক বক্তব্যহীন কেবল ভবিষ্যতের কাল্পনিক অথচ স্থূল এবং অতীতের অপ্রামাণ্য কাহিনী নিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে এক ঘেয়ে ভাষায় বার বার বলার মধ্যে দলীয় সাংগঠনিক প্রচারণা হতে পারে, কিন্তু তাতে কোন কাব্য সুষমা থাকে না। অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয়, অতুলনীয় ঐশী বাণী বলে যাকে দাবি ও প্রচার করা হয়ে আসছে প্রকৃতপক্ষে কোরআন উক্ত দাবির যাথার্থ্য প্রমাণ করে কিনা সে বিষয়ে আগে যে কিছুটা আলাচনা করা হয়েছে, বুদ্ধিকে পূর্ব ধারণায় আচ্ছন্ন হতে না দিয়ে মুক্ত মন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে, তাই বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট।

এ গ্রন্থখানি (কোরআন) ভয়, আবেগ, লোভ ও অন্ধতায় আচ্ছন্নবুদ্ধি মানুষকে বিভ্রান্ত করার মত যে যথেষ্ট শক্তিশালী তা ইসলামের (পড়ুন মুসলমানদের) ইতিহাস পড়লে সহজেই বোঝা যায়। মুসলমানদের মধ্যে যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিজীবী নেই, একথা মনে করা ভুল। তবে সে সব যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিজীবীগণ কেন এর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে বলেন না (যদিও কদাচিৎ দু'একজন ইদানীং বলতে শুরু করেছেন) ? বোধ করি এ কারণে বলেন না, যেমন বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরেজী গল্পের (Dandy Emperor) নগ্ন রাজাকে কেউ সাহস করে উলঙ্গ বলেনি। কিন্তু একটি সরল বালকই সত্যকে প্রকাশ করেছিল। তেমনি ইদানীং দু'একজন নবীন চিন্তাবিদ বলতে শুরু করেছেন। আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। হয়ত বা এমন দিন দূরে নয়, যেদিন ঐ সব নবীনদের চিন্তাধারা বাস্তবরূপ লাভ করবে।

ঐশী বাণী বলে কোরআনকে মহনীয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার উদ্দেশ্যে মহম্মদের নিরক্ষরতাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হয়। যদিও এমন যুক্তি সর্বত্র খাটে না। কেননা বহু ঐতিহাসিক বা সাধারণ ক্ষেত্রেও দেখা গেছে বাস্তব বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, শিল্পকুশলতা, বুদ্ধির প্রাখর্য, কাব্যিক চেতনা, চিন্তার প্রগাঢ়তা, দার্শনিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি ব্যক্তি মানুষের শারীরিক গঠন ও শক্তির মতই সহজাত ক্ষমতা। লেখাপড়ার সাথে তার প্রত্যক্ষ যোগ একান্ত আবশ্যিক নয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উক্ত ক্ষমতাকে শাণিত ও পরিশীলিত করে তাতে সন্দেহ নেই। কোরআনের কাব্যিক

সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক গদ্য কবিতার একটু নমুনা উল্লেখ করলে বুঝতে সুবিধা হবে। নমুনাটি এই— "এ পার থেকে মারলাম তীর, পুকুরে নেই জল, কলাগাছে পাতাও নেই, হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেলরে, বাবা।" অজ্ঞাত কবির এই লাইন কটির ভেতর ভাবের কী পারম্পর্য আছে তা কবিই জানেন; কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই বক্তব্যটি অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্য। তবু ঐ দুর্বোধ্যতার ভেতর একটা রহস্যময় সৌন্দর্য আছে বলে এক শ্রেণীর সৌন্দর্যাভিসারী মানুষ যদি দল বেঁধে প্রচারে লিপ্ত হয়, তবে আমরা যারা বুঝতে পারি না, তাদের সৌন্দর্যানুভূতির অভাব হেতু সংকোচ বোধ করার কারণ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। উপরোক্ত গদ্য কবিতার অংশটির মত অজস্র অসংলগ্ন ব্যাপার স্যাপার আসমানী কিতাব বলে প্রচারিত কোরআনে বিদ্যমান আছে। যেমন—

"আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসীগণ তৎসহ অংশীস্থাপনকারী নয়; এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীস্থাপন করে তবে সে আকাশ হতে পতিত হয়, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। এইরূপে যে কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীকে সম্মান করে, তবে তা নিশ্চয় আন্তরিক সংযমেরই (তাকওয়া) অন্তর্গত। এই সমস্ত গৃহপালিত পশুতে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদের জন্য বহুবিধ উপকার আছে, অতঃপর ওদের কোরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট (কাবা)।" (২২: ৩১-৩৩)। এরূপ অসংলগ্ন উক্তিকে যদি কাব্যিক সৌন্দর্য ধরা হয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টিতেও সে সৌন্দর্য আছে —

"অতঃপর এর (কোরআনের) বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস।" (৭৫:১৯-২০) উক্তি দু'টির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? এরূপ অসংলগ্ন ও পারম্পর্যহীন বক্তব্যের অজস্র উদাহরণ কোরআন হতে উদ্ধৃত করা যায় এবং তাদের কিছু নমুনা ৫, ৬ ও ১৬ নং পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। অযৌক্তিকতা, অবৈজ্ঞানিকতা ও ভ্রান্তি বিষয়েও আমাদের এই পুস্তকের সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। এতে যথেষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় অতুলনীয় রচনাশৈলী, কাব্যময়তা, ভ্রান্তিহীনতা ইত্যাদি নিয়ে যে চ্যালেঞ্জ কোরআন করেছে[১] তা 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' জাতীয় একটা অসার দম্ভোক্তি বা ভিত্তিহীন দাবিমাত্র। 'কোরআন ঐশী বাণী' বলে যে-দাবি কোরআনে আছে এবং মহম্মদ ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা করেন, তা কোরআনের ভাষায়, বিষয়বস্তুতে একেবারেই মনে হয় না। এ বিষয়ে 'কোরআন প্রকৃতই কার বাণী' পরিচ্ছেদে আগেই আলোচনা করেছি। অতএব এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব ধারণামুক্ত হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়লে একথা মনেই হবে, যে

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুতে কোন মহৎ ও গভীর দার্শনিক তত্ত্বের কিছুই নেই। নেই স্বার্থহীন ঈশ্বর বা মানবপ্রেমের কথা। আছে হিংসাত্মক ও দলীয় প্রচারণামূলক অসংখ্য আদেশ-নির্দেশ এবং অবৈজ্ঞানিক বহু ধারণা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বাক্য গঠন অসংগত, রচনাশৈলী নিম্ন মানের। বক্তব্য বিষয় আগোছালো, পারম্পর্যহীন, অনাকর্ষণীয় ও পৌনঃপুনিকতার দোষে দুষ্ট। বিশ্রী রকমের বিরক্তিকর। অনেক স্থানে অস্পষ্টতা, তাই এর ব্যাখ্যায় মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যেই মতপার্থক্য ঘটছে প্রতিনিয়ত। তবে হ্যাঁ, বিধর্মীকে ভাঁওতা দেবার কাজে এর কার্যকারিতার জুড়ি মেলা ভার।

কোরআনে চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অবিসংবাদী অস্তিত্ব, একক কর্তৃত্ব, অসীম জ্ঞান, সর্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি নিয়ে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জের বাণী কোরআনের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি —

"বল— তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আসমানের সৃষ্টিতে ওদের অংশ আছে কি? এর সমর্থনে কোন কেতাবে অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা উপস্থিত কর— যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৪৬: ৪)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামত দিন পর্যন্ত ডাকলেও সাড়া দেবে না, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? ..." (৪৬: ৫) "যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে **তখন ওদের দেবতাগুলো ওদের শত্রু হবে, এবং এই দেবতাগুলো ওরা ইবাদত করেছিল— অস্বীকার করবে।**" (৪৬: ৬) "সে বলল— এদের এই প্রধানই তো আছে, এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না, যদি এরা কথা বলতে পারে।" (২১: ৬৩) "... তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এই সমস্তের একটি করতে পারবে? ..." (৩০: ৪০)

কোরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব দাবি করা হয়েছে এবং যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে তারা বিভ্রান্ত এবং যাদেরকে ডাকে তারা কোন ক্ষমতার অধিকারী নয়, এমনকি কোন দিন সাড়া দিবে না বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটা যে, সে দেবতাগুলির অস্তিত্ব কোরআন অস্বীকার করেনি। যেহেতু বলা হয়েছে, "... তখন ওদের দেবতাগুলো ওদের শত্রু হবে, ...অস্বীকার করবে।" (৪৬: ৬)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্ যে আছেন এবং তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং কিয়ামতের দিন শাস্তি ও পুরস্কার দেবেন এতো একটা বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র, যা মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত এবং যার অনুকূলে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বা তিনি

হাজির করতে পারেননি। তা সম্ভবও নয়। মূর্তি পূজকরাও তাদের দেব-দেবীদের অনুরূপ শক্তির অধিকারী বলেই মনে করত বা এখনও করে। মূর্তিগুলো দেবতা নয়, প্রতীক মাত্র। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যেমন একটা বিশ্বাস এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি যেমন হাজির হয়ে বলতে পারেন না, এই তো আমি আছি, এ-ও তেমনি বিশ্বাস। এই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির ও প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে 'আল্লাহ্‌' নামক যে ব্যক্তিত্বের (শক্তির) অস্তিত্ব কোরআনে দাবি করা হয়েছে, তা তো মহম্মদের মুখের কথা মাত্র। দেবতাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললে যেমন তারা প্রতিরোধ করতে অক্ষম বা করে না, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকায়) গালি দিলেও আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রতিবিধানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেবতাদের মন্দির ভাঙলে যেমন মন্দির ভঙ্গকারীর কোন শাস্তি দেওয়ার প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা দেবতারা করেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তেমনি আল্লাহ্‌র মসজিদ ভাঙলে বা তাঁর বাণী বলে কথিত কোরআন পোড়ালে মসজিদ বা কোরআন ধ্বংসকারীর কোন শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ করেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার ঐতিহাসিক বহু প্রমাণ আছে। আল্লাহ্‌ যে বিভিন্ন স্থানে অতীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ধ্বংস এনেছিলেন বলে কোরআনে বহুবার ঘোষিত হয়েছে (১১:৯৫; ৩৪:১৬-১৭; ৩৫:২৬; ৪৩:৮; ৪৬:২৫; ৫৩:৫০-৫২) তা তো প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা সর্বকালে ও দেশে ঘটে আসছে এবং তার ফলে সৎ অসৎ কিংবা ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষ ও প্রাণীরই বিপর্যয় ঘটে। এর দ্বারা কি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কিংবা সর্বময় কর্তৃত্বের অথবা তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে স্বয়ং ওসব করেন বলে প্রমাণিত হয়? হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ কাবা শরীফ পুড়িয়েছিলেন। তখন কি আল্লাহ্‌ ঠেকাতে পেরেছিলেন, না তার কোন ক্ষতি হয়েছিল? (দেখুন "হ্যাণ্ড বুক অব 'ইসলামের ইতিহাস" : লেখক— অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন আলী, এম. এ. এল-এল-বি, পৃ : ১৫৫ ও ১৬৬)। কোরআন সংকলন কালে খলিফা ওসমান পূর্বতন যে বাণীগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, তা-কি আল্লাহ্‌রই বাণী ছিল না?

৩৫নং সূরার ('সূরা ফাতির') ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে, ৪৬ নং সূরার (সূরা আহ্‌কাফ) ৬নং আয়াতে (উপরে উদ্ধৃত) এবং কোরআনের আরও অনেক জায়গায় দেবতাদের কোন ক্ষমতা নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা আছে বলে দম্ভ প্রকাশ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এ শুধু মহম্মদ প্রচারিত কথা। এবং এসব কথার সবচেয়ে ভাল জবাব ছিল আল্লাহ্‌কেও চ্যালেঞ্জ জানানো। তখন কোরেশরা তা করলেও সে কথা মুসলমানদের দ্বারা লিখিত ইতিহাসে নেই। সঙ্গত কারণেই নেই।

"... ইব্রাহিম বলল— নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করান, তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও, ..." (২: ২৫৮) এ আয়াতে ইব্রাহিমের

জবানিতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বর্ণনা করে নমরুদের (কোরআনের বর্ণিত একজন অত্যাচারী রাজা) প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। অবশ্য এটা সত্য যে, নমরুদ বা কোন মানুষই তা পারে না। (তবে হ্যা, পৃথিবীর আবর্তনের গতির চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কোন বিমানে চড়ে সূর্যের অস্তগমনের পর পূর্বদিক হতে পশ্চিমগামী মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হচ্ছে দেখতে পাবে, যদিও এটা ভিন্ন কথা।) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে তত্ত্বটি শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানে এবং মানে তা হচ্ছে— আমরা যে সূর্যকে উদিত ও অস্তমিত হতে দেখি তা সূর্যের পৃথিবীকে আবর্তনকারী গতির কারণে নয়। বরং পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডের উপর আহ্নিক গতির ফল। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঘটনা। সুতরাং তা পরিবর্তন করা মানুষের সাধ্যাতীত। প্রকৃতির খেয়ালে বা কোন ঘটনায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে। কিন্তু ইব্রাহিমের উক্ত চ্যালেঞ্জের জবাবে নমরুদের সবচেয়ে ভাল উত্তর ছিল ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌কে অনুরূপ চ্যালেঞ্জ জানানো। নমরুদ তা করেছিলেন কিনা কোরআনে তার উল্লেখ নেই। এবং আল্লাহ্ তা পারতেনও না। সুতরাং এ ধরনের চ্যালেঞ্জ জানানো একটা নির্বোধের উক্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

"আসমান জমিনে এমন কোন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কেতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" (২৭:৭৫) কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে সকল জ্ঞানের আধার, এমনই একটি ভাব উল্লিখিত আয়াতের মারফত প্রকাশ করা হয়েছে চ্যালেঞ্জের ভাষায়, যা ভিত্তিহীন গৌরবের দাবি ছাড়া কিছু নয়। সমগ্র কোরআন পড়লেই তা প্রমাণিত হবে। আমরা সামান্য কিছু আলোচনা করে উক্ত দাবির অসারতা প্রমাণ করবো। মানুষের জন্ম সম্পর্কিত অনেক আয়াত কোরআনে আছে। তন্মধ্যে ১৫: ২৬; ৫৫: ১৪; ৪০:৬৭; ২২:৫; ৭৫:৩৭; ৭৬:২; ৭৭:২০; ৮৬:৬; ২৩:১১, ১৩; ২৫:৫৪ এই আয়াতগুলির কোনটাতে পানি, কোনটাতে শুক্র, রক্তপিণ্ড, কোনটাতে ঘৃণিত সলিল বিন্দু কিংবা মাটি, পোড়ামাটি, কাদার শুষ্ক ঠনঠনে মাটি ইত্যাদি হতে মানুষের জন্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে 'কোরআনে অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, বক্তব্যগুলির মধ্যে মিল তো নেই-ই বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিকও বটে। অথচ এসব অজ্ঞতাকেই পরম জ্ঞান বলে দম্ভ প্রকাশ করা হয়েছে।

আকাশ পৃথিবী ইত্যাদির সৃষ্টির সম্পর্কে কোরআনে অনেক আয়াতের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে— "... তিনি যখন কোন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন— 'হও' এবং তা হয়ে যায়।" (২: ১১৭; ১৯: ৩৫) "... তিনি ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ... " (৭:৫৪) "তিনিই ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, ..."

(১১:৭; ৫৭:৪) "আল্লাহ্ যিনি আসমান ও জমিন ও তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। ..." (৩২: ৪) "... যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে, ..." (৪১: ৯) "... এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন ..." (৪১: ১০)

উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে যে দাবি করা হয়েছে, স্পষ্টতই তা আল্লাহ্র ভাষায় নয়। কিন্তু কার ভাষায় এ দাবি তা কিন্তু বোঝা যায় না। এ দাবি যারই হোক, তিনি কোথায় এসব তথ্য পেলেন তা জানা যায় না। যখন কোনকিছুই ছিল না তখন দিনের হিসেবটা কিভাবে হল এবং কত দিন আগে এসব সৃষ্টির কাজগুলো হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর কোরআনে নেই। যাহোক, 'কোরআনে অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য' পরিচ্ছেদে এ আয়াতগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোথাও কোথাও (যেমন— ৭: ৫৪ ও ১১: ৭) মিল থাকলেও বেমিলও অনেক। যেমন— ৪১: ৯ এবং ৪১: ১০ নং আয়াত দুটিতে দেখা যাচ্ছে, ছয়দিনে শুধু পৃথিবী ও তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা আল্লাহ্ করেছেন। আসমান সৃষ্টির কথা ভিন্ন করে বলা হয়েছে ৪১:১২ নং আয়াতটিতে, যাতে আল্লাহ্র দুদিন লেগেছে। তাহলে ৪১নং সূরার ৯, ১০ ও ১২নং আয়াতের হিসেবে দেখা যায় মোট আটদিন লেগেছে আসমান, জমিন ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে। হিসেবের মিল হল কি?

আবার " আমি আসমান ও জমিন এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (৫০: ৩৮) এবার কিন্তু ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্র। আবার তাতে কিছু বাহাদুরিরও ছোঁয়া আছে — "আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" সত্যিই তো তাঁকে ক্লান্ত হতে হবে কেন! এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে— 'হও' বললেই হয়ে যাওয়া এবং ছয়দিন ও আটদিনে আসমান জমিন ইত্যাদি সৃষ্টির কথা কোরআনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে এগুলির মধ্যে কোনটাকে সত্য বলে ধরা হবে?

সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কিত অনেক আয়াতের মধ্যে কয়েকটি হল— ২১: ৩৩; ৩৫: ১৩; ৩৯: ৫ এবং ৫৫: ৫। এই আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য ওরা নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে । বস্তুতঃ এ কথা বলে কোন্ গভীর জ্ঞান আল্লাহ্ প্রকাশ করলেন বুঝি না। এ বক্তব্য তো একটি অতি সাধারণ লোকও বলতে পারে। কেননা সূর্য ও চাঁদের প্রাত্যহিক গতি দেখেই তা বলা যায়। যদিও চাঁদ সম্পর্কে এ কথা ঠিক হলেও সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্পর্কে একেবারেই তা ঠিক নয়। আসলে পৃথিবীর গতি বিষয়ে কিছু না বলাই কোরআনের তথা আল্লাহ্র অজ্ঞতা। এবং চাঁদকে জ্যোর্তিময় বলাও (২৫:৬১) কোরআনের আর এক অজ্ঞতা। সাধারণ লোকের কাছে চাঁদ জ্যোতির্ময়ী মনে হলেও, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো বা জ্যোতি নেই। কোরআন সেই আসল তত্ত্বটাই জানে না। বলা যায় মানুষের জন্ম, চন্দ্র-সূর্যের গতি, পৃথিবী ও আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী

ইত্যাদি নিয়ে কোরআন যা বলেছে তা ভুলে ভরা। বিশ্ব সৃষ্টি, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব, বিবর্তনবাদ, মৃত নক্ষত্র, ব্ল্যাক-হোল, মহাকর্ষ, অভিকর্ষ, আণবিক তত্ত্ব, তাপ, চুম্বক, বিদ্যুৎ ইত্যাদির হাজারো রহস্য ও তার প্রকৃত কারণের কোনটাই কোরআন বলেনি বা বলতে পারেনি। তবু তার দাবি—" উহাতে সব রহস্য লিপিবদ্ধ আছে " (২৭: ৭৫)। এই দাবি যে কতখানি আজগুবি ও হাস্যকর তা সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী মুক্তবুদ্ধি মানুষ মাত্রই বুঝবেন। বোধ করি ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌ত, দোজখ, পৌরাণিক অপ্রামাণ্য কিছু কাল্পনিক পূর্ব প্রচলিত কাহিনী, অবৈজ্ঞানিক যাদু-টোনা (সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস্'-এ এ বিষয়ে উল্লেখ আছে) ইত্যাদিকেই জ্ঞানের শেষ সীমা বলে কোরআন প্রবক্তা মনে করেছেন এবং অন্ধ বিশ্বাসীরাই তাকে চরম সত্য বলে বাহাদুরি করে। অথচ এগুলি যে চরম অজ্ঞানতা ছাড়া কিছু নয়, তা তাদের মনেই হয় না। এ নিয়েই চ্যালেঞ্জ!

And they say : None entereth Paradise unless he be a Jew or a Christian. These are their own desires. Say : Bring your proof (of what ye state) if you are truthful (2:111) অর্থাৎ— "তারা বলে, ইহুদী ও খ্রীস্টান ব্যতীত কেউ স্বর্গে যাবে না। এসব তাদের নিজস্ব আকাঙ্খা। তুমি বলে দাও— তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ কর।"

নিঃসন্দেহে কোরআনের এও একটি হাস্যকর চ্যালেঞ্জ ও প্রবঞ্চনার প্রয়াস। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের স্বর্গ পাওয়ার দাবিকে নস্যাৎ করে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কোরআন প্রবক্তার এ কথা মনেই হয়নি যে, স্বর্গটা বাস্তব কিছু নয়, কল্পনার বিষয় মাত্র। সুতরাং সেখানে কে যাবে না যাবে তা প্রমাণ করার ক্ষমতা ইহুদী খ্রীস্টানদের যেমন নেই, তেমনি মহম্মদেরও নেই। ইহুদী, খ্রীস্টান বা অন্য যে কোন ধর্মের লোকেরাই যদি কোরআনের উপরোক্ত ভাষায়ই মহম্মদকে চ্যালেঞ্জ জানায় তবে আল্লাহ্ তথা মহম্মদ কি তাঁদের স্বর্গ পাইয়ে দেবার দাবির অনুকূলে কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন? তা কি সম্ভব?

কোরআনের আর একটি চ্যালেঞ্জের উদাহরণ উদ্ধৃত করেই এ আলোচনার সমাপ্তি টানবো—"বল - তোমরা যাদের আল্লাহ্‌র শরিক স্থির করেছো, তাদের আমাকে দেখাও। না, তাঁর কোন শরিক নেই। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। " (৩৪: ২৭) খুবই হাস্যকর এ চ্যালেঞ্জ। কেননা আরবের তৎকালীন সেই মূর্তিপূজকরা, যাদের উদ্দেশ্যে উক্ত চ্যালেঞ্জ কোরআনে করা হয়েছে তারা জবাবে তাদের প্রতিমাগুলিই দেখাতে পারত। কিন্তু আসলে ওগুলো তো শক্তিহীন এক জড় প্রতীক ছাড়া কিছুই ছিল না। যে সকল কল্পিত শক্তির প্রতীক হিসেবে মূর্তিগুলো পূজিত হত সেই অদৃশ্য শক্তিকে প্রত্যক্ষ করানো তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এবং

তাদের এ অক্ষমতাকে কোরআন যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তার সঠিক প্রত্যুত্তরে ছিল মহম্মদকে চ্যালেঞ্জ জানানো যে, তিনিই কি আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়ে তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারতেন? কোন কালেও তা সম্ভব নয়। বস্তুত এই ধরনের চ্যালেঞ্জ জানানো নিতান্ত ছেলে-মানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

১। "নিশ্চয়ই এই কোরআন এক সম্মানিত রসুলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত।" (৬৯: ৪০)। "এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" - (৬৯: ৪৩)। এই ধরনের আয়াতকে ভিত্তি করে ডঃ গনী লিখেছেন— "কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র বাণী, একটি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ"। (ডঃ গণীকৃত কোরআন-এর বাংলা অনুবাদের পূর্বাভাস, পৃ-৪৫)

২৪॥ কোরআনে বিশ্ব ধ্বংসের দিন (কিয়ামত)

ইসলাম ধর্মমতানুসারে আল্লাহ্‌র নির্দেশে একদিন ইস্রাফিল নামের এক অপেক্ষমান ফেরেশ্‌তা শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, সাথে সাথে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। পরে আবার উনি ঐ শিঙ্গায় আর একটি ফুঁ দেবেন। তখন সমগ্র মনুষ্য জাতি, যারা সৃষ্টির পর হতে জন্মেছে ও মরেছে, জীবন্ত হয়ে উঠবে এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির করা হবে তাদের কৃতকর্মের বিচারের জন্য। ঐ দিনের নাম কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিন। কোরআনের ভাষায়—

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে— একটি মাত্র ফুৎকার। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে, একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।" (৬৯: ১৩-১৪)

কোরআনে 'কিয়ামত' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, উত্থান দিবস, শেষ বিচারের দিন, মহাপ্রলয় কাল, কর্মফল দিবস, মহা দিবস ইত্যাদি এবং এ কিয়ামত সম্পর্কে অন্ততঃ শতাধিক বার কোরআনে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এই মর্মে যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। এখানে আমরা কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি—

১। "যেদিন কিয়ামত হবে সেইদিন অপরাধীগণ হতাশ হয়ে পড়বে।" (৩০:১২)

২। "যেদিন কিয়ামত হবে সেইদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।" (৩০:১৪)

৩। "... সেদিন (কিয়ামতের দিন) একদল জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করবে।" (৪২:৭)

৪। "কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন, ..." (৩১:৩৪)

৫। "ওরা (পরিহাসভরে) জিজ্ঞাসা করে, কর্মফল দিবস কবে হবে? বল— সেই দিন যখন ওদের শাস্তি দেওয়া হবে আগুনে।" (৫১: ১২-১৩)

৬। "সেই সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, ..." (৫৪:১)

৭। "মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, ... " (২১:১)

৮। "... তুমি কি জান— **সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন।**" (৪২:১৭)

৯। " তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে? তুমি এ বিষয়ে কি জান? এর চরম জ্ঞান আছে, তোমার প্রতিপালকেরই, যে ওর ভয় রাখে, তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করবে।" (৭৯:৪২-৪৫) (অনুরূপ— ২৭:৮৭; ৫০:২০; ৭৮:১৭,১৮; ৪৭:১৮; ৩৩:৬৩; ৫৩:২৭ ইত্যাদি)

কোরআনে কিয়ামত সম্পর্কিত বহু আয়াতের মধ্যে উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলো পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়— কতকগুলোর বক্তা আল্লাহ্ স্বয়ং, কয়েকটির বক্তা অন্য কেউ। আবার কয়েকটির বক্তা কে তা বোঝা যায় না। তবে বক্তব্য পরিষ্কার— প্রথমতঃ শিঙ্গায় ফুৎকার দিলেই কিয়ামত হবে এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মৃত মানুষগুলো জীবিত হয়ে উঠবে এবং দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল যাবে বেহেশ্তে এবং অন্যদল যাবে দোজখে অর্থাৎ নরকে।

দ্বিতীয়ত ঃ সেই অবধারিত কিয়ামত '**সম্ভবত আসন্ন**' কিংবা '**আসন্ন**' বা '**হয়ে যেতে পারে**' এবং 'আল্লাই তা জানেন'।

এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই, একদিন শিঙ্গার একটি মাত্র ফুৎকার দিলেই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে, তা কল্পনা মাত্র; বিজ্ঞান সম্মত নয়। এ ব্যাপারে আগেই 'কোরআনে অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য' পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়ে প্রশ্ন হল যে, আল্লাহ্ সব কিছু জানেন বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কিয়ামত কবে হবে তা বললেন না কেন? কখনও বললেন 'সম্ভবত আসন্ন', কখনও বললেন 'আসন্ন'। এ সব বলে সংশয় প্রকাশ করলেন কেন? তাহলে কিয়ামতের দিন-তারিখ তিনি কি জানেন না? ৫৪:১ নং আয়াতে উল্লেখিত চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। আসলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়নি। তাহলে এটা তো তাঁর ভুল!

কোরআন যিনিই লিখুন বা বলুন না কেন, তিনি কিয়ামত সম্পর্কে দিন তারিখ না বলে 'সর্বজ্ঞতা'-র পরিচয় দেননি। পরিচয় দিয়েছেন চাতুর্যের। এ সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন এসে গেল। ধরে নিলাম কিয়ামত হয়ে গেল। সব মানুষের বিচারও হল। মুসলমানরা স্বর্গে চলে গেলেন। অমুসলমনরা গেলেন নরকে। তারা চিরকাল ওখানেই থাকবেন। তখন আল্লাহ্র কি কাজ থাকবে? তিনি কি চিরদিনের জন্য অবসর নেবেন? এ ব্যাপারে কোরআন নীরব কেন?

কোরআনে কিয়ামত সম্পর্কে অসম্ভব এবং অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করে এর রচয়িতা মানুষকে অযথা আতঙ্কিত করতে চেয়েছেন। ভয় দেখিয়ে দল ভারী করার প্রচেষ্টা বৈকি!

২৫ ॥ কোরআনে একই কথার অহেতুক ও বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি

"সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্বলিত এই আয়াতটি অন্তত ৩১ বার বলা হয়েছে ৫৫ নং সূরায় অর্থাৎ 'সূরা রহমান'-এ। এর মধ্যে ১৬, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪২ এবং ৪৪ নং আয়াতে ৬ বার বলা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অর্থাৎ অনুগ্রহের প্রসঙ্গে নয়। বলা যায় নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গেও বাক্যটি আস্ফালনের সুরে উচ্চারিত হয়েছে। এবং ৫৩ নং সূরার (সূরা 'নাজম') ৫৫ নং আয়াতটিও অপ্রাসঙ্গিক এবং পুনরাবৃত্তির আর একটি উদাহরণ। মনে হয় আয়াতটি ৫৫ নং সূরা হতে ভুলে এখানে এসেছে।

"সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য পরিতাপ।" — এ বাক্যটি 'সূরা মুরসালাত'-এ (৭৭ নং সূরা) দশবার বলা হয়েছে— ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭ ও ৪৯ নং আয়াত সমূহে।

"নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এ কোরআন সহজ করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?" এ বাক্যটি ৫৪ নং সূরার ৫-টি আয়াতে (১৫, ১৭, ২২, ৩২, ও ৪০) আছে।

'সূরা নমল'-এর (২৭ নং সূরা) ৭ থেকে ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত এবং 'সূরা ক্বাসাস'-এর (২৮ নং সূরা) ২৯ থেকে ৩২ নং আয়াতের বক্তব্য একই। যেমন — তূর পর্বতে মুসার আগুন দেখা, পরিবারবর্গকে রেখে সেখান থেকে আগুন আনতে যাওয়া, সেখানে গিয়ে অদৃশ্য কন্ঠের আদেশ অনুযায়ী তার হাতের লাঠি ভূমিতে নিক্ষেপ, ওটার সাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। পর পর দু'টি সূরার এতগুলি আয়াতে একই ভাষায় একই ঘটনার বর্ণনায় যে কী চমৎকারিত্ব ও প্রয়োজন তা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন।

"আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আছে।"

উপরোক্ত বাক্যগুলি হুবহু একই ভাষায় ২৬ নং সূরায় নূহ বলেছেন তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি, 'আদ' সম্প্রদায়ের প্রতি 'হুদ', সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি 'সালেহ্', লুতের সম্প্রদাযের প্রতি 'লুত', শোয়াইব সম্প্রদায়ের প্রতি 'শোয়াইব' বলেছেন। দেখুন: ১০৭-১০৯; ১২৫-১২৭; ১৪৩-১৪৫; ১৬২-১৬৪; এবং ১৭৮-১৮০ নং আয়াত সমূহ। কোরআনের বিচারে বক্তারা সকলেই একেক জন নবী। এই নবীরা এসেছিলেন বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন এলাকায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এঁরা অবিকল একই ভাষায় কথাগুলি বলেছিলেন কি করে?

২৯ নং, ৫৩ নং এবং ৫৪ নং সূরায় লুত, নূহ, ইব্রাহিম ও আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরক্তিকর ভাবে একই কথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে।

"আশমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে..." — এই একই কথা দেখা যায় মদীনায় অবতীর্ণ ৫৯:১, ২৪; ৬১:১; ৬২:১; ৬৪:১নং আয়াত সমূহে। ১১নং সূরার ৭নং রুকু এবং ৫১নং সূরার ২নং রুকুর বিষয়বস্তু একই। ইহুদি, খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে ২: ৬২ এবং ৫:৬৯ নং আয়াত দুটোতেও।

এ ছাড়া অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের যুদ্ধ করার নির্দেশ, বিশ্বাসীদের নিশ্চিত স্বর্গ (জান্নাত) প্রাপ্তি, বিচার না করেই অবিশ্বাসীদের স্থায়ীভাবে নরকে প্রেরণ, আশমান, জমিন, জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টির কথা কোরআনে যে কতবার আছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব, নিঃসংশয়ে বলা যায় এ সব বিরক্তিকর পুনরুক্তিগুলি না থাকলে কোরআনের বক্তব্য লিখতে ২৫-৩০ পৃষ্ঠার বেশী লাগত না। আমাদের মনে হয়, এই পুনরুক্তিগুলি দ্বারা কোরআনকে অযথা ভারাক্রান্ত, বিরক্তিকর ও অনাকর্ষণীয় করা হয়েছে, যা কোরআন পাঠের ব্যাপারে একটি বড় বাধা।

২৬॥ প্রগতির পথরোধকারী কোরআন

মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই আমরা যাকে প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' বলি, সে সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষ বহু কথা বলে গেছেন। তাঁদের অনেকের নামই ইতিহাসে রক্ষিত হয়নি। বিখ্যাত যাঁদের কথা মানুষ মনে রেখেছে, তাঁদের প্রচারিত বাণী সমূহ পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের নিজের বা ঐশী বাণী বলে চলে আসছে। ধর্মীয় মহাপুরুষ, অবতার কিংবা পয়গম্বরদের সেই ধারা মানব সমাজের প্রয়োজনেই চলতে থাকবে। হয়ত সমাজের পরিবর্তনে তাঁদের বক্তব্যের ধরনে বা বিষয়ের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতেই পারে। আজ পর্যন্ত মানব সমাজের ধর্মীয় ইতিহাসের যতটা সময় কেটেছে, সে তুলনায় আগামী কালে মানব সমাজ ও তার ধর্মীয় ইতিহাস কতটা দীর্ঘায়িত হবে তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও তা যে হাজার হাজার বছর হতে পারে এবং অতীতের তুলনায় তা কম দীর্ঘ হবে বলেও মনে হয় না। আর সে কারণেই ধর্ম বা সমাজ সম্পর্কিত নীতিতে শেষ কথা বলে কোন কথা থাকা উচিত নয়। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে নায়িকা কমলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

(১) "... কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই।" (১১শ পরিচ্ছেদ)

(২) "... মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। ..." (১৮শ পরিচ্ছেদ)

(৩) "... সত্যের সীমা যে কোন একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়নি..." (২৮ শ পরিচ্ছেদ)

আবার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ৩য় পর্ব ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত বলছে — "এ সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— এ তিন কালের জন্য বহু পূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকী নাই। ... শুধু এই কথাটাই ভাবি তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরেজী আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন। আমরাও হয়ত সত্যসত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।"

এ হল প্রগতির ভাষা। কালের পরিবর্তনে মানুষের সমাজে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হবে। পরিপ্রেক্ষিত বদলাবে। এ এক অবশ্যম্ভাবী বিরাট ব্যাপার। সুতরাং গতিময় মানব সমাজের রীতিনীতি, অনুশাসন অবিচল থাকতে পারে না। অতীতের যা ভাল ছিল হয়ত তার সব কিছুই আজ আর ভাল নেই। আবার বর্তমানের যা কিছু ভাল সবই আগামী দিনেও ভাল থাকবে, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ সত্যকে মানতেই হবে। কিন্তু কোরআন তা মানেনি। 'কিয়ামত' অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস অদূরবর্তী বলে হযরত মহম্মদকে শেষ নবী, কোরআনকে সকল জ্ঞানের আকর এবং সকল ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করে ইসলামকেই মনুষ্য সমাজের জন্য সর্বশেষ ও একমাত্র মনোনীত ধর্ম বলে আল্লাহ্ হুকুম জারি করেছেন।[১]

মুসলমানদের দাবি কোরআনের শেষ বাণীটি 'সূরা মায়িদা'-র (৫নং সূরা) ৩নং আয়াতটি ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভবত মার্চ মাসের প্রথম ভাগে হজরত মহম্মদের বিদায় হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে নাযেল হয়। তারপর সুদীর্ঘ প্রায় পৌনে চৌদ্দশ' বছর কেটেছে; কিন্তু সেই আসন্ন কিয়ামত এখনও আসেনি, কবে আসবে তারও ঠিক ঠিকানা নেই। যদিও না আসাটাই আমরা চাই। এ দিকে আল্লাহ্‌রও আর দেখা নেই। থাকলেও বোঝার উপায় নেই। কেননা শেষ নবী তো কবেই শেষ হয়েছেন। সুতরাং আর 'ওহী' (আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ) আসবার সুযোগ নেই। অতএব, কোরআন সর্বশেষ কিতাব। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রেক্ষাপট বদলেছে। ফোরাত ও দজলায় কত পানি গড়িয়েছে হিসেব নেই। যুদ্ধাস্ত্র ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদির দিন গেছে। তার পরিবর্তে এসেছে এ, কে -৪৭ রাইফেল, ভয়ঙ্কর রাসায়নিক, জীবাণু ও আনবিক বোমা। এসেছে দূরনিয়ন্ত্রিত রঙ্গীন দূরদর্শন, রোবট, কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ই-মেল আরও কত কি। তরল সোনা তেলের খনি পেয়ে (রসুলের দেশের এত বড় একটা লুক্কায়িত

সম্পদের কথা কোরআনে আছে নাকি?) মধ্যপ্রাচ্যের মরুময় দেশগুলির কপাল খুলেছে। কিন্তু কোরআন অপরিবর্তিত অবস্থায়(?) তার মহিমা নিয়ে অবিচল আছে। অথচ কোরআনে সুদ হারাম হলেও (২:২৭৫-৭৬) আফগানিস্থানের মুসলমানরা সুদের ব্যবসায় বহুদিন হতেই লিপ্ত আছেন। পৃথিবীব্যাপী ব্যাঙ্কিং-এর অভাবনীয় বিস্তার, উন্নয়ন ও ব্যবস্থায় সুদ নিতে মৌলবাদী ছাড়া অনেক 'বিশ্বাসী' ভাইদের দ্বিধা নেই। কোরআনে নিষিদ্ধ মদ (বেহেশ্তে নিষিদ্ধ নয়) জুয়া, শুকর মাংস (৫:৩, ৯০; ২:১৭৩; ৯৩:১১৫) এবং অবৈধ নারী (৪:২৩-২৪) ইত্যাদিতে অনেক মুসলমানেরই প্রচুর খায়েশ।

একবিংশ শতাব্দী আমাদের দুয়ারে হাজারো পরিবর্তনের চমক নিয়ে হাজির। আর বিশ্ব-মানবের জন্য শেষ আসমানী কিতাব কোরআন অপরিবর্তিত থেকে প্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, পরিবর্তনের কোন পথ খোলা নেই। এ অপরিবর্তনীয় ও সন্দেহাতীত, আল্লাহ্‌র বাণী। কোরআনোত্তর পৃথিবীতে কিয়ামত আসতে যত বিলম্বই ঘটুক, পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমাজ যতই বদলাক, মানুষের সমস্যা যতই ভিন্নতর হোক, যত মহামানব বা মনীষীর আবির্ভাব হোক, কারও আর ধর্ম বিষয়ে কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। বললেও সেগুলি শয়তানের কথা। কোরআনের বাইরে যাবার উপায় নেই; কেননা আল্লাহ্ তো বলেইছেন, আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সর্বশেষ রসুল মহম্মদকে তোমাদের জন্য দয়া করে পাঠিয়েছি। অতএব আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে জীবিতকালে গনিমতের মাল ও বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও দাসীদের ভোগ কর এবং মৃত্যুর পর অনন্তকালের জন্য জান্নাতবাসী হবে। সুন্দর পোষাক, অনেক অপরূপা কুমারী নারী, বিশুদ্ধ সুরা ইত্যাদির অঢেল ব্যবস্থা সেখানে হবে। (৮:৬৯; ৪৪:৫৪; ৫৫:৫৬; ৫৬:১৭-২৪) অপর পক্ষে কোরআন ও রসুলের উপদেশ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলে অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হবে (৭২:২৩, ৭৮:২৩-২৫) অন্য কোন উপায় নেই। সমস্ত কথার ফুলস্টপ দেওয়া হয়ে গেছে। এখন যদিও কিছু বর্ণচোরা প্রগতিবাদী এবং প্রকৃত মানবধর্মী মুসলমান (শাহরিয়ার কবীর, সালাম আজাদ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন, দায়ুদ হায়দার প্রমুখ) অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে ইসলামের সহাবস্থানের কথা বলেছেন। কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস ও কোরআন কি তা প্রমাণ করে? কোরআন হাদিস অপরিবর্তিত রেখে, তাকে পুরোপুরি মেনে (পুরোপুরি না মানলে তো তার আর মুসলমানিত্বই থাকে না) কি একই দেশে অমুসলমানদের বিশেষত, প্রতিমা পূজকদের সাথে বিশ্বাসীদের থাকা সম্ভব? সমস্যা 'দারুল ইসলাম' ও দারুল হরব' নিয়ে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের প্রতি কোরআনের কঠোর জেহাদের আহ্বান নিয়ে, রসুলের সুন্নত দেব দেবীর মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে, জিজিয়া কর আদায় নিয়ে এবং আরও বহুতর সমস্যা নিয়ে। মধ্য প্রাচ্যের

ইসলামী দেশগুলিতে কি স্থায়ীভাবে অমুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করে সমনাগরিক অধিকার নিয়ে আছে ?

১। "... বরং সে আল্লাহ্‌র রসুল এবং সকল নবীর শেষ নবী ..." ৩৩: ৪০; "আসমান ও জমিনে এমন কোন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কেতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" ২৭:৭৫; "... আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম... ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম, ... ৫:৩)।

২৭॥ কোরআনে জন্মান্তর অস্বীকার কি যৌক্তিক

ইসলাম ধর্ম জন্মান্তরে বিশ্বাসী নয়। কোরআনে এর অনেক প্রমাণ আছে। তার কয়েকটি—

"যখন ওদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠাও। যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। না, এ হবার নয়, ..." (২৩: ৯৯-১০০)

"... সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (২:২৫; 'সেখানে' অর্থাৎ জান্নাতে, 'তাদের' অর্থাৎ বিশ্বাসীদের - লেখক)

" ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না ..." (৪৪:৫৬) (অনুরূপ ৭২:২৩; ৮২:১৪ ইত্যাদি)

উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলো হতে স্পষ্ট বোঝা গেল - মানুষের মৃত্যুর পর আর তাদের জন্ম হবে না, কর্মফল অনুযায়ী মানুষ জান্নাতে বা দোজখে চিরকাল থাকবে। এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন- মানুষ তার সীমিত কালের জীবনে যে পাপ বা পুণ্য করে তা তো সীমিতই, অথচ সে সেই সীমিত পাপ বা পুণ্যের জন্য অনন্ত কাল কেন দোজখ বা বেহেশ্‌তে থাকবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন - দেখা যায় পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি বা অবস্থায় জন্মায়। তাতে জন্মগ্রহণকারী শিশুর কোন হাত থাকে না। কোন শিশু বিত্তশালীর ঘরে সুন্দর স্বাস্থ্য ও মেধা নিয়ে প্রাচুর্যের মাঝে জন্মানোর ফলে সে নানা সুবিধা সুযোগ পাওয়ায় পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করল। জীবনভর সুখে কাটিয়ে একসময় তার মৃত্যু হল। আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় রাস্তার এক ভিখারিণীর গর্ভে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে একটি শিশুর জন্ম হল। সামাজিক বিচারে ঐ শিশুটি হয়তবা অবৈধ। রোগ, ক্ষুধা, বস্ত্রাভাব, অশিক্ষা, আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে দুঃখে দুঃখে জীবন কাটিয়ে তার মৃত্যু হল— পরিণত বা অপরিণত বয়সে। সুখ কাকে বলে সে তার স্বাদই পেল না। মনে রাখতে হবে, কোরআন মতে পুনর্জন্ম নেই। অর্থাৎ একবারই জন্ম এবং একবারই মৃত্যু। সুতরাং নূতন আগত যে কোন শিশুরই পাপ বা পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে না।

এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত ধনীর ঘরে সুখের মধ্যে জন্মানো কিংবা চরম দারিদ্র ও লাঞ্ছনার মধ্যে জন্মানো শিশু দুইটির মধ্যে সুখ ও দুঃখ ভোগের যে বিশাল বৈষম্য তার জন্য সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তো আল্লাহ্ই দায়ী। নিরপরাধ শিশুদের জন্মের এই বৈষম্যের মূল ব্যবস্থাকারী আল্লাহ্কে কি সুবিচারক ও পরম দয়ালুর পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী খামখেয়ালী ও নিষ্ঠুর বলে মনে হয় না? অথবা কোরআনের ওসব বাণী দেওয়ার সময় এসব সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে এবং তার জবাব জন্মান্তর ছাড়া দেওয়া যায় না, এমন কথা বাণীদাতার চিন্তায় আসেনি। তাছাড়া যে শিশুটি কোরআনের মতে 'অবিশ্বাসীর' ঘরে জন্মালো এবং ধর্মান্তরিত হয়ে 'বিশ্বাসী' হওয়ার মত বয়স হওয়ার পূর্বেই মরলো, কিন্তু তার যে অনিবার্য অনন্ত দোজখ বাস হবে তার তো কারণই নেই। অথচ এই বিচার যেহেতু আল্লাহ্র সুতরাং তাকে সুবিচারক বলা যায় কি?

যদিও কোরআনে জন্মান্তরের কথা স্বীকৃত হয়নি বলেই মোটামুটি দেখা যায়, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, হজরত মহম্মদের অন্তত একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে জন্মান্তরের কথার উল্লেখ আছে। জেহাদ প্রসঙ্গে নবী মহম্মদের হাদিসটি এই রূপ—

" হয়রত আবু হুরাইরা বলেন, রসুলুল্লা বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার মুঠার মধ্যে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হইল আমি আল্লাহ্র পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই। আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, তারপরেও পুনরায় জীবন লাভ করি, পরে আবার নিহত হই।"(মিসকাত শরীফের ৪৪৮৯ নং হাদিস। সুহাস মজুমদার-এর 'জেহাদ' বই-এর ১৭ নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।)

যেহেতু হাদিস মুসলমানদের নিকট কোরআনের মতই মান্য ও প্রতিপালনীয়, সুতরাং পুনর্জন্ম সম্পর্কে নবী মহম্মদের উক্তিটি একেবারে ফেলনা নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

২৮ ॥ দলীয় সঙ্কীর্ণতায় উৎসাহ দান : কোরআন ও মহম্মদের

"... এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য স্বীকার কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (৮:১)

"যারা নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।" (৮:৩)

"হে বিশ্বাসীগণ। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, ..." (৫:৫১)

"হে বিশ্বাসীগণ। বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা,..." (৪:১৪৪)

" প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। " (৩:১০৩ এবং বিদায় হজ্বে আরাফাত ময়দানে মহম্মদের ঘোষণা।)

'ধর্ম' শব্দটির নানা প্রকার অর্থ ও ব্যাখ্যা আছে। সেগুলি খুবই জটিল বলে সাধারণ লোকের বুঝতে কষ্ট হয়। লোক প্রচলিত প্রধান যে অর্থটি সকল সাধারণ মানুষ মোটামুটি বোঝে তা হচ্ছে লোক পরম্পরা কতগুলো ধারণায় বিশ্বাস। সে ধারণাগুলো সাধারণত নিম্নরূপ—

(১) মানুষের ইহজাগতিক জীবন শেষ হলে অর্থাৎ মৃত্যুর পরও একটা অপার্থিব জীবন আছে।

(২) জীবিত মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তির অস্তিত্ব আছে, যা না থাকলে মানুষকে মৃত বলা হয়। সেই অশরীরী শক্তিকে আত্মা বলে।

(৩) অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রে সকল সৃষ্টির মূলে অতি-প্রাকৃত অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, অসীম শক্তির অধিকারী একটি অস্তিত্ব আছে। তিনি মনুষ্যকৃত সকল কাজের ভাল মন্দ বিচার করে অবধারিত নির্ভুল ফলদান করেন। তিনি সকল কিছু সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন। এবং

(৪) সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকারী দ্বারা প্রেরিত বা অন্য কোন মহাপুরুষ কর্তৃক মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক জীবনে শান্তি প্রাপ্তি বা আত্মিক মুক্তির উদ্দেশ্যে পালনীয় অনুশাসনাদি প্রচারিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত ধারণাগুলি থেকে আমরা 'ধর্ম' বলে যা বোঝাতে চাইছি, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, সুখী ও কল্যাণকামী করে তোলা। সেজন্য মানুষের ভেতর মনুষ্যত্ব সৃষ্টি প্রকৃত ধর্মের একটি পন্থা বা উপায়। মানুষের মধ্যে দল সৃষ্টি করা কিংবা ভেদ বুদ্ধি জাগিয়ে তোলা 'ধর্ম' বলে গণ্য হতে পারে না।

কিন্তু কোরআনের অনেক স্থানে দল সৃষ্টিই যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা ইসলামের প্রচার ও মুসলমানদের দল বৃদ্ধির জন্য কোরআন বাণিজ্যিক পণ্যের বিজ্ঞাপনের ভাষায় কথা বলে এমন উদাহরণ বহু আছে। নিচের কয়েকটি উদাহরণ আমাদের মন্তব্যকে যথেষ্টভাবে প্রমাণ করবে—

" নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম, ..." (৩:১৯)

"তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে উদ্ভূত হয়েছো, তোমরা সৎকাজের আদেশ দান কর ও অসৎ কাজ নিষেধ কর, ..." (৩:১১০)

উপরোক্ত আয়াত গুলিতে দেখা যায় ইসলাম ব্যতীত অপর ধর্মগুলি আল্লাহ্‌র নিকট অমনোনীত এবং যত সৎকাজ মুসলমানরাই করে, অসৎ কাজ তারাই নিষেধ করে এবং তারা মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পরোক্ষে অপর ধর্ম ও তাদের অনুসারীদের সম্পর্কে কী ইঙ্গিত করা হল তার ব্যাখ্যা না করলেও চলবে; কিন্তু

মানুষের ইতিহাস কি এ সকল সংকীর্ণ প্রচারমূলক কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে? প্রকৃতই কি ইসলাম ত্রুটিমুক্ত অভ্রান্ত ধর্ম? এবং মুসলমানরা কি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়? নিশ্চয়ই উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে - 'না'। সুতরাং কোরআনের এরূপ ঘোষণাকে অভ্রান্ত বলা যায় কি?

এখন এ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই আমরা কোরআনের ও হযরত মহম্মদের যে সব ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতে কি মানুষ বা মনুষ্যত্বের কথা বলা হয়েছে? কোরআন ও মহম্মদ বিশ্বের সকল মানুষের কথা বলেননি। কেবল বিশ্বাসীদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্, রসুল, নামায ইত্যাদি মানলেই 'বিশ্বাসী'। আর তাদেরই ঐক্যবদ্ধ (দলবদ্ধ) হতে বলা হয়েছে। 'মুসলমান' ছাড়া বাকী সকলেই 'অবিশ্বাসী'। তা অবিশ্বাসীরা যত সৎ বা ভাল মানুষই হোন না কেন। কোরআনের দৃষ্টিতে তাঁর কানা কড়ি মূল্যও নেই। কেননা কোরআনেই আছে— "... প্রতিমা পূজকরা অপবিত্র জীব। ..." (৯: ২৮) ; "... একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাস কোন উচ্চ বংশজাত প্রতিমা পূজকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, ..." (২: ২২১) এবং যে কোন মুসলমান এ বিধান বিশ্বাস করতে বাধ্য। একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উদাহরণ দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের দেবজ্যোতি রায়ের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল' বইতে ঘটনাটি লেখা হয়েছে (পৃ- ৩০-৩১) "মুসলিম লীগের মহম্মদ আলী এবং শওকৎ আলীকে (এঁরা সহোদর দুই ভাই) ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নিজের ভাইয়ের মত বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন, মিঃ মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। এই মিঃ মোহম্মদ আলী ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আজমীঢ়ে এবং আলীগড়ে বলেছিলেন— 'গান্ধীজির চরিত্র যত পবিত্র হোক না কেন, তিনি আমাদের কাছে একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চেয়েও নিকৃষ্ট'। এবং এক বছর পরে লখনৌ-এর এক জনসভায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি একথা বলেছিলেন কিনা। উত্তরে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন— আমার ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী একজন লম্পট ও জঘন্য চরিত্রের মুসলমানও আমার কাছে গান্ধীজির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (দেবজ্যোতি রায় এ ঘটনাটি নিয়েছেন বাবাসাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ইংরাজী রচনাবলীর ৮ম খণ্ডের ৩০২ নং পৃষ্ঠা থেকে।)

যাহোক, কোরআনের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের একমাত্র কর্তব্য, দল বেঁধে জেহাদ করা ('কোরআনে দ্বি-জাতি তত্ত্ব' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষেপে 'ধর্ম' ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা উপরে আলোচনা করেছি। তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ধর্ম দল পাকানোর জন্য নয়। বিশ্ব মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব

বোধ সৃষ্টি দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সাধন করাই তার মর্মবাণী। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কোরআন ও রসুলের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল যুগে ও সকল দেশে মানুষকে অনবরত বিভেদ ও দ্বন্দ্বের পথে যেতে প্ররোচিত করেছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়। ফলে 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ ও অশান্তি অনিবার্যরূপে স্থায়ী হয়েছে। বিখ্যাত ইসলাম ধর্মশাস্ত্রবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক আনোয়ার শেখ তাঁর 'ইসলাম আরবদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন— "ইসলামের মানব প্রেম আরো বড় ছলনা। অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ইসলামের অস্তিত্বের মর্মকেন্দ্র। ইসলাম তার বিরোধীদের জন্য নরকবাসের বিধান দেয় এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ক্রমাগত অসন্তোষ ও বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম কার্ল মার্কসের সামাজিক সংঘর্ষের মতবাদের চেয়েও মারাত্মক।"

ইসলামের ইতিহাসেই প্রমাণ আছে মহম্মদ নিজেই বহু যুদ্ধে নরহত্যায় লিপ্ত হয়েছিলেন। যদিও মানুষকে বিভ্রান্ত করতে 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ অনেকেই 'শান্তি' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু আসলে তা নয়। ওটির প্রকৃত অর্থ আত্মসমর্পণ (আল্লাহ্‌র নিকট)। সে যাহোক, রসুলের সময় হতে এ যাবৎ ইসলাম শান্তির নামে অশান্তির আগুনই জ্বেলেছে। এর প্রমাণ হচ্ছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের 'চার শ্রেষ্ঠ খলিফা' বলে কথিত চার জন শাসকদের মধ্যে তিনজনকেই হত্যা করা হয়। অবিশ্বাসীরা নয়, বিশ্বাসীরাই ঐ কাজ করে। এবং মহম্মদের মৃত্যুর উনত্রিশ বছরের মধ্যেই এসব হত্যাকাণ্ড ঘটে। কারবালার মরুপ্রান্তরে যুদ্ধের নামে মহম্মদের স্নেহের দৌহিত্র, আলীর পুত্র সরল ভালমানুষ ইমাম হোসেন ও তাঁর শিশুপুত্রকে যে হত্যা করা হয়, তা তো করা হয়েছিল মহম্মদের ঘনিষ্ঠ সাহাবা (সহচর) মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের ব্যবস্থা মতই। পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মত হৃদয়বিদারক ঘটনার তুলনা মেলা ভার। এ কাহিনী আজও ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের চোখে জল আনে।

তারপরও কোরআনের নির্দেশমত ইসলাম প্রচারের জন্যই শত শত যুদ্ধে মুসলমান সমর নায়কগণ ও তাদের উৎসাহদাতা কট্টর ইসলামপন্থী মোল্লারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও ধর্মান্তরিত করেছে, নারীধর্ষণ সহ পররাজ্য লুন্ঠন ও গ্রাস করেছে। আজ পর্যন্ত ইসলামের ও মুসলিম দেশগুলির যে ইতিহাস তার প্রায় সবটাই তাদের লোভ ও ক্ষমতা দখলের কাহিনী।

আর কোরআন যতই বিশ্বাসীদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দ্বারা দলীয় ঐক্য দৃঢ় করতে চেয়েছে ততই এই ভোগবাদী ধর্মে উদ্বুদ্ধ মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেরাও শিয়া, সুন্নী, খারেজী, মুতাজিলা, আহ্‌লে হাদিস, কাদিয়ানী, হাম্বলী, শাফেয়ী, মালেকী, হানাফী, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, নকশ্‌ বন্দীয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি দল, উপদল, মজহাব ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যেই রক্তপাত ঘটিয়ে

আসছে। উমাইয়া বংশের খলিফা আবদুল মালেক (৬৮৫ খ্রীঃ)-এর সেনাপতি হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ইরাকে উমাইয়া শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের শিরশ্ছেদ ঘটিয়েছিল। এমন কি পবিত্র কাবা গৃহে অগ্নি সংযোগ করতেও তার দ্বিধা হয়নি, যার ফলে মুসলমানদের পবিত্র কালো প্রস্তরখণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হয়ে ফেটে পড়েছিল (দেখুন : অধ্যাপক মোঃ হোসেন আলী কৃত 'হ্যাণ্ড বুক অব ইসলামের ইতিহাস", পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃঃ ১১৫, ১৬৬, ১৬৭)। এমন হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ২/৩/২০০৪ তারিখে সুন্নী মুসলমানদের দ্বারা ইরাকে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর বোমা হামলায় শতাধিক মুসলমানের মৃত্যু। এই হল শান্তির ধর্ম ইসলাম, যা হযরত মহম্মদ থেকে শুরু হয়েছিল। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, নিজেদের মধ্যে যত হানাহানিই থাক 'অবিশ্বাসী'দের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তখন তাঁরা একযোগে কাজ করেন।

২৯॥ কোরআনে অনৈতিকতা ও সুবিধাবাদ

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল— তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (৩৩নং সূরার ৫৯নং আয়াত এটি)। এই ৩৩ নং সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ বলে কোরআনে উল্লেখিত। এই ইঙ্গিতটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, বুদ্ধিমান পাঠক আশাকরি তা বুঝবেন। যাহোক, উদ্ধৃত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে, স্পষ্ট দু'টি সত্য পাওয়া যায়। এক— বিশ্বাসী ব্যতীত অন্য রমণীগণকে উত্যক্ত করলে আল্লাহ্র আপত্তি নাই; কিন্তু নবীর স্ত্রী, কন্যা ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে উত্যক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য।

দুই— উত্যক্তকারী হামলাকারীরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদলের লোক। তা না হলে বিশ্বাসী রমণীদের তারা ছাড়বে কেন? সুতরাং বিশ্বাসী রমণীদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যই হল উত্যক্তকারীদের বুঝতে সাহায্য করা যে বিশ্বাসী রমণী কারা, যাতে ভুল করে তাদের উপর হামলা না করা হয়।

উল্লিখিত দুটি সত্যই যে অনৈতিক ও দুরভিসন্ধিমূলক, তাতে সন্দেহ নেই। এরূপ দলীয় সংকীর্ণ ও অনৈতিক কথা মহান আল্লাহ্র পবিত্র বাণী বলে প্রচারিত কোরআনে প্রচুর। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পবিত্র বাণীই বটে! কিন্তু আয়াতটির শেষাংশ আল্লাহ্কে কেন ক্ষমাশীল ও দয়াময় বলা হল তা বোঝা যায় কি? এবং কথাটি কে বললেন?

"... হজ্বের সময় স্ত্রী-গমন, অন্যায় আচরণ ও কলহ্ - বিবাদ বিধেয় নয়। ..." (২: ১৯৭; মদনী সূরা)

আপাত দৃষ্টিতে এই আয়াতটির বক্তব্য ভাল বলেই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? হজ্বের সময় স্ত্রী-গমন বিধেয় নয়। ভাল কথা। বিষয়টি সংযমে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে ধরলে প্রশংসার বলা যেতে পারে। কিন্তু কেবল **হজ্বের সময় অন্যায় আচরণ ও কলহ্-বিবাদ বিধেয় নয়** বলতে কি একথাই বোঝাচ্ছে না যে, অন্য সময় কলহ্-বিবাদ কিংবা অন্যায় আচরণ করলে দোষ নেই? এরূপ কথাকে কি নৈতিকতা বলা যায়?

"... দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর সংগত নয়; ..." (৮: ৬৭; মদনী সূরা) এই আয়াতটিতে স্পষ্টতই বন্দী হত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। এমন নিষ্ঠুর ও অনৈতিক নির্দেশ পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট হতে পেয়েই দয়াল নবী কুরাইযা বন্দীদের কি হত্যা করিয়েছিলেন? নাকি তার নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী উক্ত আয়াতটির প্রয়োজন হয়েছিল? উল্লেখ্য খন্দকের যুদ্ধের পর আট শত 'বানু কুরাইযা' গোত্রের ইহুদীর গলা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানুষ নবী মহম্মদের প্রত্যক্ষ তদারকীতেই ঐ খুনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছিল। এ তথ্যের উল্লেখ আছে স্যার উইলিয়াম মুর-এর 'দি লাইফ অব মাহমেট' শীর্ষক গ্রন্থের ৩১৬-৩২২ পৃষ্ঠায়।

"... যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর, তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ ভাবে বাতিল করবে; ..." (৮: ৫৮; মদনী সূরা) এ আয়াতটিতে কোন সম্প্রদায় বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে— " যদি তুমি বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর"। কোন বিষয়ে আমাদের আশঙ্কা সবসময়ই যে সত্য হয় তা তো নয়। আশঙ্কা একটা ধারণা বা অনুমানের ব্যাপার মাত্র। বিশ্বাসভঙ্গ করা একটি ঘটে যাওয়া বাস্তবতা। এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অতএব, কেবল আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে পূর্বেই চুক্তি ভঙ্গ করা নৈতিকতা হতে পারে না। বস্তুতঃ মহম্মদ সুযোগ বুঝে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এবং তাকেই বৈধতা দানের জন্য ঐ অনৈতিক আয়াতের প্রয়োজন হয়েছিল। আশঙ্কা করার কথাটা একটি সুবিধাবাদি অজুহাত মাত্র। বিষয়টি রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক হলে এ প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোরআনকে শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, আল্লাহ্র বাণী বলেও দাবী করা হয়। তাতে এই অনৈতিক নির্দেশ থাকা কি ঠিক?

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। ... এবং নিজেদের হত্যা করোনা, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।" (৪:২৯; মদনী সূরা) অপরের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে গ্রাস করা মহা অপরাধ। সুতরাং, তা না করার নির্দেশ অবশ্যই নীতিসম্মত। কিন্তু উপরের আয়াতটিতে বিশ্বাসীরা যেন কেবল অপর

বিশ্বাসীদের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে গ্রাস না করে সে বিষয়েই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোঝা যায় অবিশ্বাসীদের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে গ্রাস করলে আপত্তির কিছু নাই। হত্যার মত জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রেও এই আয়াত কেবল বিশ্বাসীদের হত্যা না করার হুকুম জারি করেছে। অন্যায় ভাবে সম্পত্তি গ্রাস অথবা হত্যা আপন পর নির্বিশেষে উভয় ক্ষেত্রেই অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু আয়াতটিতে যে ভাবে বলা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অবিশ্বাসীদের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে গ্রাস করা বা তাদের হত্যা করা কোন অপরাধ নয়, নিষিদ্ধও করা হয়নি। এরূপ নীচ ও সংকীর্ণ দলীয় চেতনা কোন মতেই নীতি বা ধর্মসম্মত হতে পারে না।

হাদিস যদিও আল্লাহ্‌র রাণী নয়; কিন্তু কিছুতেই কোরআন বিরুদ্ধ নয়। রসুল তাঁর জীবিত কালে বাস্তব সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন এবং 'মৌন' থেকে যে সমাধান মেনে নিয়েছেন তার নাম হাদিস। সুতরাং হাদিসের নীতি কোরআনের পরিপূরক এবং সমভাবে পালনীয় বলে ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞরা রায় দিয়েছেন। সেই হাদিসে যদি অনৈতিকতা থাকে তবে সেটা কি ইসলামের অনৈতিকতা বলে গণ্য হবে না ? ইসলাম জগতে এবং তার বাইরের সুধী মহলে বিশ্বস্ততম হাদিস বলে স্বীকৃত 'বোখারী শরীফের' চতুর্থ খণ্ডের ৪৪৫ নং বিধানটি এরূপ ঃ 'আবুজর (ABU DHAR) বর্ণনা করেছেন ঃ রসুল (দঃ) বলেছেন, "জিব্রাইল আমাকে বলেছেন, 'তোমার অনুসারীদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা না করে মৃত্যু বরণ করে তারা নিশ্চিত ভাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, দোজখে যাবে না।" রসুল প্রশ্ন করলেন, 'যদি সে ব্যক্তি অবৈধ যৌন-সংসর্গ অথবা চুরি করে?' তিনি (ফেরেশ্‌তা) উত্তর করলেন, 'তবুও সে বেহেশ্‌তে যাবে'।" (উদ্ধৃতিটি পূর্বোক্ত দেবজ্যোতি রায়ের 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল', ১ম সংস্করণ, বই-এর ১৩৬ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে আছে। বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের।) এই যে হাদিসে উক্ত অপবিত্র ও অনৈতিক প্রলোভন দেখান হল তা শুধুই ইসলাম গ্রহণের জন্য লোভনীয় কদর্য আমন্ত্রণের এক নগ্ন কৌশল মাত্র। কোরআনে অনৈতিকতা বিষয়টি যথেষ্ট পরিস্ফুট হয়েছে । তবু আর একটু বলি—

মুসলিম দুনিয়ায় জুমআ, ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার নামায শেষে 'খোৎবা' (ইসলামের বিজয় ঘোষণা বা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা) পাঠের নিয়ম আছে। এরই একটিতে ইসলামী নৈতিকতার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হল—" হে আল্লাহ্ ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদআতি ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্, যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন কিংবা খাকান পুত্র খাকান হউন, হে আল্লাহ্ । আপনি তাকে সর্বদিক দিয়া সাহায্যে করুন, ... হে আল্লাহ্ আপনি তার পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তারই তরবারী দ্বারা

বিদ্রোহী মহপাতকী অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ... হে আল্লাহ্, আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের, বেদাআতী ও কাফেরদের।" (দেখুন- কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত 'মুসলিম পঞ্জিকা', বঙ্গাব্দ-১৪০৭, পৃঃ ১৬০)

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট তাঁর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুসারীদের উপরোক্ত প্রার্থনায় মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কিছু আছে বলে কি মনে হয়?

৩০ ॥ কোরআনে বৈধ ও অবৈধ

কোরআনে বৈধ ও অবৈধ নিয়ে অনেক আয়াত আছে। আমরা এখানে খাদ্য, সুদ ও বিয়ে সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখব।

খাদ্য সম্পর্কে অবৈধ (হারাম) ঃ

"তিনি কেবল তোমাদের জন্য মৃত জীব রক্ত শূকর মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নাম নেওয়া হয়েছে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ (হারাম) করেছেন..." (২: ১৭৩; মদনী সূরা)

"আল্লাহ্ তো শুধু মড়া, রক্ত, শূকর মাংস, এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে, তাই তোমাদের জন্য অবৈধ (হারাম) করেছেন,... " (১৬:১১৫; মক্কী সূরা)

"তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত ও শূকর মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে জবেহ্ করা পশু, গলা টিপে মারা পশু, প্রহারে মরা জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, আর যে সব জন্তু জবেহ ব্যতীত মরে যায়; আর যা মূর্তি পূজার বেদির উপর বলি দেওয়া হয়,..."(৫:৩)

বোঝা যায় কোরআনে খাদ্য (মাংস) সম্পর্কিত অন্ততঃ এ তিনটি আয়াতের একটিও আল্লাহ্র জবানিতে নয়। লক্ষণীয় প্রথম দু'টি আয়াতে (২: ১৭৩; ১৬:১১৫) একই কথা। কিন্তু তৃতীয় আয়াতটিতে (৫: ৩) আরও বিস্তৃত করে বলা হলেও শূকর ব্যতীত আর কোন পশু বা পাখীর নাম করা হয়নি, কেবল পশুটিকে কীভাবে মারা হয়েছে তারই কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে - বক্তব্যগুলি সরাসরি আল্লাহ্র নয় কেন? একই কথা বার বার ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে বলার অর্থ কী? এবং তৃতীয় (৫: ৩) আয়াতটিতে বেশি যে কথাগুলো বলা হল তা যদি প্রয়োজনীয়ই ছিল তবে প্রথমেই তা বলা হল না কেন? এতে কি মনে হয়না যে, বক্তার অনবধানতা বশতই এমনটা হয়েছে? আর অবৈধ বলে যে বস্তুকে বলা হয়েছে তা সর্বাংশে বিজ্ঞান সম্মত বলা যায় কি?

সুদ সম্পর্কে অবৈধ :

" মানুষের ধনে তোমাদের ধন-বৃদ্ধি পাবে, এই উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক - আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। ..." (৩০:৩৯; মক্কী সূরা)

"... আল্লাহ্‌ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন, ..." (২: ২৭৫)

"আল্লাহ্‌ সুদকে ধ্বংস করেন ..." (২: ২৭৬; মদনী সূরা)

"হে বিশ্বাসীগণ! **তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করবে না**, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ..." (৩: ১৩০; মদনী সূরা)

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোও আল্লাহ্‌র মুখের কথা নয়। উদ্ধৃত চারটি আয়াতের প্রথমটি 'মক্কী সূরার' অন্তর্গত এবং ওতে সুদকে নিষিদ্ধ বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি। এমন কি সুদ মন্দ এ কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। নরম ভাষায় বলা হয়েছে - 'সুদ আল্লাহ্‌ দৃষ্টিতে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না'। মক্কী সূরার ভাষা আপোষের ভাষা, যেহেতু মহম্মদের ক্ষমতার ভিত্তি তখন দৃঢ় হয়নি।

সুদ সম্পর্কিত 'সূরা বাকারাহ্‌'র আয়াত দুটিতে স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় সুদকে অবৈধ বলা হয়েছে। অথচ, চতুর্থ আয়াতটিতে (৩:১৩০) সুদকে অবৈধ না বলে বিশ্বাসীগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ না নেয়। এই যে একই বিষয় বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রকার বলা তাতে কি অস্পষ্টতা ও জটিলতা সৃষ্টি দ্বারা বিশ্বাসীগণকে বিভ্রান্ত করা হয়নি? বিশ্বাসীগণ সুদ সম্পর্কে কোরআনের কোন্‌ উপদেশটি গ্রহণ করবে?

বিবাহ বিষয়ে অবৈধ :

"তোমাদের জন্য অবৈধ করা হল - তোমাদের ... ভ্রাতুষ্পুত্রী, ..." (৪:২৩)

আশ্চর্যের বিষয় কোরআন মারফত আল্লাহ্‌র দেওয়া উক্ত আদেশ তো রসুল নিজেই মানেননি। তার অন্তত একটি উদাহরণ - তিনি তাঁর কন্যা ফাতেমাকে আপন জেঠতুতো ভাই আলীর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

"... এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি, তোমার চাচাতো ভগ্নি ও ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নি যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে, ... ও **বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়**, ..." (৩৩: ৫০)

কোরআনে আল্লাহ্‌র দেওয়া উল্লিখিত নির্দেশটি রসুলের অনুগত বিশ্বাসীরা মানেন কি? আমরা তো প্রায়ই দেখি, এ নিষিদ্ধ কাজটি তারা হামেশাই নির্দ্বিধায় সিদ্ধ করেন। বোধ করি মুসলমান ভাইদের নিকট কোরআনের চেয়ে রসুল যা করতেন তা (আরবী ভাষায় 'সুন্নত') পালন করাটা বেশী পছন্দের। অদেখা আল্লাহ্‌র চেয়ে রসুল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব তো বটেই।

৩১॥ 'মেরাজ' এক অদ্ভূত ব্যাপার

ইসলামের ইতিহাসে এবং মহম্মদের জীবনে 'মেরাজ' একটি অলৌকিক বিষয়। বলা হয়ে থাকে, হযরত মহম্মদ নাকি একদিন গভীর রাতে কাবা শরীফে ঘুমিয়েছিলেন। জিব্রাইল ফেরেশ্‌তার আহ্বানে তাঁর ঘুম ভাঙলো। ফেরেশতা জানালেন - আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁকে বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ স্থানে যেতে হবে, এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। মহম্মদের এক প্রশ্নের জবাবে জিব্রাইল এ-ও জানালেন তাঁকে (মহম্মদকে) বহন করে নিয়ে যাবার জন্য 'বোরাক' নামক একটি বিশেষ ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী[১] তিনি সংগে করে এনেছেন। মহম্মদ ফেরেশ্‌তার উপদেশ ও ব্যবস্থামত বোরাকের পিঠে চড়লেন এবং মুহূর্তের মধ্যে কাবা শরিফ হতে ইসরাইলে অবস্থিত বিখ্যাত উপাসনালয় বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ওখানে তিনি নামাজ পড়ার পর আবার বোরাকে চড়ে যাত্রা করলেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। পর্যায়ক্রমে সাত আসমান অতিক্রমের সময় সেসব স্থানের বিভিন্ন পূর্বতন পয়গম্বরদের (আল্লাহ্‌র বাণী বাহক) সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা সেরে তিনি পৌঁছে গেলেন 'বায়তুল মামুর' নামক এক অতিপ্রাকৃত জগতে। সেখানে সর্ব শক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর অনেক বাতচিত হল। অবশেষে আবার বোরাকে আরোহণ করে ফেরার পথে পূর্বোক্ত পয়গম্বরদের সাথে বার্তা বিনিময় সেরে কয়েক মিনিটের মধ্যে 'বায়তুল মোকাদ্দাস' হয়ে কাবায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে আছে— "তিনি পবিত্রতম যিনি একদা রাতে তাঁর সেবককে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম (খানেয়ে কাবা) হতে মসজিদুল আক্‌সা (বায়তুল মোকাদ্দাস) পর্যন্ত যার সীমাকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করেছি, যেন আমি তাকে কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করি; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (১৭:১)

লক্ষণীয়, এই আয়াতটিতে 'তিনি', 'যিনি', 'তাঁর' ও 'আমি' সর্বনামগুলোর দ্বারা এমন গোলমাল পাকানো হয়েছে যে, সম্পূর্ণ বাক্যটির বক্তা কে তা বোঝা যায় না। যাহোক, উক্ত আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট করে কিছুই বোঝার উপায় নাই। তবে একথা স্পষ্ট যে, কাবা শরীফ থেকে রসুলকে একদা রাতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সম্ভবত আল্লাহ্ ভ্রমণ করিয়েছিলেন। এখানে কিন্তু বোরাক, সাত আসমানের বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে আলাপ ও অবশেষে সর্বোচ্চ আসমানে অবস্থিত 'বায়তুল মামুর'-এ গিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে দর্শন ইত্যাদির কোন কথাই নেই। তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদিস ও লেখকদের বর্ণনায় বহু জটিল ও বিতর্কিত কথা পাওয়া যায়। আমরা বাহুল্য ও পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতির ভয়ে সকল কথা আমদানি না করে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থ (মজহারুল ইসলাম প্রকাশিত

নতুন ভারতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৮৫) এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশিষ্ট যুক্তিবাদী লেখক বরিশালের আরজ আলী মাতুব্বরের লেখা 'সত্যের সন্ধান' নামক পুস্তক (বাংলাদেশ লেখক শিবির, যুক্তরাজ্য শাখা প্রকাশিত তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২ ঢাকায় মুদ্রিত) হতে কিছুটা উল্লেখ করব।

জনাব গোলাম মোস্তফা 'বিশ্ব-নবী' পুস্তকের ১০০ হতে ১০২ নং পৃষ্ঠার মেরাজের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন তা রূপকথাধর্মী, ভাবাবেগ পূর্ণ ও অনুপম কাব্যময়। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের জন্য তা প্রশ্নাতীত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা, যৌক্তিকতা ও বিজ্ঞানের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। নমুনা হিসেবে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। হাদিস 'মেশকাত শরীফ হতে তথ্য নিয়ে তিনি লিখেছেন— "রজনী দ্বিপ্রহর, ঘন অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ নির্জন চারিধার। সেদিন পাখি ডাকে নাই। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া আছে। হজরত কাবা গৃহের চত্বরে ঘুমাইয়া আছেন । এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে ঃ "মুহম্মদ"। হজরতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন ফিরিস্তা জিব্রাইল শিয়রে দণ্ডায়মান। অদূরে 'বোরাক' নামক একটি অদ্ভুত জ্যোর্তিময় বাহন অপেক্ষা করিতেছে। ডানা বিশিষ্ট অশ্বের মত তার রূপ, ক্ষিপ্র তাহার গতিবেগ। ..." এখানে একটা মন্তব্য করা প্রয়োজন। অনেক মুসলমানর ঘরেই 'বোরাক'-এর ছবি দেখা যায়। তার সাথে এর বর্ণনার মিল আছে; কিন্তু একটা বড় বেমিলও আছে। তা হচ্ছে বোরাকের মুখটা ছবিতে দেখা যায় এক সুন্দরী রমনীর, যা গোলাম মোস্তাফা উল্লেখ করেননি। কারণটা তার অনবধানতা না ইচ্ছাকৃত বোঝা যায় না। তবে ওতে না চড়তেই 'ক্ষিপ্র তাহার গতিবেগ' কি করে লেখক জানলেন তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি। আর একটা কথা, রাত্রির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে স্বাভাবিকতা থাকলেও সেদিন পাখি ডাকে নাই ইত্যাদির বর্ণনাটা বড়ই অস্বাভাবিক। তবে বলতেই হবে লেখক কবি বলে ভাষাটা কাব্যিক হয়েছে। যা হোক, উল্লিখিত বর্ণনার পর জিব্রাইল কর্তৃক মহম্মদের হৃদয় পরীক্ষা (Heart Examination) ও জেরুজালেমের ইহুদীদের উপাসনালয় হয়ে ক্রমান্বয়ে সাত আসমান পেরিয়ে 'সেদরাতুল মনতাহা' ও 'বায়তুল মামুর' (হিন্দুর বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের মত) পর্যন্ত যেতে পথে বিভিন্ন নবীদের সাথে বাক্যালাপ, সর্বশেষে খোদ আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা ইত্যাদি সবই আছে। অতঃপর ফেরার পথেও বহু কাণ্ডকারখানার বিবরণ দিয়ে গেলাম মোস্তফা লিখছেন— "মুহূর্ত মধ্যে হজরত পুনরায় কাবা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন জগৎ যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনিই চলিতেছে।"

কিন্তু এ ঘটনার সাক্ষী কে, অন্যেরা কেমন করে জানল? গোলাম মোস্তফা তাঁর বই-এর ৩০নং পরিচ্ছেদের প্রথমেই লিখছেন,— "যে রাত্রে মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার পরদিন প্রত্যুষে হজরত মসজিদে গিয়া তাহার সাহাবাদিগের নিকট এই

কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু যাহাদের ঈমান দুর্বল ছিল, তাহারা ইহা অসম্ভব ও অলীক বলিয়া মনে করিলেন। রসুলুল্লার সততা সম্বন্ধে অনেকের এইবার সন্দেহ জন্মিল, কয়েকজন সাহাবা আবু বক্করের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ আবু বক্কর, এইবার কী বলিতে চাও? মুহম্মদকে তো খুব বিশ্বাস করো। এখন তিনি যে বলিতেছেন যে, গতরাত্রে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়া গত রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, এও কি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? এও কি সম্ভব? আবু বক্কর বলিলেনঃ তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। হযরত এমন কথা বলিতে পারেন না।"

এখানে উপরোক্ত উদ্ধৃতি সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ মেরাজের এ কাহিনী বাস্তব কিনা তার সাক্ষী কেউ নেই। কেবল মহম্মদই কাহিনীটি সকলের নিকট বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ অদ্ভুত ও অলৌকিক বিবরণ সম্পর্কে সাহাবারা (যাদের নিকট তিনি বলেছিলেন) এর সত্যতা সম্পর্কে লেখকের বর্ণনানুযায়ীই দু'দলে বিভক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন, আবার কেউ কেউ অবিশ্বাসও করেছিলেন। যাঁরা অবিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের ঈমান দুর্বল বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। লেখক যাই বলুন, ঈমান দুর্বল বলেই নয়, যুক্তিসঙ্গত কারণেই এ গল্প বিশ্বাস করা যায় না। এবং তাঁরা করেনওনি। এমন কি আবু বকরের কথা হতেও বেশ বোঝা যায় তাঁর নিকটও এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। অবশ্য সাহাবাদের প্রশ্নের (গত রাতে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়া ... এও কি সত্যি বলিয়া মানিতে হইবে?) উত্তরে বলা যেতে পারে হেঁটে সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু বোরাকে চড়ে তা সম্ভব হয়েছিল। তবে বোরাকটাই যে অসম্ভব একটা জীব এবং পৃথিবীতে আছে বলে তাঁরা জানতেনইনা, এ কথার আর জবাব নেই।

অবশ্য 'মেরাজ' স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক (Spiritual) ব্যাপার হলে তার সাক্ষী থাকবার কথা নয়। এবং তা নিয়ে হয়ত মতভেদও থাকবার কথা ছিল না। কিন্তু গোল বেঁধেছে একে বাস্তব ও শারীরিক ঘটনা বলে দাবি করায়। কেননা ইসলাম জগতে অধিকাংশ লোক 'মেরাজ'কে বাস্তব বলে বর্ণনা করেন, বিশ্বাসও করেন। গোলাম মোস্তফা লিখেছেন— "অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ঃ হযরতের মেরাজ শরীরতঃ ঘটিয়াছে।" (বিশ্ব-নবী, পৃ-৩১৫) আবার তিনি লিখেছেন— "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হযরতের এই নভো ভ্রমণ শরীরতই ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সচেতন অবস্থাতে সশরীরেই আকাশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।" (ঐ, পৃ- ৩১৬) এখানে একটু মন্তব্য করা প্রয়োজন— ঐতিহাসিকরা কি অলৌকিক ও অপ্রামাণ্য বিষয়ের স্বীকৃতি দেন? এবং দিলেও কি তাকে সত্য বলে মানা যায়? সর্বোপরি মোস্তফা সাহেবের ঐ যে— "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস" কি কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে? যদিও তিনি তাঁর বইয়ে মেরাজকে বাস্তব ঘটনা বলে অনেক যুক্তি (তাঁর মতে) দেখাতে প্রাণপণ চেষ্টা

করেছেন। ৩২০ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন— "কাজেই মেরাজকে অধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলতে আমাদের আপত্তি নাই; তবে সেই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, হযরত যখন সশরীরে সজ্ঞানে সচেতন অবস্থাতেই এই মিরাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা প্রামাণ পাইতেছি এবং সশরীরে নভো ভ্রমণ অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, তখন খামাখা আমরা ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা টানিতে যাইব কেন? ..." ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে দেখা যায়, প্রথমে তিনি মেরাজকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলে স্বীকার করে একটু পরেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করে লিখেছেন যে, ওটা হজরতের সজ্ঞান, সচেতন অবস্থায় শারীরিক ভাবেই ঘটেছিল। আবার ৩২১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন — "মেরাজ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নহে।" কিন্তু মেরাজ বাস্তব ঘটনা বলে তিনি যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন ওগুলোকে মোটেই যৌক্তিক, বিজ্ঞান সম্মত ও প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যায় না। মেরাজ বাস্তব ঘটনা বলে কী কী প্রমাণ পেয়েছিলেন তিনি তা উল্লেখ করেননি। বিশ্ব-নবীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৪র্থ হতে ১০ম পরিচ্ছেদ অবধি মোজেজা অর্থাৎ অলৌকিক, আলোক ও বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান, মায় 'থিয়োসফী' পর্যন্ত আলোচনার কিছু আর তিনি বাকী রাখেননি। নিউটন, স্যার জেমস্ জীন্স প্রমুখ বহু বিশ্ব বিখ্যাত বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নানা রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে পাণ্ডিত্যের এক ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়েছেন। প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মেরাজ একটা সম্ভবপর বাস্তব ঘটনা, কিন্তু তিনি বোধকরি উৎসাহ, আবেগ ও অন্ধ বিশ্বাসের আতিশয্যে খেয়ালই করতে পারেননি যে, উক্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা তাঁর বিশ্বাসের আনুকূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বিপরীত হয়েছে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। 'বিশ্বনবী'-র নবম পরিচ্ছেদের শেষ দিকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে —

"Let us suppose that, a hollow Projectile holding a man such as Jule Varne and Wells used on their voyages to the moon, should be sent off into space with a velocity one twenty thousandth less than light. If at the end of a year the projectile should be caught like a comet by the gravitation of some star and be swung arround and sent back to earth, the man on stepping out of his shell, would be two years older, but he would find the world two hundred years older."-Essay lessons in Einstine by Edwin E.Slosson.

অর্থাৎ মনে করুন, একটা ফাঁপা চোঙ্গের ভিতরে একটি মানুষ পুরিয়া আলোকের বিশ সহস্রাংশের একভাগ গতিতে উর্ধ্বে ছুড়িয়া দেওয়া হইল। এক বৎসর চলিবার পর চোঙ্গটি যদি কোন তারকার আকর্ষণে পড়ে এবং ধূমকেতুর মত সে যদি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়া পুনরায় সে চোঙ্গটিকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেয়, তবে লোকটি চোঙ্গ হইতে নামিয়া দেখিতে পাইবে তাহার বয়স মাত্র দুই বৎসর বাড়িয়াছে। কিন্তু

ইত্যবসরে পৃথিবীর ২০০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।"

উপরে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ইংরেজী অংশ ও তার বাংলা অনুবাদ 'বিশ্ব-নবী' গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে তা আগেই বলেছি। এবার উদ্ধৃত অংশের তত্ত্বের সমর্থনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাবন্ধিক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত "আইনস্টাইনের আবিষ্কার" নামক রচনা থেকে (কোলকাতার 'সাপ্তাহিক দেশ', ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৫৫) উদ্ধৃত করছি—

"সময়ের দিক দিয়ে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত থেকে এমন সব মজার কথা এসে পড়ে যা শুনতে একেবারে রূপকথা বলে মনে হবে। মনে কর, একখানা এরোপ্লেনে চড়ে অনেক দিনের খাবার নিয়ে তুমি শূন্য পথে চলতে লাগলে, এরোপ্লেনের বেগ আলোর চেয়ে কম একটা নির্দ্দিষ্ট বেগ। তোমার সাথে ঘড়ি আছে। তোমার ঘড়ির পাঁচ বছর কাল অবধি সটান চলে গিয়ে বাড়িমুখো রওনা হলে, আর তোমার ঘড়ির হিসেবে দশ বছর পর পৃথিবীতে ফিরে এলে। যাবার সময় তোমার এই অভিযান নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়েছিল। তুমি ভেবেছিলে ফেরামাত্র তুমি বিপুল অভিনন্দন পাবে। কিন্তু একি! ফিরে দেখলে কেউ তোমাকে চেনে না, তুমিও কাউকে চেন না। লোকজনের রীতিনীতি, দেশের অবস্থা সব বদলে গিয়েছে। বহু কষ্টে বাড়ী ফিরে দরজায় যে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখলে, পরিচয় জানলে সে তোমার পৌত্র। পরে একটা ক্যালেণ্ডার দেখলে, সেটা ২০৫১ সাল। তোমার দশ বছর পৃথিবীতে একশ বছর চলে গিয়েছে।"

তাহলে ই. ই. স্লোসন ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখায় কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? উভয়ের লেখা হতে মহা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এ তত্ত্বটিই প্রকাশিত হয়েছে যে, মহাশূন্যের স্বল্প সময় পৃথিবীতে তার বহুগুণ বেশী সময়। অপর পক্ষে গোলাম মোস্তফা তাঁর বইয়ের প্রথম খণ্ডের ২৯ পরিচ্ছেদে 'মিরাজে' মহাশূন্যের বহু সময় ব্যাপী বহু ঘটনার বর্ণনার পর লিখলেন, "মুহূর্ত মধ্যে হযরত পুনরায় কাবা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন জগৎ যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনি চলিতেছে।" আবার দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি লিখলেন— " বিবরণে প্রকাশ হযরত যখন বোরাকে চড়িয়া ...অযুর পানি তেমনি গড়াইয়া যাইতে দেখিলেন।" এই দুটি বর্ণনায় কি বোঝাতে চেয়েছেন লেখক? নিশ্চয়ই এটা বোঝাতে চাইলেন যে, মহাশূন্যের এত ঘটনা ও সময় প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর সময়ের মানে মাত্র কয়েক মিনিট। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের তত্ত্বের বিরোধী কথা বলে গোলাম মোস্তফা হাস্যকর ভাবে বিজ্ঞানকেই সাক্ষী মেনেছেন। কথায় বলে— আমি বা গাই কী, শারিন্দায় বা বাজে কী। মোস্তফা সাহেবের ডেকে আনা সাক্ষী যে বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর এত পরিশ্রমে গড়া কেস 'ডিসমিস' করল তা তিনি বোধ করি ঠাহর করতেই পারলেন না। অথবা এমনও বলা যায় যে, তিনি মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন পাণ্ডিত্যের ঝকমকানি দিয়ে। তাঁর হয়ত মনে হয়েছিল গোলেমালে গোলেমালে

পীরিত করে যাবেন, আসল ব্যাপারটা কেউ ধরতেই পারবে না। হায় মোস্তফা সাহেব, আপনার অস্ত্র আপনাকেই হানল! আপনিই তা টের পেলেন না।

যাহোক, মেরাজকে স্বপ্ন বা কল্পনা বললে তা বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণই হত। কেননা স্বপ্নে অনেক সময়ব্যাপী বহু ঘটনা যখন আমরা দেখি তা বাস্তবে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, এ তত্ত্ব বিজ্ঞানের। এবং তা পৃথিবীর তাবৎ বিদ্বৎ সমাজ মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু 'বিশ্ব-নবী'-র লেখকের আগাগোড়া একটা চিন্তাই তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে যে, 'মেরাজ' বাস্তব ঘটনা এবং নবী মানুষ বেশে অতিমানুষ (Super Man)। আর তার এ অতিভক্তি সঞ্জাত অন্ধ বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করতে সমস্ত প্রকার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টার অঙ্গ হিসেবে এমন কি মহম্মদের দেহ যে জড় ধর্মী ছিল না, এমন প্রকৃতি বিরোধী উদ্ভট কথাটাও তার আলোচ্য বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদের ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি লিখেছেন, "বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থ হইতে জানা যায়—

১) হযরতের দেহের কোন ছায়া ছিল না।

২) হযরত সম্মুখে যেরূপ দেখিতেন পিছনেও সেরূপ দেখিতেন।

৩) আলোকেও যে রূপ দেখিতেন, অন্ধকারেও সেরূপ দেখিতেন।

৪) হযরতের দেহের কোন ভারত্ব (ওজন) ছিল না।"

লেখক বিশ্বস্ত হাদিসের বরাত দিয়ে অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব কথা লিখলেন; কিন্তু কোন্ হাদিস গ্রন্থের কোন্ স্থানে এসব অলৌকিক ও রূপকথাধর্মী কথা লেখা আছে তা উল্লেখ করেননি। হয়ত ভাবের আবেগে এতটাই বেসামাল হয়েছিলেন অথবা মুসলিম ভাইদের অন্ধ বিশ্বাসের উপর খুব নির্ভরশীল হয়ে এসব উল্লেখের প্রয়োজন মনে করেননি। তা না করুন। ধরে নেওয়া যাক, তিনি মিথ্যা কথা লেখেননি। হয়ত কোন হাদিস গ্রন্থে ওসব থাকতেও পারে। কিন্তু থাকলেও উক্ত তথ্যগুলি কি প্রাকৃতিক নিয়ম, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? মা আমেনা ও ধাত্রী মাতা হালিমা মহম্মদের শৈশবে নিশ্চয়ই তাঁকে কোলে করেছেন। কিন্তু কোথাও কি তাঁরা বিস্ময়ের সাথে একবারও একথা বলেছেন যে, ছেলেটির ওজন নেই কেন? ছায়া নেই কেন? সর্বোপরি কোরআনে কি উক্ত তথ্যগুলির সত্যতা স্বীকার করে কোন বাণী আছে? বরং আছে — "তুমি বল - আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ ...।" (১৮: ১১০) গোলাম মোস্তফা 'বিশ্ব-নবী'-র ৩২ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদিসের (কোন্ হাদিস তা এখানে উল্লেখ করেননি) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখছেন— "... তখন একজন ফিরিস্তা আমাকে (মহম্মদকে) ওজন করিবার জন্য অপরকে বলিলেন। ওজনে আমি দশ জনের চেয়েও ভারী প্রমাণিত হইলাম। তখন আমাকে ১০০ জনের বিরুদ্ধে ওজন করা হইল, এবারেও আমি সকলের চেয়েও ওজনে ভারী হইলাম। ..." এটাও তো আজগুবি গল্পই।

যাহোক, গোলাম মোস্তফা পরবর্তী হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আগের উদ্ধৃত হাদিসের বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধতা হচ্ছে একথা খেয়াল করতে পারেননি। অতি আবেগের ফলাফল এমনই হয় বটে।

যদিও কোরআনের বহু জায়গায় মহম্মদকে রসুল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর অতিপ্রাকৃত কোন বিশেষত্বের কথা বলা হয়নি। মনে হয়, পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীরা অতিভক্তি বশতঃ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসব কথা বানিয়ে প্রচার করছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনুরূপ উদাহরণের অভাব নেই।

ডঃ গনী তাঁর বাংলা অনুবাদের (কোরআন) ৫০৮ নং পৃষ্ঠায় কোরআনে মেরাজ সম্পর্কে উল্লেখ আছে বলে ১৭: ১, ৯৩; ৫৩: ১-১৮; ৭০: ৪ আয়াতগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। উক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে ১৭: ১ আয়াতটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করে আলোচনা করেছি। এখন পাঠকদের অবগতির জন্য পরবর্তী আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করছি— "অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে (দেহগত ভাবে) আরোহন করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহন আমরা কখনও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কেতাব অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব। বল— মহান পবিত্র আমার প্রতি পালক। এবং আমি তো একজন প্রেরিত মানব (দূত) ব্যতীত নই।" (১৭: ৯৩)

উদ্ধৃত আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতগুলো লক্ষ করলে বোঝা যায় মক্কার তদানীন্তন পৌত্তলিকরা মহম্মদকে কী বলে তাই আল্লাহ্ মহম্মদকে বলে তাঁকে উপদেশ করেছেন— " বল - মহান পবিত্র ... মানব ব্যতীত নই। " উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ আরও বলেছেন যে, পৌত্তলিকরা বলে, '...অথবা তুমি আকাশে (দেহগতভাবে) আরোহন করবে ...' ইত্যাদি। লক্ষণীয় তারা বলে, ... আকাশে আরোহন করবে ...। কিন্তু বলেনি, তুমি আরোহন করেছ। এখন আমাদের প্রশ্ন-পৌত্তলিকরা কী করে জানলো মহম্মদ ভবিষ্যতে আকাশে আরোহন করবেন? সুতরাং সন্দেহ জাগে, রসূল কি পূর্ব হতেই উক্ত আকাশ ভ্রমণের দাবি করে আসছিলেন।

আবার ডঃ গনীর অনুবাদ— "শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত বিপথগামীও নয়, এবং সে মনগড়া কথাও বলে না, কোরআন তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তা শিক্ষা দান করে শক্তিশালী (জিবরাইল)। সহজাত জিবরাইল, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, ঊর্ধ্ব দিগন্তে অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকল। অথবা তা অপেক্ষাও নিকটতর হলো। তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন, যা দেখেছে, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখছিল, প্রান্তবর্তী বদরি বৃক্ষের নিকট। যার নিকট বাস - উদ্যান অবস্থিত। যখন

বৃক্ষটি, যার দ্বারা শোভিত হবার, তার দ্বারা মণ্ডিত ছিল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষচ্যুত ও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেইছিল।" (৫৩: ১-১৮ ; মক্কী সূরা)

উপরে উদ্ধৃত অংশে প্রথমেই অস্তমিত নক্ষত্রের নামে শপথ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শপথ কেন, আর তা অস্তমিত নক্ষত্রের নামেইবা কেন এবং শপথকারীইবা কে? ধরে নেওয়া যাক, বক্তা আল্লাহ্। যদি তাই হয় তবে কি তিনি বিশ্বাসযোগ্য নন? বিশ্বাসযোগ্য হলে তাঁর শপথের দরকারটা কী? যাহোক, শপথের পরই মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য— "তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়" ইত্যাদি। বোধকরি এই সঙ্গীটি হচ্ছেন মহম্মদ এবং তাঁকে খুব 'সার্টিফাই' করা হল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তা হল মহম্মদকে বিশ্বাসযোগ্য করা, যাতে সকলে মনে করে তিনি (মহম্মদ) যা বলেন সব নির্ভেজাল খাঁটি কথা। কিন্তু এতে লাভটা কার? অবশ্যই মহম্মদের। এ কথাটা মনে রাখতে হবে।

এরপর এক স্থানে জিবরাইলকে 'সহজাত জিবরাইল' বলে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? 'সহজাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ - একসঙ্গে জাত। তাহলে জিবরাইল কার সাথে জন্মেছে? উল্লেখ নেই। যাহোক, আমরা প্রথমেই ধরে নিয়েছি, বক্তা আল্লাহ্। কিন্তু "তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন।" (৫৩: ১০) এ বাক্যটি কার? বোঝাই যায় বাক্যটি আল্লাহ্র নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় এটি জিবরাইলের উক্তি, কেননা জিবরাইল খুব নিকটবর্তী হয়েছিল তা কয়েকটি আয়াতে আছে। ৫৩ নং সূরাটির (সূরা নাজম) ১নং হতে ৯নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণী হলে হঠাৎ আবার জিবরাইলের বক্তব্য কেন? যাহোক, উদ্ধৃত আয়াতগুলি অনেকটাই পারম্পর্যহীন এবং মেরাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাও স্পষ্ট নয়। এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তী (১৯নং আয়াত হতে) আয়াতগুলোতে কাবার কয়েকটি দেবতার নাম করা হয়েছে এবং এমন সব বিষয়ের উল্লেখ আছে যার সাথে পূর্ববর্তী বিষয়ের কোন সঙ্গতি নেই।

গোলাম মোস্তফাও তাঁর 'বিশ্বনবীর' ১০৩ নং পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতগুলোর (৫৩:১-১৮) বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু দুজনের অনুবাদের বিষয়গত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বাহুল্য এড়াতে কিছু অংশমাত্র দিলাম—

"... এবং নিশ্চয়ই তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহাকে দূরতম সেদরাতুল মনতাহার নিকট দেখিয়াছিলেন। ..."

উল্লিখিত অংশটিই ডঃ গনীর অনুবাদে— "... নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখছিল প্রান্তবর্তী বদরি বৃক্ষের নিকট।"

লক্ষণীয় মোস্তফা সাহেবের 'তিনি' ও 'তাঁহাকে' ড ঃ গনীর অনুবাদে 'সে' ও

'তাকে' হয়েছে। নিশ্চয়ই উভয়ে একজনকেই বোঝাতে চাননি। তারপর গোলাম মোস্তাফার **'দূরতম সেদরাতুল মনতাহা'** ডঃ গনীর অনুবাদে হয়ে গেল— **'প্রান্তবর্তী বদরিবৃক্ষ'**। উভয়েই ইসলামে গভীর অনুরাগী তত্ত্ববিদ আরবী ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁদের এ পাণ্ডিত্য প্রকাশে আমরা কিন্তু বিভ্রান্ত। তবে উভয়ের অনুবাদে একথা পরিষ্কার যে, মেরাজ দুবার হয়েছিল, যদিও এ কথার স্বীকৃতি বা আলোচনা গোলাম মোস্তফার বইতে কোথাও দেখিনি। মেরাজ সম্পর্কে বাকী রইল ৭০নং সূরার (সূরা মায়ারেজ) ৪নং আয়াত। কিন্তু সেখানে মেরাজের নামগন্ধও নেই। ডঃ গনীর অনুবাদেই দেখুন— "এমন একদিনে (কিয়ামতের দিনে) ফেরেশ্‌তা এবং রূহ (জীবন) আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান"। (৭০:৪)

'মেরাজ' নিয়ে কোরআনের বক্তব্য ও গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' বইয়ের অংশ বিশেষ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যা বলেছিলাম সে কথামত আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর 'সত্যের সন্ধান' পুস্তকের ৮১-৮৩ নং পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তার কিছু অংশ পাঠকদের অবগতি ও বিচারের জন্য তুলে দিলাম—

"কথিত হয় যে, মেয়ারাজ গমনে হযরত (দঃ) এর বাহন ছিল প্রথম পর্বে 'বোরাক' ও দ্বিতীয় পর্বে 'রফরফ'। উহারা এরূপ দুটি বিশেষ জানোয়ার যাহার দ্বিতীয়টি জগতে নাই। 'বোরাক'— পশু, পাখী ও মানব; এই তিন জাতীয় প্রাণীর মিশ্র রূপের জানোয়ার। অর্থাৎ তার ঘোড়ার দেহ, পাখীর মত পাখা এবং রমণী সদৃশ মুখমণ্ডল। বোরাক কোন দেশ হইতে আসিয়াছিল, ভ্রমণান্তে কোথায় গেল, বর্তমানে কোথায় আছে, না মারা গিয়াছে, থাকিলে উহা দ্বারা এখন কি কাজ করান হয়; তার কোন হদিস নাই। বিশেষতঃ একমাত্র শবে মেয়ারাজ ছাড়া জগতে আর কোথাও ঐ নামটির অস্তিত্ব নাই। জানোয়ারটি কি বাস্তব না স্বাপ্নিক? ... হজরতের মেয়ারাজ গমন খুব বেশী দিনের কথা নয়, ... ঘটনাটি বাস্তব হইলে - যে সকল দৃশ্য তিনি মহাশূন্যে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন (আরশ ও বেহেশ্‌ত দোজখাদি) তাহা আজও সেখানে বর্তমান থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? থাকিলে আকাশ-বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়ে না কেন? ... হজরতের (দঃ) মেয়ারাজ গমন কি পার্থিব না আধ্যাত্মিক; অর্থাৎ দৈহিক না মানসিক? যদি বলা হয় যে, উহা দৈহিক, তবে প্রশ্ন আসে - উহা সম্ভব হইল কি রকম?

"... বিশ্বের দরবারে আমাদের পৃথিবীটা খুবই নগণ্য এবং সৌর জগতটাও নেহায়েত ছোট জায়গা। তথাপি এই সৌর জগতটার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে ১১ ঘন্টা। অনুরূপভাবে নক্ষত্র জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে প্রায় ৯৭৫ হাজার বৎসর.... এই

যে বিশাল স্থান ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরিচিত দৃশ্যমান পার্থিব বিশ্ব। এই বিশ্বের ভিতরে কোন বিজ্ঞানী বেহেশ্‌ত, দোজখ বা আরশের সন্ধান পাননি। হয়ত থাকিতে পারে ইহার বহির্ভাগে, অনন্ত দূরে। হজরতের (দঃ) মেয়ারাজ গমন যদি বাস্তব হয় অর্থাৎ তিনি যদি স্বশরীরে একটা বাস্তব জানোয়ারে আরোহন করিয়া সেই অনন্ত দূরে যাইয়া থাকেন, তবে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচ্য দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হইল কি রকম? বোরাকের গতি সেকেণ্ড কত মাইল ছিল? ... বায়ুহীন মহাশূন্যে বোরাক উড়িয়াছিল কি রকম?

"নানা বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, হজরত (দঃ)-এর মেয়ারাজ গমন (আকাশ ভ্রমণ) স্বশরীরে বা বাস্তবে সম্ভব নহে। তবে কি উহা আধ্যাত্মিক বা স্বপ্ন?"

"... তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন ..." (সূরা হাদীদ-৪)। মেয়ারাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি?"

গোলাম মোস্তফা মেরাজকে বাস্তব ও শারীরিক বলে বর্ণনা করেছেন। মাতুব্বর সাহেব সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। সুধী পাঠকগণ, আপনাদের কি মনে হয়?

মেরাজ সম্বন্ধে 'মোস্তাফা চরিত'-এর পৃষ্ঠা দুয়েকে (৪৩২-৪৩৪) ইসলামী তত্ত্ববিদ ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আকরম খাঁ এড়ানো গোছের সামান্যই আলোচনা করেছেন। তবে ভরসা দিয়েছেন, ভবিষ্যতে আল্লাহ্ শক্তি দিলে বিস্তৃত ভাবে বলার আশা রাখেন। বর্তমান আলোচনায় তিনি প্রধানতঃ ব্যক্ত করেছেন— 'মেরাজের দিন তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।' তবু তিনি দৃঢ়তার সাথে মেরাজের কাহিনীকে সত্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার উল্লেখ করেননি। এ-ও অন্ধ বিশ্বাসের ভাষা। তবে মেরাজ সম্পর্কে খ্রীষ্টান লেখকগণ যে বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্ক দিয়ে কাহিনীটিকে মিথ্যা কল্পনা বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তাতে স্পষ্টতই খাঁ সাহেব বিরক্ত হয়েছেন। এবং উল্টে তাঁদের (খ্রীষ্টান লেখকদের) ধর্মগ্রন্থের অলৌকিক ব্যাপারগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়— "এখানে খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগকে নিজেদের চোখের কড়িকাঠগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে বিনীত অনুরোধ জানাইয়া এই প্রসঙ্গে উপসংহার করিতেছি।" অর্থাৎ আকরম খাঁ সাহেবের ভাবখানা এই যে, 'মেরাজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করোনা, তোমাদেরও এমন অনেক কিছুই আছে। কাজেই নিজ দোষে চেপে যাও।' কৌশলটা মন্দ নয়।

এই পরিচ্ছেদের শুরুতে 'মেরাজ' বর্ণনায় যা বলা হয়েছে তা প্রধানতঃ কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের 'বিশ্বনবী' শীর্ষক গ্রন্থ ও ইসলামী সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস নির্ভর কথা। সেখানে নবীর বাহন হিসাবে একটি অসম্ভব প্রাণী বোরাক- এর উল্লেখ

দেখা যায়। আর আরজ আলী সাহেবের লেখায় পাওয়া গেল, রসুলের পুরো যাত্রা-পথে পর্যায়ক্রমে বাহন ছিল ' দুটি বিশেষ জানোয়ার'। তাদের নাম 'বোরাক' ও ' রফরফ '। একমাত্র বোরাকই হোক কিংবা সে সাথে রফরফও থাকুক ওগুলো যে 'অসম্ভব' বাহন তাতে সন্দেহ কী। এবার তার চেয়েও উঁচু মানের উদ্ভট বর্ণনা পাওয়া গেল মাওলানা মোবারক করীম জওহর কর্তৃক বাংলায় অনুদিত কোরআনে। তিনি তাঁর গ্রন্থের (বঙ্গানুবাদ, কোরআন শরীফ, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৪১১, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা) ৩৭৩ নং পৃষ্ঠায় টীকা নং ৮১ ক-এ লিখছেন যা, তার সংক্ষেপ হচ্ছে-নবী মহম্মদ উর্ধ্বজগৎ গমনের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে 'বায়তুল মোকাদ্দাস' পর্যন্ত যান বোরাকে চড়ে। সেখানে নামাজ পড়ার পর একটি বিশেষ সিঁড়ি আনা হয়। তিনি তার সাহায্যে পর্যায়ক্রমে সকল আকাশ পরিভ্রমন করেন। এবং সেখানকার বিভিন্ন নবীদের সাথে তার আলাপ হয়। তিনি স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, সিদরাতুল মনতাহা, দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের গদী বিশিষ্ট পাল্কী 'রফরফ' ইত্যাদি দেখার পর মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন। বিভিন্ন আকাশের বাসিন্দা রসুলগণ ও তার সাথে সেখানে এসে নামাজ পড়েন। অতঃপর নবী মহম্মদ সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বোরাকে আরোহণ করেই অন্ধকার থাকতে মক্কা পৌঁছে যান।

মাওলানা সাহেব রসুল কর্তৃক বোরাকের ব্যবহার দেখিয়েছেন বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণে, যা পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তৎপরবর্তী আসমানী যাত্রার সবটাই সম্পন্ন হয়েছে বিশেষ সিঁড়ির সাহায্যে। এতকাল জানতাম জাহান্নাম, জান্নাত, সিদরাতুল মনতাহা ইত্যাদি অকল্পনীয় দূরত্বের অপ্রাকৃত লোক। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বর্ণিত সিঁড়ি, বিভিন্ন আসমান ও ওখানকার রসুলগণ সহ বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে নামাজ পড়ার পর ঐ রাত্রেই মক্কায় ফিরে আসার কথা পড়ে মনে হচ্ছে ও সব একটু বেশী উঁচু হলেও মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং- এর মত ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু তাতে আর একটা বিশ্রী প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যে, তাই যদি হবে তবে সে সব দেখতে পাই না কেন? দেখার প্রশ্নটা উঠছে এ জন্যে যে, নবী নাকি দেহগতভাবেই সেখানে গিয়েছিলেন।

মাওলানা করীম জহওর যে সব তথ্যাদি দিয়েছেন তা কোন্ হাদিস থেকে পাওয়া তার উল্লেখ করেননি। প্রখ্যাত ইসলামতত্ত্ববিদ কবি গোলাম মোস্তফা, বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদী সত্যানুসন্ধানী আরজ আলী মাতুব্বর, আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত মাওলানা মো. ক. জওহর মেরাজ-এর মত একটা ইসলামী বিখ্যাত বিষয়ে তথ্য দিয়ে যে সব মতামত প্রকাশ করলেন তাতে আমাদের বিভ্রান্তি গেল না, বাড়লো। অতএব, বলতে পারি না কি যে, মেরাজ এক অদ্ভুত ব্যাপার?

মেরাজের মত একটি অদ্ভুত এবং অবাস্তব কাহিনীকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণের

অনেকেই গোলাম মোস্তফা ও আকরম খাঁর মত সত্য ঘটনা বলে শুধু স্বীকারই করেন না, উপরন্তু নানা যুক্তি দেখিয়ে তাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ যত্ন করেন। কিন্তু যুক্তিগুলো যে কু-যুক্তি, তাই এ সব ধোপে টেকে না।

যে-বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান আয়ত্ত করে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আজকাল অলৌকিকত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন না, সেই জ্ঞানের ধারে কাছেও না গিয়ে অধ্যাত্মবাদীরা সাক্ষী হিসেবে বিজ্ঞানীদের উক্ত মতামতকে হাতিয়ার রূপে এখন ব্যবহার করতে উদ্যত হচ্ছেন। অথচ বিজ্ঞানীদের আধুনিক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মতামতের বহু বহু আগেই ধর্ম প্রবক্তা অধ্যাত্মবাদীরা প্রকৃতি-রহস্যের প্রকৃত কারণ না জেনেই সাধারণ জ্ঞান ও অনুমানের সাথে জোড়াতালি দেওয়া বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়েই অলৌকিকত্বের ঐ সকল কাহিনী উদ্ভাবন করেছেন।

১। যার দেহটি ঘোড়ার মত, মুখখানি সুন্দরী রমণীর এবং পিঠে এক জোড়া বিশাল আকৃতির ডানা আছে।

৩২॥ কোরআনের বিশেষ তিনটি নীতি

হযরত মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন অথবা আদৌ জানতেন না— এ বিতর্কিত বিষয় নিয়ে 'মহম্মদ কি নিরক্ষর ছিলেন' পরিচ্ছেদে (১১নং) কিছুটা আলোচনা করেছি। বিতর্ক যাই থাকুক, অন্তত একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, যদি তিনি লেখাপড়া জানতেনও তবে তা সামান্যই ছিল। প্রচুর পড়াশুনার ফলে যে গভীর পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বীয় প্রজ্ঞা জন্মে তা তাঁর ছিল না। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অন্তত আরব দেশের লোক-চরিত্র বুঝবার ক্ষমতা, সেখানকার ইতিহাস ও ঐ সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের বিচারবুদ্ধি তাঁর অতুলনীয় ছিল। এর প্রমাণ তাঁর জীবন, কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে।

বিশ্বে অনন্ত ঘটনা প্রবাহ নিরন্তর ঘটে চলেছে। কাকতালীয়ভাবে আমাদের জীবনে উক্ত ঘটনাবলী অনুকূল বা প্রতিকূল হয়ে কখনও আমাদেরকে সফল করে; কখনও বা ব্যর্থ করে। এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের শারীরিক, মানসিক বা বুদ্ধির ক্ষমতা যতই থাক, ওসব তার সাফল্যের নিশ্চয়তা সকল ক্ষেত্রে দেয় না। পরিবেশ, সুযোগ ও সম্ভাবনা, ঘটনার যোগাযোগ মানুষের সাফল্যের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণভাবে কার্যকর। ঘটনার অনুকূলতা কিংবা জীবনের সফলতা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়।

আকস্মিক বা কাকতালীয় ঘটনা কিংবা ঘটনাবলীর অনুক্রমের এক বিরাট ভূমিকা

প্রতিটি মানুষের জীবনে সাধারণত থাকেই। একেই আমরা সব সময় ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বলে বর্ণনা করি। ঝড়ে বক মরে এবং অনেক সময়েই তা ফকিরের কেরামতিকে বাড়ায়। এতো আমাদের জানা কথাই। মহম্মদের সাফল্য তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তি ও অলৌকিকত্বের প্রমাণ নয়। পৃথিবীর ব্যর্থ মানুষের যেমন অভাব নেই, তেমনি তুলনায় কম হলেও সফল মানুষের সংখ্যাও নগণ্য নয়। মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতা দ্বারা তার সততা বা অসততা ও বুদ্ধিমত্তা কিংবা বুদ্ধিহীনতা সকল সময় প্রমাণিত হয় না। অনন্ত ঘটনা প্রবাহে সকল মানুষই ভেসে চলেছে। তার মধ্যে কেউ কেউ কীভাবে কখন সার্থক বা ব্যর্থ হবে তা আমরা জানি না। মহম্মদের সাফল্যকেও আবেগমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সেইভাবেই বিচার করতে হবে। তাতে অলৌকিকত্ব আরোপ না করে বুদ্ধিমত্তা ও সেসাথে সুযোগ যা কাকতালীয়ভাবেই এসেছে বলে গণ্য করা উচিত। পাঠক। বঙ্কিম চন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' পড়লেই ব্যাপারটি বুঝবেন।

বিভিন্ন উপলক্ষে মহম্মদ তাঁর জন্মভূমি মক্কা ছাড়া মদীনা ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে ভ্রমণ করে ওসব অঞ্চলের বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ঐ এলাকার তৎকালীন সমাজ, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দৈহিক ও মানসিক প্রবণতা ইত্যাদিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তিনি (ভাল-মন্দ যাইহোক) যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তারই ফল কোরআন ও ইসলাম। 'ধর্ম' ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে মানুষের শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশী অংশ প্রশ্নহীন আনুগত্যে বিশ্বাসী, এ বাস্তবতাকে তিনি বেশ বুঝেছিলেন। এবং আরও লক্ষ করেছিলেন, মানুষ একটা বিশ্বাসের আশ্রয় চায়। কারণ, আশ্রয়হীন হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। একটা আশ্বাস সে চায়, যা তাকে কর্মে প্রেরণা যোগাবে। এটা মানুষের সহজাত স্বভাব। পৃথিবীর সব জায়গার মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা না থাকলেও অন্ততঃ আরব উপদ্বীপের দুর্ধর্ষ মরুচারী মানুষদের প্রবল ভোগবাদী স্বভাব, তাদের সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি এবং তৎকালে সেখানে প্রচলিত ধর্মগুলোর রীতি-নীতি ও তাদের মহাপুরুষদের কার্যাবলী সম্পর্কে তিনি বিলক্ষণ জানতেন। সে কারণেই মানুষকে আকর্ষণ করার উপায় হিসেবে আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করে তিনটি নীতি কোরআনের মূল ভিত্তি স্বরূপ লক্ষ করা যায়। প্রথম নীতি— ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দৈহিক লাঞ্ছনার ভয় দেখানো। দ্বিতীয় নীতি— ইহলৌকিক সৌভাগ্য ও সম্পদ প্রাপ্তির আশ্বাস ও পরকালে দেহগত সুখ, যা প্রধানত সুখাদ্য ও নারীভোগের নিশ্চয়তাদানকারী লোভ প্রদর্শন এবং তৃতীয় নীতি— মুসলমানদের দলীয় জেহাদে অর্থাৎ অমুসলমানদেরকে অক্রমণ ও তাদের সম্পদ (মনে রাখতে হবে নারীরাও সম্পদ) লুন্ঠন, হত্যা ও ধর্মান্তরিতকরণে মুসলমানদের ('বিশ্বাসীদের) উৎসাহিত ও প্রবর্তিত করা।

৩৩ ॥ প্রসঙ্গ : 'সূরা ফীল' ও 'সূরা আল-কাফেরূন'

সূরা ফীল (১০৫ নং সূরা)—

"১। তুমি কি লক্ষ্য করনি তোমার প্রতিপালক হস্তীর মালিকদের সাথে কিরূপ করেছিলেন?

২। তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?

৩। তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষিকুল প্রেরণ করেছিলেন।

৪। যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরপুঞ্জ নিক্ষেপ করেছিল।

৫। অতঃপর তিনি ওদের ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দিয়েছিলেন।" (মক্কী সূরা)

এগুলো হল মূল আরবী আয়াতের ডঃ গনীকৃত বাংলা অনুবাদ। এর টীকায় তিনি তাঁর অনুবাদ বইয়ের ৪৭৫ নং পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ যেকোন শক্তিধরকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। প্রাক ইসলামিক যুগের সম্রাট আবরাহা (খ্রীষ্টান) বহু রাজ্য জয় করে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। লক্ষ্য— কাবা মন্দির। মক্কার নিকটে তাঁর পথে নবী মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোতালেব কিছু উট চরাচ্ছিলেন। আবরাহার সৈন্যরা উটগুলো দখল করলে তিনি সম্রাটের কাছে তা ফেরত পাওয়ার জন্য আর্জি জানালেন। এতে বিদ্রূপ করে আবরাহা বললেন, তিনি যখন মোতালেবের কাবাই দখল করতে যাচ্ছেন, তখন সামান্য কটা উট ফেরত নিয়ে আর কী হবে। উত্তরে মোতালেব বললেন, তিনি কাবার পরিচর্যাকারী মাত্র। এর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনিই কাবাকে দেখবেন। অতঃপর তিনি উটগুলো ফেরত পেলেন, ... ইত্যাদি। যথারীতি আবরাহা সৈন্য বাহিনী নিয়ে কাবা আক্রমণ করলেন। তখন নাকি দেখলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পাখী তাদের ঠোঁটে ছোট ছোট পাথর কণা এনে আবরাহার সৈন্যদের উপর ফেলছে। তাতেই আবরাহার হস্তী বাহিনী সহ সকল সৈন্য-সামন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

উল্লিখিত 'সূরা ফীল' ও ডঃ গনীর টীকা পাঠ করে স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন আসে। সেগুলো এরকম—

১। চড়ুইর মত ছোট আবাবিল পাখীদের ঠোঁটে বয়ে আনা ছোট ছোট পাথর কণা কি একটা হাতি বাহিনীসহ বিরাট সেনাদলকে বিধ্বস্ত করতে পারে?

২। এ পাখীগুলোর কোন সময়ই ঠোঁটে পাথর বহন করার স্বভাব নয়, তাহলে সেই যুদ্ধের দিন যে তা করেছিল তা কি বিশ্বাস্য?

৩। উক্ত যুদ্ধের আবাবিল পাখীর ঘটনা কোরআন ছাড়া কোন্ ইতিহাসে আছে?

৪। আবাবিল পাখী বাহিত পাথর কণাগুলো সেনাদলের মাথার উপর পড়ে নিম্নাঙ্গ ভেদ করে বের হয়েছিল কি বাস্তব সম্মত? (ডঃ গনী এরূপ দাবিই করেছেন।)

৫। আবদুল মোতালেব পৌত্তলিক ছিলেন, মুসলমান হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং সম্রাট আবরাহার প্রতি তার জবাব— "... কাবার প্রকৃত মালিক আল্লাহ্"— একথা (ডঃ গণীর টীকায় প্রদত্ত) কি তিনি বলতে পারেন, যখন কাবাতে ৩৬০টি বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি পূজা হত এবং তিনিই ছিলেন তার পরিচর্যাকারী?[১]

৬। আল্লাহ্র অস্তিত্ব মেনে নিলেও যে-কাবায় মূর্তিপূজা হত তার রক্ষা করার দায় আল্লাহ্ নিতে পারেন কি?

৭। অলৌকিকত্ব দাবি করা উক্ত কাহিনী সত্য হলে হাজ্জাজ-বিন ইউসুফ (উমাইয়া বংশীয় বিখ্যাত খলিফা আবদুল মালেকের সেনাপতি) যখন মক্কার বিদ্রোহ দমনের জন্য কাবার ঘরে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়েছিলেন (এটি ঐতিহাসিক ঘটনা) তখন আল্লাহ্ অনুরূপ কোন ঘটনা দ্বারা কি কাবাকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন? উল্লেখ্য মহম্মদ এর অনেক আগেই দেব-দেবীর মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে কাবাকে পুরোপুরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন আরও করা যায়। কিন্তু তার বোধ করি দরকার নেই। এখন উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর একটিই সন্দেহাতীত জবাব— 'না'। এবং এ জবাব দ্বারা 'সূরা ফীল'-এর অবাস্তবতা প্রমাণিত হল। অবশ্য অবাস্তবতা কোরআনে অন্যত্রও ভূরি ভূরি (১৭: ১, ৩৭: ১৪২-১৪৪; ২৯: ১৪ ইত্যাদি) আছে। আমরা এ বিষয়ে হিন্দুদের রামায়ণ ও মহাভারত নামক দুখানি গ্রন্থকে আলোচনায় আনবো। এই বই দুটিকে (মহাকাব্য) হিন্দুদের কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানলেও সকলে তা মানেন না। যদিও তাতে ধর্মনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে গভীর তত্ত্বপূর্ণ অনেক উপদেশ আছে। দুটি গ্রন্থই পৌরাণিক ও মহাকাব্য। এ বিষয়ে সকল বিদ্বৎ সমাজ একমত। উক্ত মহাকাব্য দুটিতেও অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু সে উদাহরণ দেখিয়ে কোরআন বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলোর সমর্থন বা বাস্তবতা স্বীকার করা যায় না। কেননা কোরআনকে আল্লাহ্র অভ্রান্ত বাণী বলে দাবি করা হয়। আর রামায়ণ, মহাভারত দুটিই মানবরচিত পুরাণ বা মহাকাব্য। অতএব, এদের সাথে কোরআনের তুলনা চলে না। এবং আল্লাহ্র বাণীতে রূপকথা জাতীয় অবাস্তব গল্প গ্রহণীয় হতে পারে না। আলোচ্য সূরাটির টীকায় একটি বিচিত্র ও মূল্যবান দাবি ডঃ গনী করেছেন, "আবাবিল পাখীর পাথর নিক্ষেপ অনুসরণ করেই আধুনিক যুগে বোমা ও উড়োজাহাজ আবিস্কৃত হয়।" সত্যিই তো কোরআনে সবকিছু আছে! গনী সাহেবরা কত নির্ভেজাল কল্পনা করতে পারেন!

এবার 'সূরা আল-কাফেরূন' নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। এবং সেজন্য সূরাটির প্রেক্ষাপট ('শানে নুজুল') জানা প্রয়োজন। মহম্মদ তখনও মক্কায় থেকেই ইসলাম প্রচার করছেন; কিন্তু খুব একটা সুবিধা হচ্ছিল না। তা করা থেকে মহম্মদকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে মক্কার প্রতিপত্তিশালী পৌত্তলিক কোরেশগণ নানাভাবে চেষ্টা করার

এক পর্যায়ে তাঁকে একটা আপোষমূলক প্রস্তাব দেয়, যাতে তিনি তাদের ধর্ম আংশিকভাবে মেনে নেন, পরিবর্তে কোরেশরাও তাঁর ধর্ম সাময়িক ভাবে মেনে নেবে। এই প্রস্তাবের জবাব তাৎক্ষণিক ভাবে না দিয়ে তিনি তাঁদের কাছে একদিন সময় নেন এই বলে যে, আল্লাহ্‌র বাণী পেয়ে তিনি তাদের কথার জবাব দেবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য সূরাটি তিনি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পেয়েছিলেন বলে নবী দাবি করেছেন।

সূরাটির বর্তমান ক্রমিক সংখ্যা ১০৯, আদি ক্রমিক সংখ্যা - ১৮, মক্কায় অবতীর্ণ। এটির বাক্য বা আয়াত সংখ্যা মোট ছ'টি। প্রথমটি— "বল হে অবিশ্বাসীগণ!" সূরাটির প্রেক্ষাপট ও এই আয়াতটি দেখে বোঝা যায়, স্বয়ং আল্লাহ্ মহম্মদকে নির্দেশ করেছেন অবিশ্বাসীদের বলার জন্য। কিন্তু কী বলবেন? সব কটি আয়াত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। কেবল পঞ্চম আয়াতটি প্রয়োজন বলে উদ্ধৃত করছি— "এবং তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর, আমি যাঁর উপাসনা করি।" অর্থাৎ ভবিষ্যতেও তারা (পৌত্তলিকরা) ইসলাম গ্রহণ করবে না তা বলা হল। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং এই কথা তিনি মহম্মদকে বলতে বলেছেন। কিন্তু এই কি তাঁর সর্বজ্ঞতার নমুনা? মক্কার কোরেশদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এই ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল? সেই কোরেশ বা পৌত্তলিকরাই কি পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে 'বিশ্বাসী' বা ইসলাম গ্রহণকারী হয়নি? ইতিহাস আল্লাহ্‌র উক্ত বাণীকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে।

১। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম ম্যুরের বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থের ['The Life of Mahomet'] ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রখ্যাত ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞ রামস্বরূপ 'আল্লাহ্' শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ভাবে— 'Among the Arabs and the Phoenicians el, eloah, elohim, lah were common for God.' ইত্যাদি। অর্থাৎ আরব ও ফিনিসিয়দের মধ্যে এল. এলোয়া, এলাহিম, লাহ্ শব্দগুলি ঈশ্বরের একটি সাধারণ নাম ছিল। এবং ঐ শব্দ গুলির মধ্যে 'লাহ্' শব্দটির সাথে আরবি 'আল' শব্দটি যুক্ত হয়ে আল্-লাহ্ বা আল্লাহ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এতে ধারণা করা যেতে পারে প্রাক ইসলামিক যুগেও 'আল্লাহ' শব্দটি ছিল।
হযরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশে আমরা দেখেছি বিবি খাদিজাও আবদুল মোতালেবের মত 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। যদিও তিনি তখন মুসলমান ছিলেন না। কাজেই তাঁদের উচ্চারিত আল্লাহ্ শব্দটি উপরোক্ত কারণেও হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'আল্লাহ' অর্থে অবশ্যই নয়।

৩৪॥ পৌত্তলিকতা সম্পর্কে কোরআন

'বুত পরস্তি' অর্থাৎ পুতুল বা প্রতিমা পূজা ও পূজারীদের বিরুদ্ধে কোরআন বহুবার নানাভাবে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করে যুদ্ধে বা জেহাদে উৎসাহ যুগিয়েছে। নমুনা

হিসেবে কয়েকটি মাত্র আয়াত উল্লেখ করছি—

"... পুতুল পূজারীরা অপবিত্র জীব।" (৯: ২৮)

"... একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় 'মুশরিক' (পুতুল পূজারী) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ..." (২: ২২১)

"... অতঃপর নিষিদ্ধ মাস সমূহ বিগত হলে, অংশীবাদীদের যেখানে পাবে, বধ করবে; তাদের বন্দী করবে, আবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, ..." (৯: ৫)

"... আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; ... " (২১: ৯৮)

"ওদের বলা হবে, স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য জাহান্নামে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।" (৪০: ৭৬) (অনুরূপ— ২:১০৪; ৪:১৫১; ১৭:৮ ইত্যাদি)

আরবী কোরআনে অমুসলমান বোঝাতে 'মুশরিক', 'কাফের', 'মোনাফেক' ইত্যাদি শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। ওগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে অংশীবাদী, অবিশ্বাসী, পুতুল পূজারী, সীমালঙঘনকারী, অত্যাচারী ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এবং তাদের অপবিত্র, ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত ঘোষণা করে কোরআন মুসলমানদেরকে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থেকে তাদের ধর্মান্তরিতকরণ বা ধ্বংস সাধন করার নির্দেশ বার বার দিয়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাক-ইসলামি ও ইসলামোত্তর যুগের কিছুকাল পর্যন্ত আরবের লোকেরা প্রধানতঃ ইহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নি উপাসক ও মক্কাকেন্দ্রিক প্রতিমা পূজক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই কোরআন ও মহম্মদ প্রথম দিকে মক্কা, মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল ও শেষের দিকে আরও ব্যাপকতর এলাকার জনগোষ্ঠীর ধর্ম সম্পর্কেই যা কিছু বলেছেন। কিন্তু মহম্মদের জন্ম ও কোরআন সৃষ্টির বহু পূর্ব হতেই মিশর, ইরান, গ্রীস, রোম, ভারত ও চীন ইত্যাদি দেশে উন্নত ও মহান সভ্যতার অধিকারী বিপুল সংখ্যক লোক বাস করতেন, যারা একাধিক দেব-দেবীর পূজা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ বা মহম্মদ অন্তত ভারত সম্পর্কে তা জানতেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোরআন ও হাদিস দেখে তা-ই মনে হয়। যেহেতু ওসব দেশ ও জাতির কোন উল্লেখ ওগুলোতে নেই। অতএব, কোরআন ও হাদিসে 'পুতুল পূজারী' বলে যাদের উল্লেখ আছে তারা যে আরব জনগোষ্ঠীর একাংশ তাতে সন্দেহ নেই। দেখা যায় তৎকালীন আরবে যে প্রতিমা-গুলোর পূজা করা হত তাদের নাম, চেহারা ও তত্ত্বের সাথে মিশর, গ্রীস, রোম ও ভারতের দেব-দেবীর প্রতিমূর্তির কোন মিল ছিল না। না থাকলেও একথা মানতেই হবে, যেখানেই মূর্তিপূজা সেখানেই মূর্তিগুলোকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির কল্পিত

প্রতীক হিসেবেই পূজা করা হত বা এখনও হয়। অর্থাৎ পূজাটা শক্তির, মূর্তির নয়। আরবেও তাই ছিল।

সৃষ্টিকর্তা, যাকে আমরা ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড, জিহোবা ইত্যাদি বলি, তিনি আছেন কি নেই, থাকলে তিনি সাকার বা নিরাকার— এসব তর্ক এখানে ওঠাবো না। প্রসঙ্গক্রমে আমরা সাকার পূজা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। একথা সত্য যে, বেদপরবর্তী ভারতীয় হিন্দুগণ অনেক ক্ষেত্রেই মূর্তিপূজা করতেন এবং এখনও করেন। এখানে সাকার উপাসনা বিষয়ে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীমদভাগবদ্‌গীতা' শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকে যে যুক্তিপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমরা তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেই—

''ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। উপনিষৎ এবং দর্শন শাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে পুরানেতিহাসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া আনেক স্থলে ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের এ স্থলে প্রয়োজন নাই। ... পুরানেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।''

'বিষ্ণু পুরাণে'র উদাহরণ উল্লেখ করে বঙ্কিম চন্দ্র লিখেছেন— ''কিন্তু তথাপি এই প্রহ্লাদ চরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাহার নাম ''অনন্ত'', তিনি 'সর্বব্যাপী'। যিনি অনন্ত এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না;''

হিন্দু ধর্মের সাকার উপাসনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— ''... অন্য দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চনা সাকারের উপাসনা নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। ...''

হিন্দুর কালী প্রতিমা পূজা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— ''তবে, সে মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাহার পূজা করিবে তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়া বলে, 'হে বিশ্বব্যাপিনি সর্বময়ী আদ্যাশক্তি। তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যেরূপ কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি তাহাতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্প চন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনস্থির করিতে পারি না।''

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের এই আকুতি কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলামের একটি গানেও চমৎকার ভাবে ফুটেছে— ''বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে শান্তি তো নাহি

পাই ... দেখিয়া আঁখি জুড়াই। ...” মানুষের এ আবেগ সম্ভবত ঈশ্বর ধারণার গোড়া হতেই। এ আবেগকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। মূর্তি পূজার কারণ এটাই। মূর্তিকে ভগবান বা ঈশ্বর বলা মূর্তি পূজার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নয়। মূর্তি প্রতীক মাত্র।

প্রাচীন কালে তো বটেই গ্রীস, রোম, ইরাক, আরব প্রভৃতি পৃথিবীর অনেক দেশে বহু দেববাদ ছিল। কিন্তু তাদের সকলের বহু দেববাদের অন্তরালে একেশ্বরবাদিতা ছিল কিনা বলা কঠিন, তবে ভারতে হিন্দু ধর্মের বহু দেববাদ সত্ত্বেও একেশ্বরবাদ ছিল ও আছে। মহম্মদের সময়েও তা ভারতে ছিল। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র বাণী বলে কথিত কোরআনে কিংবা আল্লাহ্‌র রসুল মহম্মদের হাদিসে তার উল্লেখ নেই। এটাও একটা ত্রুটিই।

সে যাহোক, সৃষ্টিকর্তার সাকার বা নিরাকার উপাসনা মানুষের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে দুটি মতবাদ। ভাল লাগা, না লাগা, চিন্তা ইত্যাদি দিয়েই এদের যে কোনটিকে গ্রহণের স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার হতে তাকে কোনমতেই বঞ্চিত করার কারো এখ্‌তিয়ার নেই। যদি গায়ের জোরে কেউ তা করে তবে সেটা মহা অপরাধ। আর ধর্মের নামে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বহু দেববাদ বা সাকার উপাসনাকে ধ্বংস করার নিরন্তর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সেই মহা আপরাধের কাজটি মহম্মদ নিজে করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু কোরআন-হাদিস মারফত প্রচার করেও গেছেন তার অনুসারীদের প্রতি। মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ একে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যক্ষভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করে এবং বুদ্ধিজীবীর ছদ্মাবরণে আর একটি অংশ তাকে নিন্দা করা দূরে থাক বরং প্রশংসা ও গৌরব বোধ করে। যেমন করেছেন কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর ‘বিশ্ব-নবী’-র ২৭০নং পৃষ্ঠায়। তাঁর ভাষায়—

“মহানবীর সমস্ত সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৌহিদকে জয়যুক্ত করা। এ সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে নয়, মক্কার বিরুদ্ধে নয়, ইহুদী খ্রীষ্টানদিগের বিরুদ্ধে নয় জগৎজোড়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।” এই যে গায়ের জোরে পুতুল পূজার বিরুদ্ধে লড়াই, যাকে আমরা মহা অপরাধ বলে পূর্বেই চিহ্নিত করেছি, তাকে নিয়ে গৌরব প্রকাশও অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। মনে হয় এসব বুদ্ধিজীবীরা ধরেই নিয়েছেন পৌত্তলিকতায় নিয়োজিত মানুষগুলির মঙ্গলের জন্য তাদের মুসলমান বানানোটা মহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পবিত্র কর্তব্য এবং তার জন্য গায়ের জোর অর্থাৎ ‘জেহাদ’টা একান্তই জরুরী। মানুষকে ঠেঙ্গিয়ে হলেও তাদের দলভুক্ত করতেই হবে।

ইসলামের ইতিহাস, কোরান ও হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নবী মহম্মদ পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। এবং যুদ্ধও করেছেন।

কাবা মন্দিরের দেবমূর্তিগুলো নিজের হাতেই ভেঙ্গেছেন। কিন্তু তিনি নিজের অজ্ঞাতে নিজেরই প্রচারিত সেই আল্লাহ্‌কে নিরাকার রাখতে পারেননি। এর প্রমাণ কোরআনেই আছে। আল্লাহ্ ডান বাম বলে উল্লেখ আছে সেখানে—"যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কি? কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা!" (৫৬ঃ ৯ এবং ১০) আল্লাহ্ নিরাকার হলে তাঁর কি ডান বাম থাকে?

কোরআনে আল্লাহ্‌র নিরাকারত্বের বিরুদ্ধে আর এক প্রমাণ 'মেরাজ'। বিষয়টি নিয়ে কোরআনে যা আছে তা খুব স্পষ্ট কিছু নয়। কিন্তু হাদিস ও ইসলামিক তত্ত্ববিদদের বিভিন্ন পুস্তকে যা দাবি করা হয়েছে তাতে দেখা যায় মহম্মদ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য সর্বোচ্চ আসমান 'সিদরাতুল মনতাহা' য় অবস্থিত 'বায়তুল মামুর'-এ আল্লাহর সম্মুখে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে তাঁর দর্শন লাভ ও আলাপ আলোচনা করেছিলেন। এ সব নিয়ে আগেই একটি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকুই প্রাসঙ্গিক যে, আল্লাহ্ অসীম হলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর সাক্ষাতের জন্য মহম্মদকে যেতে হয়েছিল কেন? সুতরাং 'মেরাজ' আল্লাহ্‌র নিরাকারত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কোরআনে আরও নজীর আছে আল্লাহ্‌র সীমিত হওয়ার। এবার হাদিসের অনেক উদাহরণ থেকে মাত্র দুটি উল্লেখ করছি। 'হরফ প্রকাশনী', কলকাতা-৭ থেকে জুন, ১৯৮৭-তে প্রকাশিত হাদিস শরীফের (দ্বিতীয় সংস্করণ, সংকলন সম্পাদনা : রফিক উল্লাহ এম, এ,) ২৮৪ নং পৃষ্ঠায় আছে— "৬৩০, ক্যায়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'লা নিম্নতম আকাশে অবতরণ করবেন, ..." মিশকাত। ৩০৫ নং পৃষ্ঠায় আছে— "৭১৬। আল্লা তা'লা আদমকে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপরেই সৃষ্টি করলেন— 'বুখারী'।

একটি প্রবাদ আছে—'সুন্নত' (মহম্মদের আচরিত কার্যাবলী) অনুসরণ করতে গিয়ে 'ফরজ' (ধর্মের দিক থেকে অবশ্য পালনীয়) বাতিল করে ফেলা। মহম্মদ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যত আক্রোশ ঘৃণা ইত্যাদিই প্রকাশ করে থাকুন তিনি নিজেই আল্লাহ্‌কে সীমায়িত করেছেন।

আমরা প্রতিমা পূজার অন্তর্নিহিত কারণের সামান্যই আলোচনা করেছি। অতএব পৌত্তলিকতা সকল ক্ষেত্রেই খারাপ কিনা তা বিতর্কিত। আর খারাপ হলেও এটা ঠিক যে, তা অন্যের ক্ষতি করে না কিংবা ক্ষতির চিন্তাও করে না। কিন্তু মানুষ মেরে পৌত্তলিকতা ছাড়ানোর ঠিকাদারী নেওয়া যে মহাপাপের কাজ, এ বোধটা অধিকাংশ মুসলমানদের হয় না। তার কারণ ঐ কোরআন, যেখানে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই মহাপাপকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে যদি মানবতাবোধ জাগ্রত ও প্রবল হয়ে অন্তত ঐ দুর্নীতিটা থেকে কোরআনকে মুক্ত করে, তবে পৃথিবী অনেক রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচে এবং শান্তি আসে।

প্রতিমা পূজার স্বপক্ষে বহু তত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও পণ্ডিতের শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী রচনার অভাব নাই। আমরা সেসব কথার উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য বিবেচনা করি। বঙ্কিম চন্দ্র এ বিষয়ে অনেক প্রণিধানযোগ্য যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন, তা হতে সংক্ষিপ্ত আকারে যা সংকলিত করেছি তাই সুধীজনের নিকট যথেষ্ট বলে বিবেচনা করি। প্রতিমা পূজা কিছুতেই পৌত্তলিকতা নয়। প্রতিমা আরাধ্য ঈশ্বরের প্রতীক মাত্র, যা ভক্তের ভক্তি নিবেদনের ও আরাধনায় সন্তোষজনক সহায়ক। প্রতিমা পূজা বা বহুদেববাদ মানুষের ন্যায়পরায়ণতা, সততা, বিবেক, আন্তরিকতা, দয়া প্রেম ইত্যাদি এক কথায় তার মনুষ্যত্বের পথে বিন্দুমাত্র অন্তরায় নয়। অপরপক্ষে, একেশ্বরবাদিতা বা আদৌ আস্তিকতা বা 'ধর্ম' সকল ক্ষেত্রে মানুষের উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের নিশ্চয়তা দেয় না। এক ঈশ্বরকেই যদি দলীয়-করণ, একদেশদর্শী-করণ, কল্পনায় দেহধারী বা সীমিত করণ করা হয় প্রকৃত পক্ষে তা-ই পৌত্তলিকতা। আবার বলছি, প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা নয়, যদি তা এসবের সমর্থন না করে।

৩৫॥ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনে কোরআনের ভ্রান্তি

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন নিয়ে কোরআনের 'সূরা নীসা' (সূরা নং ৪) এর ১১ নং ১২ নং ও ১৭৬ নং আয়াতে যা আছে তা এক কথায় বিভ্রান্তিকর। সুদীর্ঘ অথচ অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও দুর্বোধ্যতার কারণে আমরা ১১ ও ১২ নং আয়াত দুটি উদ্ধৃত করা বাহুল্য বিবেচনা করি। কৌতুহলী পাঠক কোরআন পড়লেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এখানে ১৭৬ নং আয়াতটি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"... যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার কোন বোন থাকে, তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধেক পাবে, এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে, তবে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভাই-বোন, পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে। তোমরা পথভ্রান্ত হবে এবং আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন। এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (৪:১৭৬)

এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সমাধান, যা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আছে, তা নিয়ে কিছু প্রশ্ন রাখছি—

১। আল্লাহ্ যেহেতু সর্বজ্ঞ সুতরাং তিনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন নিয়ে তিন জায়গায় (১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে) বিচ্ছিন্ন ভাবে বলতে গেলেন কেন?

২। ১৭৬ নং আয়াতে বলা হল— "... যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে, তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধেক পাবে,..."। আমাদের প্রশ্ন— বাকী অর্ধেক সম্পত্তির কী হবে তার উল্লেখ নেই কেন?

৩। উদ্ধৃত আয়াতটিতে বলা হল— যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে, তার ভাই তার উত্তরাধিকার হবে... অপর পক্ষে ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "... তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য। ... " প্রশ্ন জাগে - আল্লাহ্‌র এ দুটি নির্দেশের মধ্যে সমন্বয় কী ভাবে হবে?

৪। আবার বলা হল— "... কিন্তু যদি বোন থাকে তবে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ... "। প্রশ্ন - বাকী ১/৩ অংশের কী ব্যবস্থা হবে উল্লেখ নেই কেন?

৫। এর পরেই বলা হল— "... এবং যদি তার ভাই বোন, পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে।" প্রশ্ন - ভাই-বোন তো পুরুষ ও নারীই হয়, তাহলে 'ভাই বোন, পুরুষ ও নারীগণ থাকে' একথা বলার অর্থ কী? আর পুরুষ দুই নারীর সমান পাবে বলে পুরুষের পক্ষপাতিত্ব করা হল কেন? বরঞ্চ নারী অবলা বলে তারই বেশী পাওয়া উচিত ছিল না কি?

৬। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিনটি আয়াতে বলেও বন্টনের হিসাব সঠিক হল না কেন?

৭। সর্বোপরি আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের পথভ্রান্ত না হওয়ার জন্য ১৭৬ নং আয়াতের শেষাংশে যে 'পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছেন' বলে আশ্বাস দিলেন, তা কি সত্যই পরিষ্কার হয়েছে?

আরও অনেক প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নেই। তবে চিন্তাবিদ আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' বই থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানবো। তিনি বইটির ১৩৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ফরায়েজ নীতি'। ইহা পবিত্র কোরআনের বিধান। ... ফরায়েজ বিধানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ওয়ারিশগণের মধ্যে নির্ধারিত অংশ মোতাবেক বন্টন করিলে কেহ পায় এবং কেহ পায় না। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে এক স্ত্রী থাকে, তবে মা ১/৬, বাবা ১/৬, দুই মেয়ে ২/৩ এবং স্ত্রী ১/৮ অংশ পাইবে। কিন্তু ইহা দিলে স্ত্রী কিছুই পায় না। অথচ স্ত্রীকে দিতে গেলে সে পাইবে ১/৮ অংশ। এক্ষেত্রে মোট সম্পত্তি '১' এর স্থলে ওয়ারিশগণের অংশের সম্পত্তি হয় ১-এর পরে আরও ১/৮ অংশ। অর্থাৎ ষোল আনার স্থলে হয় ১৮ আনা, সমস্যাটি গুরুতর বটে। ...পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ফরায়েজ বিধানের সমস্যাটির সমাধান করিলেন হযরত আলী (রাঃ) তাঁর গাণিতিক

জ্ঞান দ্বারা। এবং মুসলিম জগতে আজও উহাই প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই মনে উদয় হয় যে, তবে কি আল্লাহ্ গণিতজ্ঞ নহেন? হইলে পবিত্র কোরআনের উক্ত বিধানটি ত্রুটীপূর্ণ কেন? ... পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ফরায়েজ বিধানের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি হজরত আলীর প্রবর্তিত 'আউল' (বিশৃঙ্খল) নীতির পর্যায়ে পড়ে এবং উহাতে কোরআন মানিয়া বন্টন চলে না, আবার 'আউল' মানিলে হইতে হয় দোজখী (নরকবাসী)। উপায় কি?"

আরজআলী মাতুব্বর বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি মুসলমান। তাঁর বইতে যে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিভাদীপ্ত বিচারের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা কোরআন ভিত্তিক 'ফরায়েজ' বা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে মাতুব্বর সাহেবের পর্যালোচনার কিছু অংশ মাত্র উদ্ধৃত করেছি। তাতে তিনি কোরআনে উক্ত বন্টন ব্যবস্থার ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রশ্ন রেখেছেন— " উপায় কি?" বস্তুতঃ তিনি প্রশ্ন করেননি, প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তরই দিয়েছেন— " উপায় নেই"। আমরাও কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন রেখেছি মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। এরই সঙ্গে ইসলামী তত্ত্ববিদদের কাছে আহবান জানাচ্ছি, তাঁরা প্রমাণ করুন 'সূরা নিসা'-র ১১ নং ১২ নং ও ১৭৬ নং আয়াতে প্রদত্ত হিসাব নির্ভুল ও সম্পূর্ণ।

এবার ইসলামী তথা কোরআন ভিত্তিক অর্থনীতির উপর একটু আলোকপাত করা যাক। যে অর্থনীতি যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ (গনিমতের মাল) অর্থাৎ লুণ্ঠন দ্বারা অর্জিত সম্পদ (নর-নারীও এর অন্তর্ভুক্ত) যাকাত, ফেতরার (সঞ্চিত বা উদ্বৃত্ত ধনের নির্দিষ্ট অংশ) উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল এবং কেবল মুসলমানদের জন্যই নির্ধারিত তা চৌদ্দশ' বছর আগেকার প্রায় নিরঙ্কুশ মুসলমানদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য যতই উপযোগী হোক, এ যুগের বহু ধর্মের জন-অধ্যুষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে কি খাপ খায়? মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যতই উদ্বাহু হয়ে ইসলামের গুণগান করুন, যতই 'প্রগ্রেসিভ' ও 'মানবিক বুলি' ঝাড়ুন সেগুলো মানুষের দৃষ্টিকে আসল সত্যের দিক হতে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যমূলক ফন্দি ছাড়া কিছু নয়। আসলে মুসলিম বুদ্ধিজীবী (শ্রদ্ধেয় দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম বাদে) ও মুসলিম কমরেডগণ সকলেই তাঁদের ধর্মীয় নিরপেক্ষতার যে মুখটি আমাদের দেখান তা যে মুখ নয়, সুন্দর 'মুখোশ মাত্র' এবং তার আড়ালে ইসলাম প্রচার ও পরধর্মের গ্লানি করাই উদ্দেশ্য সেটা বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই ধরতে পারেন। লক্ষণীয় এই সব ব্যক্তিবর্গ অনেক 'সেকুলার' ও প্রগতিশীল কথা বলেন, কিন্তু কোরআনের অনৈতিকতা বা হিংসা তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না।

৩৬॥ কোরআন ও বাইবেলের মধ্যে মিল

নবী মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশে আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রচলিত সংস্কৃতি ইত্যাদির অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন। একেবারে নতুন সব কিছু করেননি। এখানে আমরা বাইবেল (বিশেষতঃ নূতন নিয়ম) ও কোরআনের মধ্যে মিল আছে এমন কয়েকটি নমুনার উল্লেখ করব।

১। **বাইবেলে** একেশ্বরবাদিতা বিষয়ে মথিলিখিত সুসমাচার পর্বে ৪র্থ অধ্যায়ে যীশুর উপদেশ— "তোমরা ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণিপাত করিবে, কেবল তাহারই আরাধনা করিবে।" অনুরূপ ভাবে **কোরআন** বলছে— "আমরা শুধু তোমারই উপাসনা করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।" (১: ৪)

২। **বাইবেলে** রসুল বিষয়ে - মথিলিখিত সুসমাচার পর্বে ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "ইনি আমার একমাত্র পুত্র, ইহাতে আমার পরম সন্তোষ।" **কোরআনে** এই কথাই বলা হয়েছে একটু ঘুরিয়ে— "... বরং সে (মহম্মদ) আল্লাহ্‌র রসুল ..." (৩৩:৪০)

৩। **বাইবেলে** অবিশ্বাসীদের সাথে বিশ্বাসীরা যাতে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ না হয় সে বিষয়ে করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পত্রে বলা হয়েছে,—

"তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসঙ্গত মিলন সূত্রে আবদ্ধ হইও না।" **কোরআন** আরও পরিষ্কার করে বলেছে — "হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, ..." (৪: ১৪৪)

৪। **বাইবেলে** মদ্যপান পরিত্যাগ বিষয়ে ইফিসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র,— "মদ্যপানে মত্ত হইও না, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে;" (৫ম অনুচ্ছেদ) **কোরআনেও** নিম্নলিখিত আয়াত গুলিতে মদ্য পানের অপকারিতা সম্পর্কে ২:২১৯; ৪: ৪৩; ৫:৯০, ৯১ নং আয়াত সমূহে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

৫। **বাইবেলে** 'যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য' অধ্যায়ে ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "রসাতল হইতে যে পশু উঠিবে সে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে ..."। **কোরআন** বলছে— "... তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হতে নির্গত করব এক জীব ..." (২৭: ৮২)

৬। **বাইবেলে** যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য অধ্যায়ের ৯ম অনুচ্ছেদে এ কথা আছে— " সেইদিন লোকে মৃত্যু অন্বেষণ করিলেও তাহার উদ্দেশ পাইবে না..."। **কোরআনে** আছে— "সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে।" (৮৪: ১১)

৭। **বাইবেলে** 'ইব্রীয়দের প্রতি পত্র' অধ্যায়ের ১ ও ৮ অনুচ্ছেদে যথাক্রমে— "যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্বপ্রধান মধ্যস্থ" ও "যীশুর পৌরহিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী" এবং 'রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র' অধ্যায়ের ৮ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত, তাহাদের উপর এখন কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই।"

কোরআনে নবী মহম্মদ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে— "কেউ রসূলের অনুসরণ করলে সে তো আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করলো।" (৪: ৮০) কিংবা "... যে (রসুল) শক্তিশালী আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদা সম্পন্ন।" (৮১:২০)

৮। **বাইবেলে** অবিশ্বাসীদের বিষয়ে মথিলিখিত সুসমাচার অধ্যায়ে ১৩ নং অনুচ্ছেদে এ কথা আছে— "তোমরা শুনিতে থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই বুঝিবে না, দেখিতে থাকিবে কিন্তু কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিবে না। কারণ এই লোকদের অন্তঃকরণ অসার হইয়াছে, ..."

কোরআনে ঐ একই কথা বলা হয়েছে এই ভাষায়— "... আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা কোরআন বুঝতে না পারে, এবং ওদের বধির করেছি, তুমি ওদের সৎপথে আহ্বান করলেও ওরা কখনও সৎপথে আসবে না।" (১৮: ৫৭)

৯। **বাইবেলে** লুকলিখিত সুসমাচার অধ্যায়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের (ইয়াহিয়ার ?) জন্ম বিষয়ে ভবিষ্যদবাণী অনুচ্ছেদে সখরিয়া (জাকারিয়া) ইলীসাবেৎ ও মরিয়মের কাহিনী আছে।

কোরআনেও অনুরূপ কাহিনী 'সূরা ইমরান'-এর (৩নং সূরা) ৪র্থ ও ৫ম রুকুতে, 'সূরা মরিয়ম'-এর (১৯ নং সূরা) ১ম ও ২য় রুকুতে এবং 'সূরা আম্বিয়া'-র (২১ নং সূরা) ৬ষ্ঠ রুকুর শেষাংশে আছে।

১০। একই কথার বিরক্তিকর পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের টেক্‌নিক্‌টি কোরআনে এসেছে বাইবেল থেকেই। **বাইবেলে** মথিলিখিত সুসমাচার অধ্যায়ে— "হায় ধর্মগুরু ফরীসীরা, ভণ্ডেরা, তোমরা দুর্ভাগ্য..." এ বাক্যটি অন্তত আটবার আছে। **কোরআনেও** একই বাক্যের পুনরাবৃত্তির নজীর আছে অনেক। আমাদের এই বইয়ের ২৫নং পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ আছে।

১১। বিবাহ বা নারী সম্ভোগ বিষয়ে **বাইবেলে**—

"আপন মাতার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, ... তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা ... তাদের আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ... তোমার পৌত্রির কিম্বা দৌহিত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ... তোমার পিতৃস্বসার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, ... তোমার মাতৃস্বসার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, ... তোমার পুত্রবধূর আবরণীয় অনাবৃত করিও না।" (পুরাতন নিয়ম, লেবীয় পুস্তক ১৮: ৭-২০)

কোরআনে আছে —

"তোমাদের জন্য অবৈধ করা হল— তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু (পিতার

বোন), খালা (মাতার বোন), ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী ... এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ..."(৪:২৩)

১২। জেহাদ বা বিধর্মীদের ধ্বংস বিষয়ে বাইবেলে—

"... এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে, তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না, ... তাহাদের যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিবে, ... তাহাদের খোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে। .... যে পর্যন্ত তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিবে তাবৎ তোমার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। ....." —পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ (২ : ২-২৫)

অনুরূপ—দ্বিতীয় বিবরণ 'যুদ্ধ ব্যবস্থা' (২০: ১-২০)

কোরআনে—

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত অশান্তি দূরীভূত না হয়, এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়।..."(২:১৯৩)

" তোমাদের উপর যুদ্ধ (কাফেরদের বিরুদ্ধে) বিধিবদ্ধ হল, ..." (২: ২১৬)

অনুরূপ—৪: ৭৪, ৭৫; ৯: ৫, ২৯,৩৬, ৩৯, ৪১ ইত্যাদি।

১৩। খাদ্য অখাদ্য বিষয়ে বাইবেলে (দেখুন- পুরাতন নিয়ম লেবীয় পুস্তক অধ্যায়ের ১১: ১-৪)।

কোরআনে (দেখুন ২: ১৭৩ ; ৫:৩; ১৬: ১১৫)

১৪। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলে—

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, ..." (পুরাতন নিয়ম ঃ আদি পুস্তক- ২:৭)

কোরআনে—"...আমি তোমাদেরে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, ..." (২২:৫ অনুরূপ ১৫:২৬ ; ২৩:১২ ; ৪০:৬৭)

১৫। জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলে—

"এইরূপে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তু সমূহ সমাপ্ত হইল। পরে, ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, ..." (পুরাতন নিয়ম আদি পুস্তক অংশ ২: ১-২)

কোরআনে— "যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে, ... এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন... অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন, ... (৪১: ৯ -১২)

"তিনি আসমান জমিন এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। ... " (১৫:১৯; অনুরূপ ৫৭: ৪ ইত্যাদি)

১৬। অপর ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্রীস্টানদের জয়ী করার সদা প্রভুর

আশ্বাস বাইবেলে—

" তোমাদের পাঁচজন তাহাদের (বিধর্মীদের) একশত জনকে তাড়াইয়া দিবে, তোমাদের একশত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে।" (পুরাতন নিয়ম; লেবীয় পুস্তক- ২৬:৮)

কোরআনে আল্লাহ্‌র অনুরূপ আশ্বাস— "হে নবী, বিশ্বাসীগণকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে, এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী হবে, ..." (৮: ৬৫)

কোরআন যে অনেকাংশে বাইবেলের অনুকরণ তার আরও প্রমাণ আছে। কিন্তু আমরা উপরে যা উদ্ধৃত করেছি তা-ই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করি। অবশ্য একটা বিষয়ে কোরআন অনন্য। সে হচ্ছে— বেহেশ্‌তে মুসলমানদের জন্য অঢেল অপরূপা যৌবনবতী অনাঘ্রাতা হুরীদের (হিন্দুদের অপ্সরা-সম) সাথে যৌন সম্ভোগের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা। ভুললে চলবে না যে, কেবলমাত্র মুসলমানরাই বেহেশ্‌তে যাবে। বাইবেলের (পুরাতন ও নূতন নিয়ম) কোথাও এ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখিনি। এটি আল্লাহ্‌র নামে নবী মহম্মদের অপূর্ব সুচতুর বাস্তবানুগ উদ্ভাবন। গাধার নাকের ডগায় মুলো ঝুলিয়ে তাকে চালাবার উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে। এবং ব্যবস্থাটি যে মোক্ষম ও অব্যর্থ তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে শিশু, বৃদ্ধ, নারী নির্বিশেষে নিরীহ অপর ধর্মালম্বীদের হত্যা ও সর্বাত্মক ধ্বংসের জন্য মুসলিম মৌলবাদীদের নিশ্চিত আত্মঘাতী সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ।

১৯৯৩ সনে মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ইংরেজী রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় ডঃ আম্বেদকর বলেছেন—

"There is not anything new in the Gospel of Mohomed who is least original of the Prophet. His Koran is a compromise between Judaism & Christianity." অর্থাৎ মহম্মদের ধর্মমতে নূতন কিছু নাই। রসুলের মৌলিকত্ব তাতে সামান্যই। তাঁর কোরআন হচ্ছে ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের মিশ্রণ।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর ৯৯৪ নং পৃষ্ঠায় (ষষ্ঠ সংস্করণ) বলেছেন— " ... কুরাণ স্বতন্ত্র রচনা নহে। কারণ, কুরাণের কয়েকটি উপদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই বাইবেলে আছে।"

৩৭ ॥ আল্লাহ্, রসূল ও কোরআন নিয়ে আরও কিছু কথা

এ বিশ্বে সকল জড়, জীব ও শক্তি ইত্যাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের এবং বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের মধ্যে যে কৌশল ও নিয়ম রয়েছে তার মূল কারণ মানববুদ্ধির

অগম্য এবং বিস্ময়েরও বিস্ময়। স্বতঃ ক্রিয়াশীল এ নিয়ম ও কৌশল অনন্ত কাল ও স্থানের কখন কোথায় শুরু হয়েছিল নাকি অনাদি কালের মতই অনাদি তা এ যাবৎ জানা যায়নি। প্রকৃতি বা Nature বলতে আমরা যাকে বুঝি সে একটি নিয়মবশতঃই যেন সকল কর্ম করে যাচ্ছে— এটুকু ব্যক্ত এবং বোঝা যায়। যেমন, জল সূর্যতাপে বাষ্প হয়ে মেঘ হচ্ছে। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। যে-ই যে-ই বৃক্ষের বীজ, অনুকূল পরিস্থিতিতে তা থেকে সে-ই সে-ই বৃক্ষ হয়ে তদনুযায়ী ফল দিচ্ছে। নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে সেই প্রজাতির জীবের জন্ম হচ্ছে ইত্যাদি। অসংখ্য নিয়মে বোবা প্রকৃতি নিরন্তর কাজ করছে। কিন্তু তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিত্ব আছে বলে মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান সাক্ষ্য দেয় না। এবং ফলে আমরা তৃপ্তি বোধ করি না। আমরা বেশীরভাগ মানুষেরা দেখে শুনে একটা সাধারণ ধারণায় আসি যে, এ সমস্ত প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অকল্পনীয় শক্তি রয়েছে। এ ধারণার ফলে বিজ্ঞানের থেকে না-পাওয়া অনেক প্রশ্নের একটা জোড়াতালি দেওয়া সমাধান হয়ত পেয়ে থাকি।

মানব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানুষের (নিয়াণ্ডারথাল, জাভা, পিকিং-ম্যান ইত্যাদি) অবির্ভাব ঘটেছে এবং তাদের মধ্যে ক্রমে বৌদ্ধিক ও সামাজিক উন্নতির ফলে ধীরে ধীরে যাকে আমরা সভ্যতা বলি তার উন্মেষ হয়েছে। সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায় অনেক হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তি, যথা— ঝড়, ভূমিকম্প, প্লাবন ইত্যাদির ভয়ঙ্করতার নিকট নিজেদের অসহায়তা দেখে মানুষ তাদের ধারণা ও বুদ্ধি অনুযায়ী সেই সেই শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের নানা প্রকার ব্যবস্থা করল। বর্তমান ধর্মগুলোর গোড়াপত্তন এভাবেই হয়েছিল। পৃথিবীর কোন কোন এলাকায় যখনই হোক সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধীয় একটা মোটামুটি ধারণাও গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে তা পরিণতি লাভ করেছে। বিশ্বের ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা সমস্ত সৃষ্টির কর্তা বলে যে ধারণা পোষণ করেন সেটা যদি সত্য হয় তবে তিনি একজনই হবেন। কিন্তু স্থান, কাল, সমাজ ও ভাষার বিভিন্নতার কারণে সেই সৃষ্টিকর্তা আর 'একজন' থাকলেন না— ভগবান, জিহোবা, গড, আল্লাহ্ ইত্যাদি বহু নামে ও চরিত্রে বিভক্ত হয়ে গেলেন। না, তিনি নিজে বিভক্ত হলেন না। আমরাই তাকে বহু ভাগে ভাগ করলাম। এবং নিজেরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে বিভিন্ন দল গড়লাম। এমনই একটি দল তাদের পরিচয় মানুষ হিসাবে দেওয়ার চেয়ে 'বিশ্বাসী' হিসাবে পরিচয় দিতেই গর্ব বোধ করেন। এবং তাঁরা তাঁদের বর্ণিত সৃষ্টিকর্তাকে পরম করুণাময় বলে বর্ণনা করলেও দেখা যায় তিনি ভয়ঙ্কর চরিত্রের 'আল্লাহ্' যিনি নাকি বিশ্বের তাবৎ মানুষকে নিজের অনুগত 'দাস' বানাবার

দায়িত্ব দিয়ে একজন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁর নাম হযরত মহম্মদ বিন আবদুল্লাহ্। এই মহম্মদের দাবি, আল্লাহ্ বলেছেন— এই বিশ্ব ও মহা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর সৎ সেবকবৃন্দরাই এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে। (কোরআন-২১/১০৫) আল্লাহ্র অনুসারীদের নাম মুসলমান। এই মুসলমানরাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় বা মহত্তম জাতি। (কোরআন- ৩ /১১০) আমাদের মতো মানুষের দৃষ্টিতে এ সব বিধান হচ্ছে ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টির ধ্বংসাত্মক বিধান।

নবী মহম্মদ দাবি করেছেন, সমস্ত সৃষ্টির মালিক যিনি তাঁর নাম আল্লাহ্। তিনিই একমাত্র উপাস্য। নবী তাঁরই প্রেরিত পুরুষ; আরবী ভাষায় বলে 'রসূল'। আল্লাহ্র অনুসারীরাই হবে 'বিশ্বাসী'। সকল বিশ্বাসী মানুষের প্রধান কর্তব্য হবে বিশ্বের সকল মানুষকে 'বিশ্বাসী' অর্থাৎ মুসলমান বানানো। যতক্ষণ অন্য মতাবলম্বীরা 'বিশ্বাসী' অর্থাৎ মুসলমান না হবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে; হত্যা বা বন্দী করতে হবে। (কল্পিত) আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান হয়ে নবী আরও ঘোষণা করলেন— যারা 'বিশ্বাসী' তারাই সৎ, তারা পরস্পর ভাই। তারাই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যের মালিক। তারাই পরলোকে প্রচুর লোভনীয় খাদ্য, পরমা সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী ও মহার্ঘ পোষাকের অঢেল ব্যবস্থা সমন্বিত স্বর্গের (বেহেশ্তের) অধিবাসী হবে। এরই সঙ্গে নবী ঘোষণা করলেন, বিশ্বাসী ব্যতীত সকল মানুষ অসৎ ও তারা ইহজগতে লাঞ্ছনা পাবে এবং মৃত্যুর পর অকল্পনীয় যন্ত্রণার স্থল অগ্নিময় নরকে চিরদিনের অধিবাসী হবে। সুতরাং বলা যায়, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, জরথুস্ত্র, শংকরাচার্য, চৈতন্যদেব, আইনস্টাইন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা কেউ মুসলমান ছিলেন না বলেই কোরআন মতে এঁদের স্থান নরকে বা দোজখে। সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য নবী এ সব ঘোষণা করলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নামে।

মধ্যপ্রাচ্যের 'সেমিটিক' (ইহুদী, আরব ও সিরিয়া অঞ্চলের জাতি) একেশ্বরবাদ ও ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 'অদ্বৈতবাদ' এক কথা নয়। সেমিটিক একেশ্বরবাদিতা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে একাত্মতা ঘোষণা করে না। অপরপক্ষে অদ্বৈতবাদ তা করে। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সেমিটিক মানবগোষ্ঠীর এলাকা ভিত্তিক শাখাগুলোর একেশ্বরবাদী ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম (এই 'ধর্ম' শব্দটি ছাড়া সর্বজনগ্রাহ্য ও ব্যাপকার্থে কোন শব্দ নেই বলে এটিই ব্যবহার করছি, যদিও সর্বক্ষেত্রে শব্দটি একার্থবোধক নয়) মতের মধ্যে গৌণ বিষয়ে কিছু কিছু অমিল থাকলেও (থাকাই স্বাভাবিক) এগুলোর মূল বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ঐক্যের বিষয়গুলো প্রধানত এই—

(১) একমাত্র উপাস্যের দাবিদার চরম অসহিষ্ণু একজন সৃষ্টিকর্তার ঘোষণা ও তাঁর বাণী বলে প্রচারিত একটি মাত্র পুস্তক।

(২) বর্ণিত একমাত্র উপাস্য সেই সৃষ্টিকর্তার একজন মাত্র স্ব-ঘোষিত মানব প্রতিনিধি বা নবী বা রসুল, যিনিই উক্ত সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাকারী।

(৩) একমাত্র উপাস্য সৃষ্টিকর্তার ও তাঁর একমাত্র রসুলের প্রচারিত মতবাদের বাইরের সকল ধর্মমতের প্রতি ধ্বংসাত্মক মনোভাব পোষণ ও তা কার্যকরী করা।

সৃষ্টিকর্তা বিষয়ক উক্ত আঞ্চলিক মতবাদের বাইরে তাদের আগে ও পরে মিশর, গ্রীস, রোম, পারস্য, ভারত, চীন ইত্যাদি বহুদেশে যে ধর্মগুলো উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের সাথে ওগুলোর মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ঐ দেশ সমূহের ধর্মগুলোর সাথে মানবিকতা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলেই দলীয় সঙ্কীর্ণ চেতনার ঊর্ধ্বে সমগ্র মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃজনে বাধা হয়নি, বরং মিলনের পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সেমিটিক ধর্মগুলোর মধ্যে তা ছিল না বলেই তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের বন্ধু হবার উপায় ছিল না, এখনও নেই। এবং তাদের অনুসারীরা নিজেদের দলের বাইরের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর হিংসাত্মক মনোভাব দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অন্য ধর্মগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রতিনিয়ত আগ্রাসী ও যুদ্ধমান।

'ধর্ম' হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও ইসলাম কি প্রকৃতই একটি ধর্ম? প্রশ্নটা উঠেছে এজন্য যে, দেশ, কাল, জাতি ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানব মণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রীতি প্রেমের বন্ধন সৃষ্টির সহায়ক, যা ধর্মের মর্মবাণী, ইসলামে তা হয়নি। সৃষ্টি হতে পৃথক ও পরাক্রমশালী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, এককভাবে প্রশংসালিপ্সু একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌কে বর্ণনা ও পুঁজি করে নিজেকে তাঁরই একমাত্র অনুসরণীয় মানবকুলের শেষ নবী বলে দাবি করেছেন মহম্মদ। মানুষের সাথে সেই বর্ণিত সৃষ্টিকর্তার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই মহম্মদের সুপারিশ ছাড়া। এ-ও তাঁরই বর্ণিত এক যুক্তিহীন মানব ঐক্য বিরোধী মতবাদ। এবং প্রথমে মক্কা ও কিছু পরে মদীনা ভিত্তিক একটি দল সংগঠন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কোরআনেও তার প্রমাণ আছে ৪২: ৭; ৪৪: ৫৮ নং আয়াতগুলিতে। ঐ ধর্মীয় দল তার বাইরের মানুষদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থেকে হয় তাদের নিজেদের দলভুক্ত করবে, নয় তো ধ্বংস করবে, এই উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে ধর্ম নামের ইসলাম। সকল ধর্মের মানুষ গ্রহণ করতে পারে কোরআনে তেমন কোন সর্বজনীন (good for all) বিধান নেই। এর মুখ্য লক্ষ্য - আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী, পরধর্ম বিদ্বেষী, মানব-ঐক্য বিরোধী একটি সুসংগঠিত ও যুদ্ধে উৎসাহী কুচক্রী দল সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যেই অনুসারীদের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর সকল সম্পদের অধিকার ও কল্পিত পরলোকে অন্তহীন নারীভোগ সহ সকল দেহভিত্তিক সুখের নিশ্চিত

আশ্বাস। এই বিশ্বাসীদের মনে যে বিশ্বাসকে অটল করে দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে - আল্লাহ্ই সকল সৌভাগ্যের ব্যবস্থাপক; কিন্তু তা একমাত্র রসুল মহম্মদের সুপারিশেই সম্ভব। আল্লাহ্র সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগ নেই। এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার ও নানাভাবে তা প্রচার করার গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'কোরআন'। তাতে এ-ও স্থির করে দেওয়া হয়েছে যে, সৎ ও মানবিক হওয়া বড় কথা নয়; 'বিশ্বাসী' হওয়াটাই প্রথম ও শেষ কথা। তাই দেখা যাচ্ছে, ইসলামে বিশ্বাসী কট্টর মৌলবীরা মানবিক হওয়ার কথা বলেন না বা সামান্যই বলেন; কিন্তু 'বিশ্বাসী' হতেই সর্বাগ্রে বলেন। মুসলমানদের মধ্যে ইদানীং যারা ইসলাম ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টির কথা বলেন কোরআনের মতে তারা আর 'বিশ্বাসী' থাকেন না, 'মুরতাদ' (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যান। ইসলামে তাদের প্রাপ্য 'মৃত্যুদণ্ড'। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দিচ্ছি—

১। "....অনন্তর তারা যদি ফিরে যায়, তবে তাদের গ্রেফতার কর এবং যেখানে পাও তাদের সংহার কর। ... "(৪:৮৯)

২। "হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; ... " (৯:৭৩)

৩। ৯:৭৩-এর অনুরূপ কথা আছে ৬৬:৯ নং ও ৫:৫৪ নং আয়াতে।

কোরআনের এই সকল নির্দেশ বাস্তবায়নের অসংখ্য নজীর আছে। তবুও আধুনিক কালের জনা কয়েক, যেমন বাংলাদেশের নিহত বুদ্ধিজীবী হুমায়ুন আজাদ, মৃত্যুর পরোয়ানা প্রাপ্ত ইংল্যাণ্ড প্রবাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সালমান রুশদী ও আনোয়ার শেখ, বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত কবি দায়ুদ হায়দার ও লেখিকা তসলিমা নাসরিন, লাঞ্ছিত বিখ্যাত সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, হুমকি প্রাপ্ত লেখক সালাম আজাদ ইত্যাদি মানবপ্রেমী যুক্তিবাদী মুসলমান, যারা কোরআন নির্দেশিত 'জেহাদের' বিরুদ্ধে বলেন ও সকল ধর্মের মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও ন্যায়পরায়ণ।

ধর্মীয় চিন্তায় দেশ, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে নানা প্রকার বৈচিত্র্য থাকবেই। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টির অন্তরায় হবে না। তাহলেই আমরা তাকে 'ধর্ম' বলব। নৈতিক মূল্যবোধ বা মনুষ্যত্ব এবং বিশ্ব-মানব প্রেম হবে সেই ধর্মের ভিত্তি। কিন্তু মহম্মদ 'ধর্ম' বলতে এমন এক অযৌক্তিক ও অনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন যা তার ব্যবস্থাধীনে একই ছাঁচে ঢেলে মানুষ নয়, সৃষ্টি করতে চেয়েছেন একটি বিশেষ জঙ্গীদল যারা শতকরা ১০০ ভাগ 'অন্ধবিশ্বাসী' হবে। ধর্মের নামে তারা বিধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ থেকে পৃথিবীর শান্তিকে আতঙ্কজনকভাবে বিঘ্নিত করবে। এই দলের প্রবর্তকের দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস তারা যতই অনৈতিক কাজ করুক, তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়

(৩:১১০)। বিশ্বের সকল সম্পদের তারাই অধিকারী (২১:১০৫) এবং মৃত্যুর পর তারাই অনন্তকাল বেহেশ্‌তের অধিবাসী হয়ে দৈহিক সর্বপ্রকার সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে (৫৬:১০-৩৮)। সে সাথে তাদের বিশ্বাস করতে শেখানো হয় - তাদের দলের বাইরের সমস্ত মানুষ ঘৃণ্য জীব (৯: ২৮) এবং ইহলোকে তাদের (বিশ্বাসীদের) ও আল্লাহ্‌ কর্তৃক অবিশ্বাসীরা লাঞ্ছনার শিকার হবে ও পরলোকে নরকের আগুনে চিরদিন জ্বলবে। সৃষ্টিকর্তার একত্বে বিশ্বাস যে কেবল ইসলামেই আছে তা নয়। সততা, নৈতিক জ্ঞান ও তা অবলম্বন করে চলা মানুষ মুসলমান ছাড়া কেউ পৃথিবীতে নেই তাও নয়। কিন্তু ইসলাম তথা কোরআন ও রসুলের ঘোষণা— অন্য কোন নামে সৃষ্টিকর্তাকে নয়, কেবল আল্লাহ্‌ নামেই তাঁকে ডাকতে হবে। অন্য কোন প্রেরিত পুরুষ বা অবতার নয়, একমাত্র মহম্মদই তাঁর রসুল যাঁকে অনুসরণ করতে হবে। অন্য কোন পুস্তক নয়, কেবল কোরআন ও হাদিসকেই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান না হয়ে মানুষের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌, রসুল ও কোরআনের একমাত্র সিদ্ধান্ত। আর হাদিসের ভাষায় কোরআনকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

> "The foundation of the military spirit is as they say : Obedience and military discipline. Allah has gathered these foundations in the verses of His Book (Quran)", [Sahih Al-Bukhari,vol.1, page-xxxi]

অর্থাৎ সামরিক শক্তির ভিত্তি হচ্ছে দুটি— আনুগত্য ও সামরিক শৃঙ্খলা। আল্লাহ্‌ এই দুটো ভিত্তিকেই একত্রিত করেছেন তাঁর পুস্তক কোরআনের আয়াত-গুলোতে। কোরআনেও এ বিষয়ে অজস্র আয়াত আছে।

কোরআনে বহুবার বলা হয়েছে মুসলমান হলেই তার ইহকালে সৌভাগ্য ও পরকালে বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। হাদিসে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, একজন মুসলমান সমগ্র জীবনে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো উপাসনা না করলেই মৃত্যুর পরে সে অবশ্যই স্বর্গে যাবে, এমনকি যদি সে চোর বা অবৈধ যৌনসংসর্গকারীও হয়। হাদিসটি ২৯ নং পরিচ্ছেদের শেষ অংশে দেখুন।

'কোরআনের ব্যাখ্যা চেয়ে ফের নয়া বিতর্কে রুশদি' শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৫ অক্টোবর ২০০৬ (পৃ:১৭) খবর ছেপেছে। নিউইয়র্কে 'সেন্টার ফর এনকোয়্যারী' আয়োজিত এক সভায় রুশদি জঙ্গী সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামের যোগসূত্র থেকে শুরু করে বোরখা-বিতর্ক, ইসলাম নিয়ে পোপের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, '...অবিলম্বে কোরানের নতুন করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ যেকোন শিক্ষিত লোক কোরান পড়লেই বুঝবে যে, সেটা নানারকম অস্পষ্টতায় ভরা। ...'

৩৮ ॥ 'মুরতাদ'এর শাস্তি : ইসলাম প্রসারের একটি ভয়ঙ্কর কৌশল

ধর্ম আপন মহত্ত্বে, উদারতায় ও সৌন্দর্যে মানুষকে আকৃষ্ট ও অনুসারী করবে সেটাই যথার্থ ধর্মের লক্ষণ। লোভ বা ভয় দেখিয়ে কিংবা বলপূর্বক মানুষকে ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা তার পথ হতে পারে না। কিন্তু কোরআন সেই অনুচিত পথগুলিই অবলম্বন করেছে। যদিও কিছু কিছু উদার বাণী তাতেআছে, যেমন—

"ধর্ম সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ নেই ..."(২/২৫৬) "হে গ্রন্থানুগামীগণ। তোমরা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। ..." (৪/১৭১) "এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের গালি দিওনা। ..." (৬/১০৮)

কিন্তু এই কোরআনেরই অজস্র আয়াতে হিংসা, পরমত অসহিষ্ণুতার কথা আছে। আছে বলপূর্বক তথা জেহাদের মারফত ধর্মবিস্তারের নির্দেশ ('কোরআনে দ্বিজাতি তত্ত্ব' পরিচ্ছেদ দেখুন)। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলি সম্পর্কে যদি কেউ বলে ওগুলি অপর ধর্মালম্বীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে, তবে তার উত্তরে কোন যুক্তিপূর্ণ জবাব আছে কি?

'ইসলাম' প্রসারের কৌশল হিসাবে কোরআনে যুগপৎ মানুষকে প্রলুব্ধ, ভীত ও জেহাদ করার যে সকল বাণী আছে, আমরা তা সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এখানে মুসলমানরা যাতে উক্ত ধর্ম ত্যাগ না করতে পারে তার ইসলামী কৌশল নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব।

'মুরতাদ' শব্দটি আরবি। এর সুস্পষ্ট অর্থ 'ইসলামধর্মত্যাগী'। জন্মগত অথবা অন্য কোন ভাবে মুসলমান হওয়ার পর যারা 'ইসলাম' ত্যাগ করে তারাই 'মুরতাদ'। এবং মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ হলো কোরআনের (২:২১৭; ৩:৮৬-৯০: ১৬:১০৬; ৪: ১৩৭-১৩৮) আলোকে হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান। নবী মহম্মদ স্বয়ং এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

"No. 260 - Narrated Ikrima... the Prophet (PBUH) said, 'If somebody (Muslim), discards his religion, kill him'." (Al-Bukhari, vol. IV, page-161)

নবী মহম্মদের বংশধর বলে পরিচিত (বিতর্কহীন নয়) সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী তত্ত্ববিদ। তিনি 'মুরতাদের শাস্তি' শীর্ষক একখানি পুস্তিকায় কোরআন, হাদিস থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে যথেষ্টভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন

এ,বি, এম, এ, খালেক মজুমদার। প্রকাশনায় : আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। মওদূদী সাহেব বইটিতে মুরতাদের শাস্তি ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিধর্মীদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়েও শরীয়ত ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক বইটি পড়ে দেখতে পারেন। আমরা উক্ত বইটির ১৪নং ও ১৫নং পৃষ্ঠা থেকে নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"৭। উহুদ যুদ্ধের সময় (মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে) একজন মহিলা ধর্মত্যাগ করলো। এর ব্যাপারে রাসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করলেন—একে তওবা করানো হোক। এ কাজই উত্তম যদি সে এতে রাজি হয়, অন্যথায় একে হত্যা করা হোক। (বাই হাকী)

৮। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলছেন :

উম্মে রোমান (বা উম্মে মারওয়ান) নামক এক মহিলা 'মুরতাদ' হয়ে গেলে রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন ঃ তার সামনে ইসলাম পেশ করা হোক। যদি সে তওবা করে তো উত্তম। অন্যথায় তাকে কতল (শিরচ্ছেদ) করে দেয়া হোক। (দারকুতনী বায়হাকী) এ প্রসঙ্গে বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, মহিলাটি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তাকে হত্যা করে ফেলা হয়।"

আরও অনেক সন্তোষজনক প্রমাণ হাজির করে মওদুদী সাহেব বইটির ২৫ নং পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—

"এসব দলিলের পর কারো পক্ষেই সম্ভবত এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামে মুরতাদের সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। আর এ শাস্তি শুধু ধর্মত্যাগের কারণে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অপরাধের কারণে নয়।"

এখানে এ বিষয়ে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে একটির উল্লেখ করছি —

মহম্মদের নির্দেশে আবদুল্লা-ইবন-আবিসর কোরআন লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি দেখলেন ওগুলো প্রত্যাদিষ্ট বাণী নয়, বরং মহম্মদের রচনা। তখন তিনি মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিলেন। এর শাস্তি হিসেবে মক্কা বিজয়ের পরে মহম্মদ ইবন-আবিসরকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এই আবিসর ছিলেন মহম্মদের প্রিয় শিষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ওসমানের পালিত ভাই। ওসমানের সুপারিশে ইবন- আবিসর বেঁচে যান।

অসংখ্য নদী-নালা-খাল-বিলে পরিপূর্ণ পূর্ব বাংলায় মাছ ধরার জন্য বাঁশের শলা দিয়ে তৈরী একটি সরঞ্জাম আছে, যার একটি নাম— 'চাই'। মাছকে প্রলুব্ধ করার জন্য সর্পের খোল কিংবা শুটকীমাছ ইত্যাদি নেকড়ায় বেঁধে ওর ভেতর রেখে চাইটি জলের ভেতর খুঁটি দিয়ে বসানো হয়। মাছ সেই খাবারের গন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে প্রবেশ পথ

দিয়ে সহজেই ওর মধ্যে ঢোকে। কিন্তু চাইটি এমন কৌশলে তৈরী যে, মাছ কিছুতেই বের হতে পারে না। 'ইসলাম' অবিকল সেই চাই। বিভিন্ন প্রকার ভীতি ও লোভের টোপ এবং জেহাদের দ্বারা মানুষকে সে দলভুক্ত করে; কিন্তু দল থেকে মানুষকে বের হওয়ার রাস্তা চিরতরে বন্ধ রাখে। কেননা মুরতাদের একমাত্র শাস্তি— মৃত্যুদণ্ড। ইসলাম এভাবেই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে বলপূর্বক রোধ করে।

৩৯॥ নারীর স্থান : কোরআন ও হাদিসে

১। "তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর..." (২:২২৩)

উদ্ধৃত আয়াতটিতে আল্লাহ্ যে ভাষায় নারীকে ব্যবহার করতে বলেছেন তা অবশ্যই অসম্মানজনক। নারীকে ফসল উৎপাদনকারী জমির সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর যে একটি ব্যক্তি-সত্তা আছে তা আয়াতটিতে মোটেই স্বীকৃত হয়নি। নারী যেন সন্তান উৎপাদনকারী এবং সম্ভোগের একটি বস্তুমাত্র। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য না দিয়ে তাকে অপমানই করা হয়েছে।

২। "... তবে নারীদের মধ্য হতে তোমোদের পছন্দমত দু-দুটো, তিন-তিনটে, বা চার-চারটে বিয়ে কর ..." (৪:৩)

উপরের আয়াতটিতে নারীদের পছন্দ-অপছন্দের কোন মূল্যই দেওয়া হয়নি, বরং মনে হয় নারী যেন ছাগল-ভেড়ার সামিল জীব। স্পষ্টতই পুরুষদের ভোগের পণ্য হিসাবে তাদের গণ্য করা হয়েছে।

৩। "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করেন।" (৪:১৫)

উপরোক্ত আয়াতটি নিয়ে দু'টি পর্যায়ে আলোচনা করা যাক। এক, 'ব্যভিচার' শব্দটি নিয়ে। মূল আরবী কোরআনে শব্দটি হচ্ছে 'জেনা' যার বাংলা অনুবাদ 'ব্যভিচার' করা হয়েছে। ব্যভিচার শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল... অন্যথাচরণ, স্খলন, স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সংসর্গ। ইংরেজীতে— adultery, deviation from the proper course etc. দুই, আয়াতটি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় ব্যভিচার বলতে এখানে স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সংসর্গ বোঝানো হয়নি। বরং অন্যথাচরণ বা deviation from the proper course অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা আরও স্পষ্ট হবে পরের আয়াতটি লক্ষ করলে। একটু পরেই ওটি নিয়ে আলোচনা

করবো। উপরের আয়াতটিতে বলা হয়েছে—'নারীদের মধ্যে যারা' এর অর্থ নারীগণ যদি সমমৈথুনে লিপ্ত হয় (deviation from the proper course) তবে সংশ্লিষ্ট নারীদের গৃহবন্দী অবস্থায় অনাহারে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কিন্তু এ যুগে আল্লাহ্‌র এ বিধান কি কোথাও মানা সম্ভব? সমমৈথুন কি এতই বড় অপরাধ যে তার জন্য আল্লাহ্ মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিলেন এবং তা-ও আবার গৃহবন্দী করে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত? আল্লাহ্ রহমানুর রহিমই বটে। অপর পক্ষে পরবর্তী আয়াতটি লক্ষ করুন— "আর যদি তোমাদের যে দু'জন এতে লিপ্ত হবে (ব্যভিচারে) তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর, কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের রেহাই দেবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।"(৪:১৬) আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হল— 'আর যদি তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এতে লিপ্ত হবে...' অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে দু'জন যদি সমমৈথুনে লিপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট উভয়কে শাস্তি প্রদান করতে আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু শাস্তিটা কী আগের আয়াতের মত উল্লেখ করা হল না। বরং অপরাধীরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দিতে বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, যে-অপরাধের (ব্যভিচার) জন্য নারীদের গৃহবন্দী করে অনাহারে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আল্লাহ্ দিলেন তিনি পুরুষদের ক্ষেত্রে সেই একই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সাপেক্ষে শাস্তি হতে রেহাই দিতে বললেন। কাজেই নারীর স্থানটা আল্লাহর চোখে কেমন তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? তিনি শ্রেষ্ঠতম বিচারক বটেন।

৪। "... এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয় তবে তাদের শয্যা থেকে পৃথক কর এবং তাদের প্রহার কর, ..." (৪:৩৪)

লক্ষ করুন উপরের আয়াতটিতে— 'নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা হলে' বলা হয়েছে। 'অবাধ্য হয়েছে' বলা হয়নি। এই আশঙ্কা দেখা দিলেই পত্নীদের প্রহার পর্যন্ত করার ঢালাও অধিকার আল্লাহ্ স্বামীদের দিয়ে দিলেন। তাও আবার স্বামীটি (পুরুষ) প্রহারের কোন পর্যায়ে যেতে পারে তার সীমা রাখা হয়নি। কিন্তু অবাধ্য স্বামী সম্পর্কে পত্নী কী করবে আল্লাহ সে বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন একেবারেই বোধ করলেন না। তাহলে অবস্থাটা এই দাঁড়ালো যে, পরিবারে স্ত্রীটি সর্বদাই একটা ভীতির মধ্যে থাকবে, কখন তার স্বামী অবাধ্যতার অজুহাতে তাকে প্রহার করে। তা ছাড়া যখন তখন তালাকের ভয় তো আছেই। নারীকে চাপের মধ্যে রাখার উত্তম ব্যবস্থা আল্লাহ্ রহমানুর রহিম করেছেন।

৫। "... এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান, ..." (৪:১১)

আয়াতটিতে মৃতের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পুত্রের প্রাপ্যের অর্ধেক কন্যা পাবে। এখানে কন্যাটি বিবাহিতা

কি অবিবাহিতা কিছুই বলা হয়নি। যদি কন্যাটি অবিবাহিতা হয় তবে সে কেন পুত্রের তুলনায় অর্ধেক পাবে? এতেও দেখা যায় নারীর প্রতি কোরআন মোটেই সুবিচার করেনি।

৬। "...তোমাদের দাসিগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধনলালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করোনা, তবে কেউ যদি তাদের বাধ্য করে (ঐ নোংরা জীবনে) তবে তাদের বাধ্য হওয়ার'পর (নিরুপায় অবস্থায়) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (২৪:৩৩)

উদ্ধৃত আয়াতটিতে স্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী দুটি কথা আছে। প্রথমে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হল, ধনলালসায় তারা যেন দাসিদের বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য না করে। অবশ্যই এটা ভাল কথা। কিন্তু পরেই আবার বলা হল, তবে কেউ যদি তা করে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল। একেবারেই বিপরীত কথা নয় কি? আমরা 'কোরআনে স্ব-বিরোধিতা' পরিচ্ছেদের এরূপ উদাহরণ অনেক দেখিয়েছি। যা হোক, এখানে বক্তব্য বিষয়টি হচ্ছে— নারীর অবস্থাটা কোরআনে কতখানি হীন ও অসহায় করে দেখান হয়েছে। একজন নারী, হোক না সে দাসি, কেউ ধন উপার্জনের জন্য তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করলে আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন এ বিচার কি কোন অর্থেই মানবিক ও সভ্য সমাজের হতে পারে?

৭। "যারা নিজেদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা কামনা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না।" (২৩:৫-৬) অনুরূপ বক্তব্য কোরআনে অন্যত্রও আছে। এখানে দাসি, পত্নী যারা অবশ্যই নারী, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের উপর মালিকের খেয়াল খুশীমত যৌন ভোগের ঢালাও ব্যবস্থা কোরআন দিয়েছে। এই ব্যবস্থা কি নারীদের হীন অবস্থার সাক্ষ্য দেয় না?

কোরআনের বহুস্থানে বেহেশ্‌তের যে বর্ণনা আছে তাতে প্রধান আকর্ষণ শয্যা-সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়া যাবে বহু সংখ্যক আয়ত নয়না যৌবনবতী তরুণী, যাদেরকে আগে কেউ স্পর্শ করেনি (দেখুন : ৫২:২০; ৫৫:৫৬, ৭০, ৭২, ৭৪; ৫৬:২২, ৩৪-৩৭ ইত্যাদি)। এসব বর্ণনায় এটা খুবই স্পষ্ট যে, বেহেশ্‌তটা পুরুষদেরই জন্য। আর নারীরা যদি বেহেশতে যায়ও পুরুষদের মত তাদের যৌন সম্ভোগের ব্যবস্থা কোরআনের কোথাও নেই। "সংযমীরা জান্নাতে ভোগ বিলাসে থাকবে।" (৫২:১৭) এখানে সংযমীরা বলতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার উপায় নেই। কেননা পরবর্তী আয়াতগুলিতেই তা অত্যন্ত স্পষ্ট। "...আমি আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটাবো। " (৫২:২০) নিশ্চয়ই মেয়েদের জন্য আল্লাহ হুরের আশ্বাস দেননি। এতে মনে হয় নারীদের যৌন-বোধ আছে বলে আল্লাহর কাছে স্বীকৃত নয়। অথবা তিনি এ

বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। অথচ মেয়েরা তো মানুষই এবং তাদের জীবনে যৌন-বোধ একটা প্রধান বিষয়ও। তাতে কি একথা মনে করা যেতে পারে না যে, নারীগণের গুরুত্ব কোরআনে নেই বললেই চলে?

৮। "... তাতে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী মনোনীত কর, ... (২:২৮২)

সাক্ষী হিসাবেও নারীর মর্যাদা পুরুষের অর্ধেক, উপরোক্ত আয়াতটিতে তা স্পষ্ট।

কোরআনের অন্যত্র যাই থাক উপরে উদ্ধৃত কোরআনের অংশগুলির গুরুত্ব তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। নারীর সম্মান তাতে একটুও বৃদ্ধি পায় না। বরং বাস্তবে আমরা দেখছি অধিকাংশ মুসলমানই কোরআনের ভাল কথার চেয়ে মন্দ কথাগুলির বেশী অনুসরণ করে।

'তালাক'

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় 'তালাক' (মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোরআন, হাদিস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে এ নিয়ে অনেক কথা আছে। আমরা সে সব শাস্ত্রীয় নিরস ও জটিল কচকচির ভেতর না গিয়ে সরল ভাষায় সর্বজনস্বীকৃত মুসলিম সমাজে চালু প্রথাটির উল্লেখ করছি। কোন বিবাহিত মুসলমান পুরুষ যদি সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায়, ভুলক্রমে বা রাগের মাথায় তার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি 'তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করে, তবে নির্দোষ হলেও সেই স্ত্রী তার জন্য আর বৈধ থাকে না। তালাক প্রাপ্তা বলে গণ্য হয়। পরে যদি স্বামীটি ঐ মহিলাকেই পুনরায় গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা পারবে। তবে তাকে ছোট্ট একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ কাজ করতে হবে। প্রক্রিয়াটি এইরূপ, ঐ তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তার ইদ্দতকালের (মোটামুটি তিন মাস) পর অপর কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন স্বামীর সঙ্গে তার যৌন মিলন বাধ্যতামূলক। এর পরে ঐ স্বামী যদি আইনমাফিক তালাক দেয় তবে তিন মাস অপেক্ষা করে (ইদ্দতকাল শেষে) প্রাক্তন স্বামী তাকে বিয়ে করতে পারবে (দেখুন- কোরআন ঃ ২:২৩০)। এই মাঝখানের বিয়েটির নাম 'হিল্লা বিয়ে'।

হিল্লা বিয়ে নামের এই শরিয়তি বিধান অত্যন্ত লজ্জাকর ও অমানবিক বলেই অধিকাংশ বিদ্বৎসমাজ গণ্য করেন। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্ত্রী-টি নির্দোষ, প্রেমময়ী ও কর্তব্যপরায়ণ। তবু মুসলমান পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতায় সামান্য কারণে বা অকারণে তাকে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও অপমান সইতে হয়। এরূপ ঘৃণ্য ও হৃদয়হীন বাস্তব ঘটনা অবলা নারীর উপর অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। এবং স্বামীর জন্যও অনেক

ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত। এ বিষয় নিয়ে অনেক গল্প উপন্যাসও রচিত হয়েছে। ইদানীং কালের দ'ুটি রচনার উল্লেখ করাই উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট হবে। গল্পটির নাম - 'দুঃখবতী মেয়ে'। লেখিকা তসলিমা নাসরিন। প্রকাশিত হয়েছিল কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, শারদ উপহার। ১৪১১-এ। এ ছাড়া প্রখ্যাত লেখক নারায়ণ সান্যাল (পশ্চিববঙ্গ) এর উপন্যাসটির নাম - 'ওরা হিন্দু না ওরা মুসলিম'। প্রকাশিত হয়েছিল 'শারদীয়া নব কল্লোল, ১৪০২-এ। রচনা দু'টিতেই তালাক ব্যবস্থায় নারীর হীন অবস্থা বর্ণিত।

কোরআনে তালাক সর্ম্পকে অনেক আয়াত আছে। যেমন- ২: ২২৬-২৩২, ২৩৬, ২৩৭,২৪১; ৩৩:৪৯; ৬৫:১ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ২:২৩০ আয়াতটি কিছুটা স্পষ্ট হলেও বাকীগুলি অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং কোন কোনটি (৩৩: ৪৯; ৬৫:১) পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে অপ্রাসঙ্গিক ও পারস্পর্যহীন। ইদ্দতকাল সর্ম্পকে কোথাও তিন রজস্রাব কাল (২:২২৮) কোথাও চারমাস দশ দিন (২:২৩৪)। অথচ তালাকের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নানা স্থানে এত অস্পষ্ট কথা না বলে এক জায়গায় সব কথা স্পষ্ট করে বলা সহজ ছিল। উচিতও ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। এটাও কোরআনের একটা ত্রুটী কিনা সুধী পাঠক পাঠিকারা বিচার করবেন।

কোন কোন ইসলামতত্ত্ববিদ কোরআন হাদিসের এই বিধানের স্বপক্ষে নিজস্ব মস্তিস্ক প্রসূত একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এই বিধানটির উদ্দেশ্য মুসলমানকে তালাক দিতে নিরুৎসাহিত করা। যদিও তাঁদের এই ব্যাখ্যা কোরআনের কোথাও নেই। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেউ ঠাণ্ডা মাথায় উচিত অনুচিত বিচার করে বা কারও সাথে পরামর্শ করে তালাক দেয় না। তালাক দেয় প্রায়শই তাৎক্ষণিক ক্রোধ বা উত্তেজনাবশত। সুতরাং তাঁদের উক্ত ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও হাস্যকর। তালাক বিষয়ে কোরআন হাদিসের বিধান একতরফাভাবে পুরুষকে ঢালাও অধিকার দিয়ে নারীকে মর্যাদাহীন ও অপমানই শুধু করেনি অসহায়ও করেছে।

ইসলাম নানাভাবে নারীকে মর্যাদাহীন ও অসহায় করেছে দেখিয়ে 'শরিয়তি আদালত ও ফতোয়া নিষিদ্ধ করার দাবির যৌক্তিকতা' শিরোনামে মুর্শিদাবাদের শিক্ষক গিয়াসুদ্দিন সাহেবের একটি সুলিখিত তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধ 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ২৭ জুন, ২০০৭ এ ছেপেছে। গিয়াসুদ্দিন লিখেছেন, 'মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ধারাবাহিক লেখনির প্রভাবে সাধারণভাবে প্রায় সর্বস্তরে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে, প্রাক ইসলামিক যুগে আরবে নারীর কোন অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। অনেকে এমনও বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, এমনকি কোরআনের আয়াতগুলি বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যায়, প্রচার ও বাস্তবের মধ্যে কোন মিল নেই। প্রকৃত ইতিহাসটা ঠিক বিপরীত এবং

তা হল প্রাক্-ইসলাম যুগে নারীর ছিল অনেক স্বাধীনতা ও মর্যাদা। ইসলাম নারীর সেই অধিকার ও মর্যাদাগুলি নির্মমভাবে হয় খর্ব করেছে না হয় হরণ করেছে। আরবের মেয়েরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারত। এমনকি যুদ্ধেও অংশ নিতে পারত। পছন্দ করে বিয়ে করতে পারত এবং বিয়ের পর স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকারও ছিল।' উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে গিয়াসুদ্দিন কোরআনের ৩৩: ৩৩, ৫৩, ৫৯ নং আয়াতগুলির উল্লেখ করেছেন।

প্রাক্-ইসলাম আরবের নারীরা যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আমরা বিবি খাদিজার নাম উল্লেখ করতে পারি। অথচ পরবর্তী কালে তাঁর সেই স্বাধীনতা বজায় থাকেনি। সুতরাং ইসলাম তথা কোরআন তালাকের অধিকার সহ উপরোক্ত আরও কিছু অধিকার হরণ করে নারীকে অসহায়, পরাধীন ও মর্যাদাহীন করেছে একথা ঐতিহাসিক সত্য।

আগেও বলেছি হাদিস কোরআনের পরিপূরক। মুসলমানরা হাদিসকে কোরআনের চেয়ে কম মানে না। অজস্র হাদিসে নারীর প্রতি অত্যন্ত অবহেলা ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করি, যেখানে নারীকে কুকুর, গাধা ও উটের সমান দেখানো হয়েছে।

1. "Because of Eve women are unfaithful towards their husbands." - Shahi Muslim, Vol. 8, No. 3471.
2. "Women, slaves & Camels are same." - Sunan Abu Daud, Vol. II, Book-2, No. 155.
3. " Nothing is more harmful to man than women." - Shahi Bukhari, Vol. 7, Book 62, No. 33.
4. " Women in general (as Mohammad declared) are the majority of the people in hell on the day of judgement." Shahi Bukhari, Vol. I, Book 6, No. 301.
5. " Mohammad also said that, women possess sinister character." (Taken from 'The status of Women in Islam, 'www.faithfreedom.org')
6. " Mohammad said that, a prayer would be nullified if a donkey, a dog or a woman passes in front of the praying man." Shahi Bukhari, Vol. I, Book 9, No. 490."

নারী ও পুরুষের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিগত যে বৈষম্য তাকে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সামাজিক ও মানবিক বিচারে নারীর ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব পুরুষের

তুলনায় হেয় করে দেখালেই তার প্রতি অমর্যাদা ও অবিচার বলে ধরা যায়। কোরআন-হাদিস নারীকে হেয় করে নিঃসন্দেহে অবিচার করেছে, অপমান করেছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী বা শরিয়তি শাসনের দিক থেকে সৌদি আরবের পরেই ইরানের স্থান। সেই ইরানে সরকারী হিসাবে ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ১০ বছরে নারীদের যে প্রাণ দণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ—

" 1428. Women executed. 187 under the age of 18, 9 girls under the age 13, the youngest girl executed was 10 years, the oldest woman executed was 70 years. (Taken from 'The Status of Women in Islam, www.faithfreedom.org')

আমরা জানি না ইরানের নারীরা এতটা অপরাধপ্রবন হল কী করে যে তারা এত বেশী সংখ্যায় প্রাণদণ্ডাদেশের সাজা প্রাপ্ত হয়। আমরা এও বুঝিনা সেখানে একটি সত্তর বছরের বৃদ্ধা ও ১০ বছরের একটি কিশোরী এমন কী অপরাধ করতে পারে যে তাদেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪ আগষ্ট, ২০০৬, ৭ নং পৃষ্ঠায় ইরানের নেকা শহরের একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে—**"অসতী ষোড়শীর ফাঁসি, ধর্ষক পেল ৯৫ ঘা"** শিরোনামে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০০৪ সালের ১৫ আগষ্ট ইসলামী আইনে ১৬ বছরের আতেফার ফাঁসি হয়। শরিয়তি আদালত শুনতে চায়নি তার ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা। তাই চিৎকার করে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বোরখা। ৫১ বছরের আলি দরাবি এই কিশোরীকে ধর্ষণ করে। অথচ তার হয় ৯৫ ঘা বেত্রাঘাত। আর ধর্ষিতার হয় অসতীত্বের দায়ে মৃত্যুদণ্ড।

সত্যি ইসলাম নারীকে মহিমান্বিত করেছে! অবশ্য সাংবাদিক আসিয়ে আমিনি কিশোরী আতেফাকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র করছেন বলে ঐ সংবাদে প্রকাশিত। কে জানে হয়ত আতেফার মৃত আত্মা এতে সান্ত্বনা পেতেও পারে। কিন্তু ইরান সরকার যে এ ছবি সেখানে দেখাতে দেবে না— এ কথা নিশ্চিত।

২০/১০/২০০৬ তারিখে পশ্চিমবাংলার দৈনিক স্টেটসম্যান (পৃ.৭) ও 'বর্তমান' পত্রিকার খবর— ৩ জুন, ২০০৫ সনে উত্তরপ্রদেশের এক গ্রামের আলী মহম্মদ নিজের পুত্রবধূ ইমরানাকে ঘরের ভেতরেই ধর্ষণ করেন। ঘটনাটি জানাজানি হলে কেউ কেউ আলী মহম্মদকে মারধর করে। সে তখন মোল্লাদের ডেকে ইসলামের বিধান চাইলে মোল্লারা শরিয়তী বিধান দেয় যে, ইমরানার বিয়ে খারিজ হয়ে গেছে, এখন তাকে বিয়ে করবে শ্বশুর আলী মহম্মদ। ইমরানা এই বিধান অগ্রাহ্য করে আদালতের শরণাপন্ন হয়। ১৯/১০/২০০৬ তারিখে মুজফ্‌ফর নগর জেলা দায়রা জজ আলী মহম্মদকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও দশহাজার টাকা জরিমানা করে

রায় দেন। মোল্লারা এর পরেও ফতোয়া দেয়, ইমরানা স্বামীর ঘর করতে পারবেন না।

এই যে ইসলামী বিধান, যা ধর্ষক শ্বশুরকে রেহাই দিয়ে তার বিয়ের সুযোগ দেয়, অপরপক্ষে নিরীহ ধর্ষিতা পুত্রবধূর বৈধ বিবাহ খারিজ করে, তা কি কোন অর্থেই মানবিক ও ন্যায্য? নারীর মূল্য কি ইসলাম দেয়?

১৬/১১/২০০৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'ধর্ষণ আইনে ধর্মীয় শৃঙ্খল ভাঙার পথে পাকিস্তান' শিরোনামে খবর— পাকিস্তানে ১৫ নভেম্বর নিম্নকক্ষে পাশ করা হয় 'মহিলা রক্ষা বিল'। ইসলামী আইন 'হুদুদ' থেকে মুক্ত হয়ে এটি পাশ হল।

গত তিন দশকে পাকিস্তানে হাজার হাজার মেয়েকে ধর্ষিতা হওয়ার 'অপরাধে' জেলে পোরা হয়েছে। মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ, 'হুদুদ' আইন থাকলে কোন ধর্ষণই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এখন পাকিস্তানে পাশ হওয়া 'মহিলা রক্ষা বিল' প্রমাণ করল, কোরআন ভিত্তিক ধর্মীয় বিধান 'হুদুদ' নারীদের প্রতি অবিচার ছাড়া কিছু নয়। এবং এর পরিবর্তন প্রয়োজন।

মুসলমানরা মুখে মুখে ও নানা লেখায় ইসলামের মহত্ত্ব ও নারীদের স্থান ইসলামে অনেক উঁচুতে বলে যতই প্রচার করুন তা কি আমাদের উদ্ধৃত কোরআন হাদিসের অংশগুলোর দ্বারা সমর্থিত হল? পাঠক, অন্ধ বিশ্বাস ও বদ্ধ সংস্কার নয়, যুক্তি-প্রমাণ হোক আপনার সত্যে পৌঁছবার সোপান।

৪০॥ 'জেহাদ' ও আনুষঙ্গিক কিছু কথা

'তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করছে এবং কে ধৈর্যশীল না জানছেন।' (৩:১৪২)

'...যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জেহাদ করে তাদের আল্লাহ্ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' (৪:৯৫)

'....অবিশ্বাসীগণ (অমুসলমান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (৪: ১০১)

'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে, এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে;'(৯:৫) 'অভিযানে বের হয়ে পড় লঘু রণ সম্ভারে হোক অথবা গুরু রণ সম্ভারে হোক ..." (৯:৪১)

"যারা আল্লাহ্তে ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।" (৪৮:১৩; ৭২:২৩)

এগুলি ছাড়াও কোরআনের অনেক আয়াতে অমুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র চরম

ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে তিনি (আল্লাহ্) পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়েছেন। এতে খুব সঙ্গত কারণেই বিবেক সম্পন্ন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি কী করে একদল মানুষকে কেবল ধর্মীয় মতের ভিন্নতার কারণেই অপর একদল মানুষকে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যা করতে নির্দেশ দেন। ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতা থাকলে এমন অনৈতিক নির্দেশকে আল্লাহ্র বাণী বলে মুসলমানরা মানত না বলেই সুধীজনেরা বলেন।

সন্দেহ নেই নবী ও কোরআন তাদের অনুসারীগণকে একটা প্রচণ্ড তৎপরতা দিয়েছে। কিন্তু সে তৎপরতা সর্বতোভাবে বিশ্ব মানবের কল্যাণকর হয়নি। ক্ষতিকর হয়েছে। পৃথিবীর সকল মানুষের মঙ্গল একমাত্র ইসলাম গ্রহণে, এই দ্বিধাহীন ভুল তত্ত্ব নবী ও কোরআনের (দেখুন- কোরআন-২: ৩৯,১৬১,১৬২,২৭৭; ৩:১৯,৩২, ৮৫,১১০; ১৩২; ইত্যাদি)। আরও অনেক মিথ্যা ধারণার উৎস সেখানেই। ফলে ইসলামের অন্ধ অনুসারীগণ অন্য কোন ধর্মকে স্বীকৃতি দেয় না এবং একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে জোর করে হলেও ইসলামের অনুগামী করতে হবে। এটা তাদের পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য এবং বেহেশ্তে যাবার অবধারিত পন্থা বলে নিশ্চিত জানে। নবী ও কোরআনের প্রেরনা পেয়েই ইসলামের কিছু অনুসারী মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে নরহত্যা ও ধ্বংসাত্মক কর্মের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি তথা 'জেহাদ' করে আসছে (দেখুনঃ কোরআন- ২: ১৯৩; ৮: ১২-১৩,৩৯; ৯: ৩৮,৩৯,৭৩ ইত্যাদি; 'জেহাদ' কাকে বলে এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু কথা আমরা আগেই ২০ নং পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি)। আর বাদ বাকী প্রায় সব মুসলমান পুলকিত চিত্তে উক্ত অশান্তির কাজকে নিরবে বা সরবে সমর্থন করে, নিন্দা মোটেই করে না। নবী ও কোরআন ভিত্তিক এই ভয়ংকর অন্ধবিশ্বাস হতেই একদা যেমন ভারতে 'ওহাবী' ও 'ফরাজী' আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছিল, এখন তেমনি ভারতসহ সমগ্র বিশ্বে ইসলামী সন্ত্রাস মানুষকে মারছে, ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আমরা বিশ্বাস করছি না বা বলছি না, সকল মুসলমান এই জঘন্য কাজের সাথে যুক্ত। কিন্তু এটা সত্য যে, এই ইসলামী সন্ত্রাস অপর ধর্মাবলম্বীদের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদেরও মারছে এবং সাধারণ নিরীহ মুসলমানদেরকেও ভীতিকর অবস্থার মুখে দাঁড় করাচ্ছে। এটা একটা জটিল পরিস্থিতি। কেননা অপর ধর্মের মানুষেরা বদলা হিসাবে নির্বিচারে সকল মুসলমানদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক।

ধর্মে চিন্তার গভীরতা, বহুমুখিতা, স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতা থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রধানতঃ একটি মাত্র পুস্তক ও একজন ব্যক্তি নির্ভর ইসলামে তা নেই ("আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী

নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। ..." কোরআন ৩৩: ৩৬)। ইসলাম নামক মতবাদটি মানব সমাজের জন্য খুবই ভয়ংকর বলে অনেকেই মত প্রকাশ করে আসছেন। ইসলামকে নিরপেক্ষভাবে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ করে সুধী অনেকেই বলে থাকেন, যদিও ইসলাম একটা ধর্মীয় আবরণযুক্ত ও প্রচারিত তবু তা ধর্মীয় গুণ (property) যুক্ত নয় বলে তাকে একটা মতবাদ বলাই সঙ্গত।

কোরআন মুসলমানকে অপর ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ (অমুসলমানদের প্রতি) আয়াত কোরআনে প্রচুর। এই হিংসা, ঘৃণা, আত্মম্ভরিতা ও জেহাদের মাধ্যমে কোন্ শান্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন নবী মহম্মদ ও কোরআন? কী তাদের লক্ষ্য? ধরে নেওয়া যাক পৃথিবীর সকল মানুষ 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু, মহম্মদুর রসলুল্লাহ্ ' ইত্যাদি বলে পাঁচ কলেমায় আস্থা স্থাপন করে বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান হয়ে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে থাকলো, হজ্ব করতে মক্কায় গেল, কোরবানী করল, যাকাত দিতে থাকলো। কিন্তু তাতে কল্পিত বেহেশ্তের গ্যারান্টি যতই থাক, এই বাস্তব জগতের মানুষের সমাজে শান্তির নিশ্চয়তা কোথায়? নেই-নেই এবং নেই। মহম্মদ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের কার্যাবলী ও তাদের ইতিহাস থেকে তা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এই কথা অপর ধর্মের মানুষের বুঝলেই হবে না, মুসলমানদের আরও বেশী করে বোঝা চাই । এবং বলা চাই, তবেই বিশ্বে অন্তত কোরআন সৃষ্ট জাতিবিদ্বেষপ্রসূত অশান্তি দূর হতে পারে।

যুদ্ধ সর্বদাই সার্বিক ক্ষতিকর। যুদ্ধমান সকল পক্ষের তো বটেই, নিরীহ জনগণেরও। তবু দুষ্কৃতিকারীর কিংবা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হলে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করাটা অন্যায় নয়, বরং কর্তব্য। কিন্তু 'জেহাদ' তা নয়। কোরআন বার বার শুধু ধর্ম বিস্তারের জন্যই যুদ্ধ করতে মুসলমানদের (অমুসলমানদের বিরুদ্ধে) প্ররোচিত করেছে। এবং মুসলমানরা তা করেছে, করছে এবং করবেও।

রচয়িতা যিনিই হোন কোরআনের মূল লক্ষ্য একটিই — মানুষকে মুসলমান বানানো। এই উদ্দেশ্যেই নবী প্রথমে মক্কা, মদীনা অঞ্চলের মানুষদের দিয়ে শুরু করলেও পরে সুযোগ পেয়ে ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছেন। আল্লাহ্ কিংবা নবীর (আসলে নবীরই) ঐ লক্ষ্য বা ইচ্ছাটি রূপায়নের পথ কোরআনেই বাতলে দেওয়া হয়েছে। পথটির নাম 'জেহাদ'। যদিও সাধারণভাবে অনেকের ধারণা বা অনেকে বোঝাতে চান এবং কোরআনেও 'জেহাদ' বলতে ধর্ম বিস্তারের জন্য অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে, তবুও কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। জেহাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'একটি আক্রমণ, অথবা কঠোর আক্রমণ।' তা ২০ নং পরিচ্ছেদে আগেই বলা হয়েছে। এখানে ঐ অর্থের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করাটা একটা কঠোর আক্রমণ বটে। কিন্তু অস্ত্র ছাড়াও যে কঠোর আক্রমণ করা যায় সে বিষয়টাই এখানে

বলতে চাইছি। যদি ভয় বা লোভ দেখিয়ে কিংবা অন্য কোন কৌশলে ইসলামের প্রসার ঘটানো যায় সে চেষ্টাটাও জেহাদের পর্যায়ে পড়ে। উল্লিখিত দু'টি পদ্ধতিই যে প্রথম হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বাসীরা (মুসলমান) অনুসরণ করে আসছে ইতিহাসে সে নজীরের অভাব নেই। মহম্মদ নিজে দু'টো পদ্ধতির যে কোনটি ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তী কালে সামরিক ব্যক্তিত্বরা (অবশ্যই মুসলমান) অস্ত্রের সাহায্যে এবং চতুর পীর ফকির বা বুদ্ধিজীবীরা নানা কৌশলে সেই একই উদ্দেশ্যে কাজ করে আসছেন। বর্তমান কালের ওসামা-বিন-লাদেন প্রমুখরা সন্ত্রাসের পথে আর পশ্চিমবাংলার কয়েকজন সেকুলার মুখোশধারী মুসলিম বুদ্ধিজীবী (যাদের মধ্যে ডঃ খেতাবধারীও আছেন) তলে তলে ইসলাম প্রসারের সুচতুর জেহাদীর ভূমিকা পালন করছেন। অনেক নির্বোধ হিন্দু তা ধরতেই পারে না বরং তাদের প্রশংসা করে।

কোন কোন সময় 'নিরীহ শান্তিপ্রিয় মুসলমান' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদের বর্ণনা করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই বর্ণনা যদিও সত্য বলেই মনে হয়। তবু এটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, কথাটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নবীর প্রচারিত কোরআন ভিত্তিক 'বিশ্বাসী' (মুসলমান) কখনই শান্তিপ্রিয় ভাল মানুষ হতে পারে না। কেননা কোরআন ও রসুলের আদর্শ অনুযায়ী এই কথাটা সত্য যে, মানুষকে যেভাবেই হোক মুসলমান বানাতে হবে। তার জন্য ভয় ও প্রলোভন দেখানো তো আছেই, তবে জেহাদ (যুদ্ধ অর্থে) হচ্ছে চরম ও শেষ পন্থা। মুসলমান হলে সর্বাংশে ঐ কোরআন ও নবীর আদর্শকে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও প্রতিপালন করতে হবেই। এবং তা করলে সে আর নিরীহ ভাল মানুষ থাকে কী করে? আর ভাল মানুষ হতে গেলে সে নবী এবং কোরআনের চোখে 'বিশ্বাসী' থাকে না। নবীর উদ্দেশ্য ছিল শুধু 'বিশ্বাসী' বানানো, ভাল মানুষ বানানো নয়। কোরআনে তা অজস্রবার বলা হয়েছে (৩: ৮৫, ১০২, ১১০; ৪৯: ১৪-১৫ ইত্যাদি)। মুসলমানদের দাবিও তা-ই। একজন মুসলমান গর্বের সাথেই বলেন, আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ। ভাল মানুষ আর মুসলমান একই সময়ে সম্ভব হলে সোনার পাথর বাটিও অসম্ভব নয়।

তবে কি মুসলমানদের মধ্যে ভালমানুষ নেই? নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক ভাল মানুষ আছেন। তার কারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে মুসলমানের ঘরে জন্মেছে বলেই যারা মুসলমান হিসেবে পরিচিত, তাদেরকে কোরআন-হাদিসের দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভিত্তিক জেহাদী নীতিতে প্ররোচিত না করলে তারা স্বাভাবিক মানবিক মূল্যবোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়। ধর্মটা বাইরের বস্তু। ওটা আরোপিত। সমাজের দ্বারা চালিয়ে দেওয়া পরিচয় ও নীতির অনুসরণ। মানুষের আসল পরিচয়টা সহজাত। সে মানুষ। সকল ধর্মের মানুষের সেটাই ঐক্যসূত্র— মনুষ্যত্ব। স্বাভাবিকভাবে সেই মনুষ্যত্ববোধটাই

মুসলমানের ঘরে জন্মানো মুসলমানকে মানবিক করে। সে মুসলমান হিসেবে পরিচিত হয়েও অপর ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করে না। ভাল বাসতে পারে। যদিও তা ইসলামের মৌল নীতি নয় এবং যতক্ষণ সে তা না জানে। কোরআন অমুসলমানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। (দেখুন-৪:১৪৪, ১০১; ৬০/১)

আস্তিকতা বির্তকিত বিষয়। সুতরাং মানুষ নিরাকার বা সাকার উপাসনা করুক, একেশ্বর বা বহুদেববাদী হোক তা মনুষ্যত্ব অর্জনের সাথে সরাসরি খুব একটা সর্ম্পকিত নয়। কিন্তু নৈতিকতা (morality) মনুষ্যত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অন্তত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে তা বোঝা যায়। তা ছাড়াও এই কথা প্রমাণিত হবে এই বাস্তব উদাহরণ থেকে যে, সাকার, নিরাকার এক বা বহুদেববাদী নির্বিশেষে ঈশ্বরে বিশ্বাসী অনেক লোককে পশুরও অধম হতে দেখা যায়। অপর পক্ষে সংশয়বাদী বা নাস্তিক হলেও যদি সে নীতিপরায়ণ হয় (এবং হতে দেখাও যায়) তবে তাকে মহৎ বলা হবে না কেন? সুতরাং আমরা আস্তিকতা স্বীকার করেও তার চেয়ে নৈতিকতাকে মনুষ্যত্ব ও সমাজের জন্য ঢের বেশী প্রয়োজনীয় বিষয় বলে গণ্য করবো। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ইসলাম আল্লাহ্ ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী হলেও নৈতিকতা শিক্ষায় ততটা গুরুত্ব দেয়নি, যতটা গুরুত্ব দিয়েছে আল্লাহ্ ও রসুলকে। এর প্রমাণ জেহাদে উৎসাহ এবং জেহাদে প্রাপ্ত নারীসহ সব সম্পদ বৈধ বলে ঘোষণা করে ভোগের অধিকার দেওয়া। কোরআন জাগতিক ও পারলৌকিক, নগদ ও বাকী জৈবিক উপভোগের সুস্পষ্ট প্রলোভন মানুষকে দেখিয়েছে; ত্যাগের শিক্ষা দেয়নি। কিংবা সর্বজনীন নীতিবোধ শিক্ষা দেয়নি। সুতরাং বলা যায় ইসলাম মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে তেমন উৎসাহিত করে না, যতটা 'বিশ্বাসী' ও 'জেহাদী' হতে উদ্বুদ্ধ করে।

কোরআন বর্নিত 'জেহাদ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ না করে কিছু কিছু ধূর্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবী ওটির একটি আধ্যাত্মিক প্রলেপ দিয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা এটা বিলক্ষণ জানেন যে, 'জেহাদ' হচ্ছে ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রবিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে অমুসলমানকে হত্যা ও যে কোনভাবে পর্যুদস্ত করার দৈহিক যুদ্ধ, যদিও তাতে নিজেরও নিহত বা আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এবং কোরআনেও তার উল্লেখ আছে (৪: ৭৪, ৯৫; ৪৭: ৪; ৯: ২০,৪১ ইত্যাদি)। জেহাদে নিহত বিশ্বাসীর জন্য আছে সাথে সাথে সুন্দরী কুমারীর অঢেল ব্যবস্থা সমন্বিত জান্নাত। অতএব কামতাড়িত মুসলমানের জেহাদে ভয় নেই, আছে প্রবল আকর্ষণ। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় নবীর সময়ে যুদ্ধে তৎকালীন অস্ত্র তীর-ধনুক, বর্শা, ঢাল-তলোয়ারই ব্যবহৃত হতো। এখন যে বন্দুক-বোমা দিয়ে সেই যুদ্ধ ব্যাপকভাবে কিংবা আত্মঘাতী পন্থায় হচ্ছে সেটা নবীর কল্পনায়ও ছিল না। এবং মক্কা-মদীনা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়িয়ে তা যে পরে আর্ন্তজাতিক রূপ নেবে তাও তাঁর ধারণার

বাইরে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি পৃথিবীর সকল দেশের অস্তিত্বের কথাও জানতেন না। তাঁর সময়কার জেহাদের স্থান-কাল-পাত্র এত ব্যাপক ছিল না বলেই তিনি তখনকার মত চিন্তা করেছেন।

এখন আমরা 'জেহাদ'(যুদ্ধ অর্থে) এর সুদুরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো। এই বিচারে আমরা জেহাদের মোটামুটি চারটি কুপরিণতি দেখি ঃ —

এক) 'জেহাদ' এ পরাজিত অবিশ্বাসীদের (অমুসলমান) মধ্যে যারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে না, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে 'জিম্মী' হিসাবে মানবাধিকার বঞ্চিত এক লাঞ্ছিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

দুই) ঐ 'জেহাদে' অবিশ্বাসী যারা পরাজিত হলো না বা জয়ী হলো, তারা পরবর্তীকালে যে কোন সময় পুনরায় আক্রান্ত হবার আশংকায় সদা প্রস্তুত থাকতে বাধ্য। এই অবস্থাটা শান্তিময় উন্নয়নমুখী নিরুপদ্রব সমাজ জীবনের অনুকূল নয়।

তিন) 'জেহাদে' পরাজিত জনগোষ্ঠী (অমুসলমান) ইসলাম ধর্মগ্রহণের দ্বারা তাদের নিজস্ব জাতীয় চরিত্র, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাদের স্বকীয়তা বলে কিছুই না থাকায় তারা মক্কামুখী মানসিক দাসত্বে অভ্যস্ত হয়। ইতিহাসে এর উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশ।

চার) 'জেহাদ' হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উসকানি ছাড়াই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের সর্বাত্মক যুদ্ধ। আর যুদ্ধ সর্বদাই উভয় পক্ষের কম বেশী হতাহতের এবং তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অপূরণীয় ক্ষতির কারণ।

ধরেই নেওয়া যায়, কোরআন-হাদিসের সংস্কার না হলে বিশ্বের সকল মানুষ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত জেহাদের প্রক্রিয়া বা আশংকা অব্যাহত থাকবে। এবং উপরে বর্ণিত কুফলগুলি ঘটতে থাকবে। কিন্তু সেই অবস্থা মানব সভ্যতার জন্য কাম্য হতে পারে কি?

ইসলামে 'জেহাদ' যেমন হিংসাত্মক দৈহিক বিষয়, বেহেশ্‌তে হুরীদের সাথে মিলনের আনন্দটাও তেমনই জৈবিক। এবং নিশ্চয়ই ধর্ম বলতে যে পবিত্র সর্বজনীন ধারণা আমাদের মনে জাগে তার সাথে এই বিষয়গুলি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এ কথা সত্য যে, ইসলামের জন্ম হতে যে কোন উপায়েই হোক (প্রধানত শক্তি ও কৌশল) দ্রুত গতিতে তার প্রসার ঘটানো হয়েছে। কিন্তু যে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে প্রচার করা হয় এই প্রসারের দ্বারা সেই ইসলাম পৃথিবীতে শান্তির সৃষ্টি করতে পারেনি। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাদের ধর্মীয় দল পাকানো ও সন্ত্রাস বেড়েছে। তাতে মুসলমানদেরও প্রকৃতপক্ষে কোন কল্যাণ হয়নি। সুখের বিষয়, ইসলাম ধর্মের লোকদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এই সত্য স্বীকার করছেন ও বলছেন। যেমন- সালমন রুশদী, আনোয়ার শেখ, আলি সিনা, আবুল কাসেম, তসলিমা

নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ ইত্যাদি। বিশ্বমানবের (মুসলমানদেরও) কল্যাণে তথা বিশ্বশান্তির জন্য মুসলমানদের এই আত্মসমালোচনা একান্ত জরুরী। তাতে কোরআন, হাদিসের জেহাদ ইত্যাদি পরমত অসহিষ্ণু ও ভয়ংকর অনৈতিক তত্ত্বগুলি সেখান থেকে বাদ দিলে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে মিলনের পথ প্রশস্ত হয়। জেহাদ, দ্বি-জাতি তত্ত্ব ইত্যাদিকে কোন মতেই সুনীতি বলা যায় না। এবং যেহেতু অনৈতিকতা দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না (Crime does not pay) , সুতরাং ওগুলি বাদ দিতে বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

বিরাট এ ধরণীতে বিপুল মানব-ধারা প্রবহমান। তাদের ভাষায়, মানসিকতায়, সমাজে, সংস্কৃতিতে, খাদ্যাভ্যাসে, চেহারায় বৈচিত্র্য বর্তমান। সে ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট কোন আপত্তি লক্ষ করা যায় না। কিন্তু তাদের 'ধর্ম' বিষয়ে কোন বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় নয়। সর্বশক্তিমান ও নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির দাবিদার আল্লাহ্ পৃথিবীর সকল মানুষকে ধর্মের ব্যাপারে এক ছাঁচে ঢেলে 'বিশ্বাসী' বানাতে চেয়েছেন। তাঁর পক্ষে এ কাজটি করা সহজও ছিল। কারণ, তিনি 'হও' বললেই নিমিষে সব হয়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজে 'হও' মন্ত্র দ্বারা সব মানুষকে কেন 'বিশ্বাসী' অর্থাৎ মুসলমান বানালেন না বা এখনও বানাচ্ছেন না, তা বুঝা দুষ্কর।

এ ছাড়া যিনি 'রহমানুর রহিম' অর্থাৎ না চাইতেই যিনি অকৃপণ ভাবে কৃপা করেন, তিনি কেন মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত না করে একদল মানুষকে অনন্ত দোজখের ব্যবস্থা করেন বা কোন এক সময় বহুজনপদ নির্বিচারে ধ্বংস করেন, তার কোন যুক্তি সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর একান্ত অভিপ্রেত এ কাজটিকে রূপ দিতে বিশাল কোরআন মারফত দায়িত্ব দিয়েছেন রসুল মহম্মদকে এবং যে কোরআন দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর যাবৎ অবতীর্ণ করতে তাঁর জিব্রাইল ফেরেশ্‌তার ও মহম্মদের কম কষ্ট হয়নি। আর মহম্মদ তাঁর মৃত্যুকালে অনুসারীদের জন্য রেখে গেছেন কোরআন ও হাদিস। লক্ষ্য সেই একটি— পৃথিবীর সকল মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমান বানাও; সমগ্র মানব সমাজকে মক্কা তথা কাবা-মুখী করো। ফলে এ যাবৎ মুসলমান নামক পবিত্র জীবেরা (সকলে নয়) পৃথিবীতে রক্তপাত, নারী-ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, অপর জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস ইত্যাদি দ্বারা মানুষের যত নিগ্রহ করেছে আর কিছুর জন্যই তা হয়নি। অবশ্যই এসব হয়ে এসেছে ইসলাম ধর্মানুযায়ী কোরআন নির্দেশিত পথেই। কেননা 'বিশ্বাসী' হতে হলে কোরআন মানতে হবে এবং এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তাদের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। এ ব্যাপারে স্বামী

বিবেকানন্দের একটি বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন —

"অনেক মুসলমানই এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাদের মূল মন্ত্র ঃ আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ তাঁর একমাত্র রসুল। যা' কিছু এর বাইরে তা' কেবল খারাপই নয়, তা' সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিতে হবে। যদি কোন পুরুষ বা নারী এই মতবাদে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসী হয়; তবে নিমেষেই তাকে হত্যা করতে হবে। যা' কিছু তাদের উপাসনা পদ্ধতির বাইরে তার সবকিছুই অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। যে সকল গ্রন্থে অন্য মত প্রচারিত হয়েছে সেগুলো পুড়ে ফেলতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ শ' বছর ধরে পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। এই হচ্ছে মহম্মদের মতবাদ।" (অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত 'বিবেকানন্দের রচনা সংগ্রহ (ইংরেজী), মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণ, ১৯৭২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১২৬)

এখানে আধুনিক যুগের ভারতের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেরালার মালাবার অঞ্চলে মুসলমান মোপলা সম্প্রদায়ের বাস। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কংগ্রেস বহির্ভূত স্বাধীনতা পূর্ব মুসলমান নেতৃবৃন্দ, যেমন— মৌঃ মহম্মদ আলী, শওকৎ আলী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, আজাদ শোভানী, কবি আল্লামা ইকবাল প্রমুখ ইসলামী তত্ত্ববিদগণ ভারতকে 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ মুসলমানদের আবাসভূমি বানাবার জন্য 'খেলাফত আন্দোলন' শুরু করেন। মোপলারা এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২১-এর শেষ ভাগে সেখানকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে যে নারকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর লিখেছেন—

"হিন্দুরা মোপলাদের হাতে ভয়ানক ভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। পাইকারী হত্যা, জোর করে ধর্মান্তর করণ, মন্দির অপবিত্র করণ, নারী নির্যাতন, যেমন - বলাৎকার ও গর্ভবতী নারীর পেট চিরে ফেলা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ। এক কথায় সকল প্রকার ক্রূর ও সীমাহীন বর্বরতা যথেচ্ছ ভাবে মোপলারা হিন্দুদের উপর চালিয়েছিল এবং সেনাবাহিনী দ্রুত এসে দেশের ঐ দুর্গম বিস্তৃত অঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত তা থামেনি। এটা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছিল না। এটা ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা ভিত্তিক সর্বাত্মক ধ্বংসকাণ্ড। কত হিন্দু এতে হতাহত ও ধর্মান্তরিত হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে নিঃসন্দেহে ঐ সংখ্যাটি ছিল বিপুল।" (ডঃ আম্বেদকরের ইংরেজী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৬৩)

এই মোপলা অত্যাচার সম্পর্কে 'সারভ্যান্টস অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাদের দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়— ঐ ঘটনায় ১৫০০ হিন্দু নিহত হয়। বলপূর্বক মুসলমান বানানো হয় ২০,০০০ হিন্দুকে। নারী লাঞ্ছনা ও নারী

অপহরণের সংখ্যা অগণিত। তিন কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। ... কংগ্রেস সভাপতি এ্যানি বেসান্ত লিখেছেন ঃ

"They murdered and plundered abundantly and killed or drove away all Hindus who would not apostalize. Somewhere about a lakh people were driven from their homes with nothing but the clothes they had on, stripped of everything'..." ('মুসলিম শাসন ও ভারত বর্ষ', নিত্যরঞ্জন দাস, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ-১১৯)

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন— "...brave God-fearing Moplas who were fighting for what they consider as religion, and in a manner which they consider religious." অর্থাৎ সাহসী ও ধর্মভীরু মোপলারা তাদের বিবেচনায় ধর্মীয় পন্থায় ধর্মের জন্যই লড়াই করেছিলেন। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১২০; রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'History of the Freedom Movement in India', Vol. III, page-161, থেকে গৃহীত।) এতে বোঝা যায় মহাত্মা গান্ধীও মুসলমানদের হিংসার পন্থাটিকে কোরআনের নির্দেশ বলেই বুঝেছিলেন।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অমুসলমানদের মুসলমান বানাতে 'বিশ্বাসীরা' দু'টি পথ গ্রহণ করেছেন—

এক ঃ বল প্রয়োগ বা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পথ। উদাহরণ— রসূল মহম্মদ এবং বহু মুসলমান সামরিক ব্যক্তিত্ব, যেমন - খলিফা ওমর, আঃ মালেক, হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ, মহম্মদ-বিন-কাশেম, সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ ঘুরী, তৈমুর লঙ, বাবর, ঔরঙ্গজেব, নাদির শাহ্ হতে এ যুগের ওসামা বিন লাদেন।

দুই ঃ কৌশলের পথ। উদাহরণ - সে যুগের বহু পীর, ফকির, দরবেশ হতে এ যুগের নতুন টেকনিকের অনুসারী বর্ণচোরা মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ, যারা ইসলামের ভয়ঙ্কর রূপটাকে ঢেকে তাকে মনমোহিনী রূপে মানুষের সামনে উপস্থিত করেন। কথায় কথায় কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন— "ধর্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নেই, ..." (২: ২৫৬)। কিন্তু ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে অজস্রবার যে বল প্রয়োগের কথা আছে (৪: ৯৫; ৯: ৫ ইত্যাদি) সে কথা বেমালুম চেপে যান। নবী মহম্মদ যে ৮২ বার যুদ্ধ করেছেন তা কি ধর্ম প্রচারের জন্য নয়? তিনি যে কাবা শরীফের ৩৬০-টি মূর্তি নিজের হাতে ভেঙে ছিলেন, সেটা কি বলপ্রয়োগ বা ধর্ম প্রচারের অঙ্গ নয়?

ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলবী ও রাজনীতিবিদরা সুযোগ পেলেই 'সূরা আল কাফেরুন'-এর প্রসঙ্গ তোলেন। এর ৬ নং আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন— কোরআন নির্দেশ দিয়েছে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।" এর আগে আমরা একাধিক বার ডঃ ওসমান গনীর কথা উল্লেখ করেছি। তিনি

কোরআনের ১০৯:৬নং আয়াতটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইসলামে অন্য ধর্মের সাথে কোনরূপ বিরোধ নেই। যে যার ধর্ম পালন করুক শান্তিতে, যেহেতু ইসলাম শান্তির ধর্ম।" (ডঃ গনীর কোরানের বাংলা অনুবাদ, পৃ-৪৭৯) তাঁর এই ব্যাখ্যা সর্বৈব ভুল। এর আসল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কোলকাতার 'বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট' থেকে প্রকাশিত 'তরজমা-এ-কুরআন মজীদ'-এর (আগষ্ট,১৯৯০) ১২১২ থেকে ১২১৫ নং পৃষ্ঠায়, যেখানে বলা হয়েছে, "ইবনে আব্বাস বর্ণিত... কুরাইশদের লোকেরা নবী করিমকে বললো ঃ হে মহম্মদ, তুমি যদি আমাদের উপাস্য দেবতাগুলোকে চুম্বন কর, তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদত করবো। তখন এই 'কাফেরুন' সূরাটি নাযিল হয়েছিল (আবদ ইবন হুমাইজা)।

"...ধর্মীয় উদারতা বা সহ অবস্থান নীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়নি। এতে এ ধরনের কোন ভাবধারা আদৌ বর্তমান নেই। বর্তমান কালে কিছু কিছু লোক যে এ হতে এরূপ ভাবধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেবদেবী হতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা, অশ্রদ্ধা ও অনমনীয়তার চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। কুফরী ধর্ম ও দ্বীন ইসলাম যে পুরোমাত্রায় পরস্পরবিরোধী এ দুটোর কোন একটা দিক দিয়েও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, এ কথাটাও তেজস্বী ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল। ... কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মুলা পেশকারী 'সূরা' মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। ... কুফর ও কাফেরী আদর্শ ও রীতিনীতির প্রতি অসন্তোষ ও তার সঙ্গে চূড়ান্ত নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করা ইসলামের প্রতি ইমানের শাশ্বত দাবি। কোন ইমানদার ব্যক্তির পক্ষেই এ দাবি উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।" (পৃ- ১২১২-১২১৪)

দুঃখ হয় যখন দেখি সরকারের ভাড়া করা ২/৪ জন উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীও বই-পত্র এবং রেডিও-টিভিতে গনী সাহেবদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা আউরে যান। এদের বুদ্ধিজীবী না বলে দুর্বুদ্ধিজীবী বা অপজীবী বলাই ভালো।

তবে আশার কথা এই, গত পৌনে দু'শ বছরে বেশ কয়েকজন মনীষী সাহসের সঙ্গে ইসলামের আসল রূপটি জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন রাজা রামোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরোদ সি. চৌধুরীর মতো ভারতীয় মহান ব্যক্তিত্ব। এ ছাড়া বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আছেন স্যার উইলিয়াম ম্যূর, আনোয়ার শেখ, রোনাল্ড রেগান, মার্গারেট থ্যাচার, উইলিয়াম গ্লাডস্টোন, ডি. এস. মারগোলিয়াথ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিজীবী। সংক্ষেপে এঁদের মতামত জানতে হলে

পড়ুন ডঃ আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া', শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল', ২য় সংস্করণ, ২০০৫ এবং সুধীর পালের 'ইসলামের স্বরূপ'। প্রাপ্তিস্থান ঃ বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩।

উপরে বর্ণিত যে দু'টি পন্থায় ইসলামের প্রসার ঘটানো হয়েছে ও হচ্ছে তার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী সকলেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন। অবশ্য প্রজনন মারফত সংখ্যা বৃদ্ধিটা এ হিসেবের বাইরে। প্রায় সব মুসলমানই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, তারা প্রথমে মুসলমান, পরে অন্য কিছু। যদিও আমাদের দেশের মুসলমানদের মধ্যে ভাল একটি অংশ নিরীহ মানুষ এবং প্রকৃতপক্ষে মানবিক গুণসম্পন্ন। সাধারণত তারা কোরআন পড়েন না। আর পড়লেও অর্থ বা তাৎপর্য বোঝেন না, বা বুঝতে যান না। তাই তারা 'জেহাদ' বা ছলের মাধ্যমে ক্ষতিকর কোন কাজ কর্ম করার জন্য উৎসাহিত হন না। আর সে জন্যই মহম্মদের সময় হতে মধ্য যুগ পর্যন্ত মুসলমানরা আরব তথা মধ্য প্রাচ্য ও ভারত সহ অন্যত্র যা করেছে, তার পুনরাবৃত্তি এ যুগে তেমন একটা ঘটছে না। না হলে এ দেশেই কত যে বদর-ওহদ-খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকত কে জানে।

বস্তুতঃ ইসলাম সম্পর্কে বিশদ জানলে এবং তা মানলে 'মৌলবাদী' না হয়ে মানুষের অন্য কোন উপায় থাকে না। ঐ মৌলবাদীরা সুস্থ পরিবেশকে কত সহজে বিষাক্ত করে তুলতে পারে তার একটি উদাহরণ হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ঘটে যাওয়া 'ফরাজী' ও 'ওয়াহাবী' আন্দোলন। ফরাজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০) এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মীর নিসার আলী (১৭৮২-১৮৩১)। তৎকালীন বসিরহাট মহকুমার (পশ্চিমবঙ্গ) হায়দারপুর গ্রামের এই আলী সাহেব 'তিতুমীর' নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। এই দু'টো আন্দোলনের আগে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও শান্তিতেই বসবাস করছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত আন্দোলনের ফলে আগের শান্তি আর রইল না। অবিশ্বাস আর সন্দেহের আগুনে বিষাক্ত হয়ে উঠলো উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মন। এ বিষয় শ্রী (ডঃ) রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'নবরূপে তিতুমীর'-এর ৮০ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওয়াহাবি ও ফরাজী উভয় মৌলবাদী আন্দোলনই সম্প্রীতির পরিমণ্ডল দূষণ করে এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানদের অবশিষ্ট দেশবাসীর থেকে আলাদা করে দেয়।" শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন— "এইভাবে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রসারণশীল ও সংঘবদ্ধ হতে লাগলো। শতাব্দীর শুরুতে দুটি সম্প্রদায় এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতো; তিতুমীর শরিয়ৎ উল্লাদের পূর্ণ ইসলামায়নের আন্দোলনের ফলে দেখা গেল শতাব্দীর

শেষে তারাই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে একে অপরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে।" (পৃ. ৮২) এই গ্রন্থটিতে লেখক আরও অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন।

সমগ্র কোরআনে মানুষকে ভীতি ও প্রলোভন প্রদর্শন করে, উল্টা পাল্টা কথা বলে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, রহমানুর রহিম আল্লাহ্ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি যে, মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য, মহত্ব ও গভীর আধ্যাত্মিকতায় (?) আকৃষ্ট হয়ে সকলেই বিশ্বাসী হয়ে যাবে, মক্কা মুখী বা কেবলা মুখী হয়ে দিনে পাঁচবার নামায কায়েম করবে। তাই বিশ্বাসীদেরকে এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বানাবার উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন, যে কোন উপায়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। এখন মুসলমানরা অনৈতিক জেহাদ মারফতই হোক কিংবা ছল করেই হোক ইসলাম প্রসারে যে কোমর বেঁধে লেগেছে, সে জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না (যেমন মহাত্মা গান্ধী মোপলাদের দেননি)। কেননা তারা তো আল্লাহ্‌র নির্দ্দেশ পালন করেছে মাত্র। অতএব, এখন সময় এসেছে ভাববার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে, এসব নির্দ্দেশ মানবসমাজের জন্য কল্যাণকর কিনা। সময় এসেছে ধর্মগ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত করার। সময় এসেছে 'বিশ্বাসী' 'অবিশ্বাসী' হিসাবে মানুষকে ভাগ করে নয়, সকল মানুষকে মানুষ হিসেবেই প্রেমের বন্ধনে বাঁধবার। সময় এসেছে উপনিষদের সেই অমৃত বাণীকে (শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ) সকল ধর্ম শাস্ত্রের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে মান্যতা দেবার।

কিন্তু কোরআন ধর্মের নামে, সৃষ্টিকর্তার নামে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ দ্বারা মুসলমানদের নিরন্তর উদ্দীপিত করছে তা সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী বলেই তা মানুষের ধর্ম শাস্ত্র হতে পারে না।

"পৃথিবীতে দুটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে, অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র - সে হচ্ছে খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এজন্য তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য উপায় নেই।" কথাগুলো আমাদের বলা কথা নয়; বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের। দেখুন ঃ রবীন্দ্রনাথ, ৭ই আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, কালান্তর, বিশ্বভারতী, ২৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫ (১৯৮৪)।

আধুনিক বিশ্বে সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে বিশেষত ভারতে হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদির মধ্যে সম্প্রীতির প্রয়োজন সকলের কল্যাণ ও শান্তির জন্য তা সকলেই স্বীকার করবেন। হিন্দু, বৌদ্ধদের পক্ষে এ সম্প্রীতির কোন বাধা নেই। বাধা মুসলমানদের পক্ষে। আল্লাহ্, রসুল, কোরআন, হাদিস সর্বাংশে না মানলে মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। আর মানলে আমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য যত চিৎকার করি বা উদ্যোগ নেই তা বাস্তবায়িত হবে না, যদি কোরআন হাদিসের বর্তমান রূপ কিছু কিছু পরিবর্তিত না হয়। অপরিবর্তিত কোরআন হাদিস অনুসরণ করলে অমুসলমানদের প্রতি মুসলমানরা কী করে প্রীতিপরায়ণ হবে? আর প্রীতিপরায়ণ হলে

কী করে মুসলমান থাকবে? এই দুই পরস্পর বিরোধী অবস্থার কী করে অবসান হয় তার ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে মুসলমানরাই করুক। তা না হলে হিন্দু - মুসলমান সম্প্রীতি ও শান্তি 'সোনার পাথর বাটির' মত একটা অবাস্তব বিষয় হয়ে থাকবে।

অতীত অতীত হয়েছে। তখন কী উচিত ছিল আর কী উচিত ছিল না, এখন সে সব আলোচনা করে অতীতকে শোধরানো যাবে না। কিন্তু আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের জন্য অতীতকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাটা একান্ত জরুরী। এখানে একটা তিক্ত অথচ সত্য কথা বলি— কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলাম ধর্মকে সাম্যের ধর্ম বলে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের যে সব কথা প্রচার করেন, তা যে হিন্দুদের মুসলমান বানিয়ে ঐক্য সৃজনের একটা কৌশলমাত্র ও তাদের ভণ্ডামী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ বইতে আমরা কোরআনের নানা প্রকার অসংগতি, ভুলত্রুটি ইত্যাদি নিয়ে কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছি। মনগড়া কিছু বলিনি। প্রধানতঃ কোরআন, ইতিহাস এবং অনেক ক্ষেত্রে হাদিস থেকে প্রমাণ হাজির করেছি। এ সব অস্বীকার করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, কোরআন ও মহম্মদকে বাদ দিলে ইসলাম থাকে না। তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান কীসের উপর দাঁড়াবেন? অতএব, কোরআন ও মহম্মদ পরিত্যক্ত হোক, আমরা তা বলছি না। আমরা বলতে চাই, কোরআন ও মহম্মদের বাণী ও মতামতকে ত্রুটিমুক্ত করে যুগের উপযোগী, সহনশীল ও মানবিক করা হোক। কেননা হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। কাজেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী হিসাবে মানুষকে বিভক্ত ও হিংসা বিদ্বেষে দ্বন্দ্বমুখর না করে শুদ্ধ মানব প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হোক ইসলামকে। 'দারুল-ইসলাম' ও 'দারুল-হারব' তত্ত্ব, যা বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করা হোক। তাতে ভিন্ন ধর্মানুসারীদের সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সরকারের অধীনে বসবাস করতে কোন অসুবিধা থাকবে না।

আদি যুগে দেব-দেবী ভিত্তিক 'ধর্ম' স্বভাবতই ভয় ভীতি হতে গড়ে উঠেছিল। এবং ক্রমে তা পুষ্ট, পরিণত ও মার্জিত হয়েছে; তবুও তা মানুষকে নানা ভাবে বিভক্তই করেছে, সূক্ষ্মভাবে গোষ্ঠীস্বার্থকে কায়েম করার হাতিয়ার হয়েছে। প্রচলিত ধর্মগুলি বস্তুতঃ মানুষকে প্রেমের বন্ধনে একসূত্রে বাঁধতে পারেনি। তাই মনে হয়, ধর্ম সম্পর্কে আজকের জগতের ধর্মবেত্তা ও পণ্ডিতগণের নূতনভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা যতদূর জানি, হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদি ভারতীয় ধর্মগুলির ভেতর থেকে এরূপ সংস্কারের কোন বাধা নেই। এবং সংস্কার হয়েছেও। আরও পরিবর্তন দরকার। তা-ও হোক।

আমাদের সমালোচনা পড়ে মৌলবাদী মুসলমানরা এবং তথাকথিত মুসলিম

বুদ্ধিজীবীরা বলবেন, তোমরা ঠিক কথা বলোনি। কোরআনে অনেক ভাল ভাল কথা আছে। এদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কোরান-হাদিস না পড়া তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুরা কেউ কেউ হয়ত বলবেন, যেহেতু কোরান একটি ধর্মগ্রন্থ, তাই এতে ভাল কথা আছেই। হ্যা, কোরআনে কিছু সংখ্যক বিধান আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে বেশ ভাল বলেই মনে হবে। এর কয়েকটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে অন্য আরও কয়েকটি উল্লেখ করছি —

" ... এবং যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন।" (৯: ১০৮)

" ... এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।" (৯: ১১৯)

" ... নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ই।" (১৭: ৮১)

"... এইভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।" (৩৭: ১০৫)

"এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের গালি দিও না। ..." (৬: ১০৮)

"... নিশ্চয় সংযমীগণের আবাসস্থল কত উত্তম।" (১৬:৩০)

"... যারা ভাল কাজ করে তিনি তাদের ভাল ফল দেন।" (৫৩:৩১)

"... অপচয় করবে না।" (৬:১৪১; ৭:৩১) ইত্যাদি।

উপরোক্ত ভাল ভাল কথাগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করি। দেখি আদতেই ওগুলো নির্ভেজাল ভাল কথা কিনা। উদ্ধৃতিগুলোতে পবিত্র, সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, ভালকাজ, সংযমী ইত্যাদি যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা সকল ধর্মের মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। মনে রাখতে হবে 'পুতুল পূজারীরা অপবিত্র', 'অবিশ্বাসীরা সত্যকে অস্বীকার করে' এবং 'তারা নিঃসন্দেহে চিরকালের জন্য জাহান্নামের অগুনে জ্বলবে' এমন কথায় কোরআন পরিপূর্ণ। সুতরাং পবিত্র, সত্যবাদী, সংযমী, সৎকর্মশীল প্রভৃতি বলে শুধু ইসলামে বিশ্বাসীদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে তাতে কোন সংশয় নেই। অবিশ্বাসীরা ভাল হতেই পারে না, একথা কোরআনে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বোপরি -"ঐ গ্রন্থ (কোরআন) যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই; এ ধর্মভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও নামায কায়েম করে, ..." (২: ২-৩) — কোরআনের এই বাণী দ্বারাই তো নির্ধারিত হয়ে গেছে এ শুধু বিশ্বাসীদের জন্যই। কাজেই উক্ত ভাল কথাগুলো কি আসলেই ভাল? কোরআনের যত উপদেশ বা ভাল কথা তা সবই সর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ তা সকল মানুষের জন্য নয়। ওসব 'বিশ্বাসীদের' জন্য সংরক্ষিত। ইসলামের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসীরা কাফের, তারা ভাল হতেই পারে না।

যে মানুষ তার নিজের সকল সুবিধার জন্য খোলাখুলিভাবে বিশেষ ব্যবস্থার বিধান (কোরআন - ৮: ১; ৩৩: ৫০, ৫১, ৫৩) আল্লাহ্‌র বাণী বলে চালায় তাঁকে

কোটি কোটি মানুষের একটি সম্প্রদায় কী করে অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠতম রসুল বলে শ্রদ্ধা করে তা সত্যই বিস্ময়ের। অবশ্য তার একটা কারণ এ হতে পারে যে, কোরআনে যে প্রলোভন দেখানো হয়েছে, তা ভোগবাদী মানুষকে মোহগ্রস্ত না করে পারে না। কিন্তু সে মোহ কী করে ভাঙ্গবে?

"... যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের (মুসলমানদের) কমিবে, যখন বুঝিবে - যেকোন ধর্মই হউক, তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করিবার মতো এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং জগৎশুদ্ধ লোক মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।"

'বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা' প্রবন্ধে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যটি যত তিক্তই হোক, তা যে বাস্তব ও যথার্থ তা মানতেই হবে। কিন্তু একটা কথা শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি, তা হল ইসলামের ভেতরের মানুষদের কথা। অবশ্য একেবারেই তাদের কথা বলেননি তাও নয়। বলেছেন, তাদের বুঝার বিলম্বের কথা। এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই বলে "... ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।" কিন্তু আমরা এখন দেখছি দিঘীর তুলনায় ঝিনুক তুল্য হলেও মুসলমানদের ভেতর থেকেই কারো কারো চোখ খুলছে। যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, এ ভরসার কথাই।

এখানে একটি কথার পুনরুল্লেখ করতে চাই যে, কোরআনে আপাত মোলায়েম গোটা কয়েক আয়াত (২:২৫৬ ; ৪:১৭১; ৬:১০৮; ১০৯:৬) আছে, একথা সত্য। কিন্তু ওসব প্রকৃত পক্ষে হাতির বাইরের দাঁতের মতো শোভাবর্ধক মাত্র। ভাষান্তরে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধোঁকা দেওয়ার ছল। নবী তাঁর জীবনে ওগুলির কোন মূল্য দেননি এবং তাঁর অনুসারীরাও ওসবের মূল্য দিচ্ছেন না। তাঁরা রসুল বাস্তবে যা করেছেন ('সুন্নত') তা-ই পালন করে আসছেন বিগত ১৪০০ বছর ধরে। অপর পক্ষে উক্ত বিভ্রান্তকারী আয়াতগুলির চেয়ে বহুগুণ বেশী সংখ্যার পরধর্ম বিদ্বেষী ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক বিধান (আয়াত) কোরআনে বিদ্যমান, ('কোরআনে দ্বি-জাতি তত্ত্ব' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) যেগুলি নবী মহম্মদ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। হাদিসে এর অজস্র নজীর আছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এ যাবৎ মহম্মদের অনুসারীরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিধর্মীদের রক্তে বহুবার পৃথিবীকে রঞ্জিত করেছে, তাদের ধর্মান্তরিত করেছে, দাস-দাসী বানিয়েছে, মন্দির ভেঙ্গেছে, দেবমূর্তি ভেঙ্গেছে, তাদের নারীদের নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করেছে।

ইদানীং মুসলমান সমাজে দু'চারজন সৎ বুদ্ধিজীবী মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে ইসলামের এই বীভৎস রূপের কথা প্রকাশ করছেন। সেই ভরসার কথা উপরে উল্লেখ

করেছি। এই প্রশংসনীয় সত্য প্রকাশের পাশাপাশি হিন্দু সমাজে তথাকথিত কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি (সঠিক অর্থে দুর্বুদ্ধিজীবী) মূর্খের মতো কোরআনের ঐ কয়েকটি আপাত মধুর আয়াত নিয়ে তেনাদের সেকুলারিটি জাহির করছেন। এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাধার জন্য হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার কথা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করছেন। ধোঁকাবাজ মুসলমানদের সঙ্গে তালে তাল ঠুকে উক্ত হিন্দু সেকুলার মূর্খ-পণ্ডিতেরা কোরআনের লোক দেখানো শান্তির ললিত বাণী সম্বলিত উক্ত দু'একটি আয়াত আউড়িয়ে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে লেখায় ও বক্তৃতায় চমক সৃষ্টি করছেন। কিন্তু কোরআনের অজস্র হিংসাশ্রয়ী আয়াত, দারুল ইসলাম, দারুল হারব্ তত্ত্ব, আক্রমণাত্মক জেহাদ ও রক্তঝরানো ইসলামের ইতিহাসের প্রতি চোখ বুজে থাকেন। এর অনেক নজীর আছে। একটি উল্লেখ করছি।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ১ অক্টোবর, ২০০৫ তারিখে কলকাতার একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে এমনি একজন হিন্দু কু-বুদ্ধিজীবী কোরআন পড়েছেন বলে দাবি জানিয়ে বলেছেন—'কোরআনে অনেক ভাল ভাল কথা আছে, আবার কিছু খারাপ কথাও আছে। তবে 'অ্যাগ্রেশন' অর্থাৎ প্রথম আক্রমণের কথা নেই কোরআনে। কোরআনে পরিষ্কার করে বলা আছে— ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই'। তিনি আরও বলেছেন— নবী মহম্মদ শুধু ধর্মগুরু ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রপতিও ছিলেন। তাই শত্রুর সাথে তিনি যুদ্ধের ভাষায় কথা বলেছেন। যীশুখ্রীস্ট বা বুদ্ধদেবের ভাষায় কথা বলা সম্ভব ছিল না তাঁর। তবে তিনি ক্ষমার কথাও বলেছেন। বলেছেন, যদি পার শত্রুকে ক্ষমা কর। আল্লাহ্ খুশী হবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি হিন্দুদের মানসিকতার তীব্র নিন্দা করে বলেন, হিন্দুরা বড় সংকীর্ণ মনের । এই সংকীর্ণতা দূর করা না হলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র এর বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি কি নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের চেয়ে বেশী বোদ্ধা মনে করেন?

গভীর দুঃখের সাথে বলছি ঐ ইসলামপ্রেমী পণ্ডিত প্রবর জানেন না যে, বাংলাদেশে আজ যে সকল হিন্দু পাশবিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংকীর্ণতা নেই। তাছাড়া নবী বা আল্লাহ্ যিনিই কোরআন রচনা করে থাকুন, তিনি ভারতের হিন্দুদের সংকীর্ণতার কথা জেনে কোরআন রচনা করেননি। প্রতিমা পূজা ও আল্লাহ্-রসুলের অমান্যকারীদের নির্মূল করার জন্যই কোরআন এসেছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী মিঃ শাহরিয়ার কবির ঐ সেমিনারে স্পষ্টই বলেছেন—'বাংলাদেশের হিন্দুদের একমাত্র অপরাধ তারা হিন্দু'।

পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরের মানবতাবাদী শিক্ষক ৬.১০.২০০৫ তারিখের কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় তসলিমার প্রসঙ্গ টেনে একটি

নিবন্ধে লিখেছেন—"...তসলিমা তাঁর বইয়ে লিখেছেন, বিধর্মীদের হত্যা ও তাদের ধন-সম্পদ লুঠ করে মহম্মদ ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়েছেন। হ্যাঁ এটাই সত্য। ঐতিহাসিক সত্য। নির্মম সত্য। যারা বলে মহম্মদ শান্তির বাণী, সাম্যের বাণী ন্যায়ের বাণী প্রচার করে ধর্মের বিস্তার আর সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তারা সত্য বলতে ভয় পায়, তারা ভীতু ও কাপুরুষ। ..." আমরাও বলছি, এটাই সত্য। আগ্রহী পাঠকবৃন্দ ইন্টারনেটে 'গুগলী সার্চিং' করে 'প্রফেট অব ডুম' বইটি পড়লে বুঝতে পারবেন তসলিমা এবং গিয়াসুদ্দিন কত বড় সত্য কথা বলেছেন।

তাহলে পূর্বোক্ত হিন্দু মহাপণ্ডিতের অমন বিপরীত কথা বলার কারণ কী? অনেকে বলেন প্যান ইসলামিক শিবিরের রাশি রাশি টাকাই এ ধরনের অঘটন ঘটাচ্ছে। হায়, লোভ ও স্বার্থপরতা বড়ই সত্য আবৃতকারী!

ডঃ গনীর কোরআন অনুবাদের 'ভূমিকা' ও 'শুভেচ্ছাবাণী' লিখেছেন যথাক্রমে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী। ডঃ সেন লিখেছেন—'...ডঃ গনীর লেখনীর মূল সুরটাই বর্ণ-বিদ্বেষ, বংশ বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে অকৃত্রিম সংগ্রাম। পবিত্র কোরআনের মূল সুরটাও তাই। ...যে কোন পাঠক-পাঠিকা একবার পড়লেই বুঝবে ইসলাম কত উদার, এবং তার আবেদন ও অবদান কত অনুভূতিময় ও অনন্যসাধারণ। এক নিমিষে লক্ষ্য করলাম ডঃ গনীর জীবনে এটা একটি স্বর্ণখনি, পরম সত্যের চরম উপলব্ধি। ..." ডাঃ রায় চৌধুরী লিখেছেন—"...পবিত্র কোরআনের সর্বাপেক্ষা যেটি বড় অবদান ও বিশ্বজনীন আবেদন, তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মাঝে সংহতির বোধোদয় অনুপ্রেরণা দান। কোরআনের কথায় সংঘর্ষ অতি বড় ঘৃণিত বস্তু।"

ডঃ সেন ও ডাঃ রায় চৌধুরী উভয়েই প্রখ্যাত পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ ও দায়িত্বশীল। কিন্তু তাদের লেখাগুলিতে যে ভাবে ও ভাষায় ডঃ গনী, তাঁর অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ইসলাম ও কোরআনের নির্জলা মিথ্যা প্রশংসা করেছেন তাতে মোটেই মনে হয় না তাঁরা গ্রন্থখানি আদৌ ভালভাবে পড়েছেন। কোরআনের 'জেহাদ' ও 'কাফের' তত্ত্ব যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্যে নবী মহম্মদের যুদ্ধগুলি যে প্রচণ্ড হিংসা ছাড়া কিছু নয়, এসব কী করে পণ্ডিতদ্বয়ের চোখ এড়ালো তা বোঝা যায় না। ডঃ গনী মুসলমান বলে নবী, কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর নির্বিচার প্রশংসা ও অন্য ধর্ম বিশেষতঃ প্রতিমা পূজকদের নিন্দা করার কারণটা বোঝা যায়। (দেখুন 'মুখবন্ধ' পৃ-১৫-১৬, 'পূর্বাভাষ' পৃ-৪৬, ৪৯ ইত্যাদি এবং বহু টীকা)। কিন্তু ডঃ সেন ও ডাঃ রায় চৌধুরীর মিথ্যা প্রশংসা বাণীর কারণটা দুর্বোধ্য। অথবা এমনও হতে পারে যে, উক্ত লেখাগুলি তাঁদের নয়; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাতে তাঁরা স্বাক্ষর

করেছেন। এটাও ভাল কথা নয় মোটেই। তাঁরা যদি একবারও চিন্তা করতেন তাঁদের ঐ সব মন্তব্য মানুষের মনে কী ভয়ঙ্কর ভুল ধারণার সৃষ্টি করবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরিহিত পশ্চিমবঙ্গের ড. ওসমান গনী, কমরেড আজিজুল হক প্রমুখ কতিপয় বুদ্ধিজীবী ইসলামের ভয়ঙ্কর রূপটাকে ঢেকে নবী ও ইসলামকে উদার বলে নির্বোধ হিন্দুদের প্রতারিত করতে সদা সচেষ্ট। এ ব্যাপারে তথ্যমূলক চিঠির সংকলন (অটলবিহারী, তসলিম এবং ...) বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র থেকে (৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩) প্রকাশিত।

ড. ওসমান গনী তাঁর অনূদিত 'কোরান শরীফ'এর পূর্বাভাষ-এ (পৃ-৭৩) লিখেছেন, "স্যার উইলিয়াম ম্যুর তাঁর 'The Life of Mohammad' গ্রন্থের ২৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "আমরা মহানবীর নিকট হতে যে গ্রন্থ পেয়েছি, আজও তা অবিকৃত। .... আমাদের নিশ্চিত ধারণা কোরআনে প্রতিটি বাক্য অকৃত্রিম, বাস্তব।" এখানে ড. গনী নির্লজ্জের মত মিথ্যা কথা লিখেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম ম্যুর লিখিত 'The Life of Mahomet, 1st Edition 1861, 1st Indian Reprint, 1992, Published by Voice of India, New Delhi.] পড়লাম। কিন্তু ২৮ নং পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বাক্যগুলি খুঁজে পেলাম না। তবে এর ভূমিকার ফুট নোটে (Chapter-1, page- xiv) আছে —

"1. According to the orthodox doctrine, every syllable of the Koran is of divine origin, eternal and 'uncreate' as the Deity itself. Some of the earliest rhapsodies, indeed (as the 91st, 100th, 102nd & 103rd Suras or Chapters) do not seem to have been intended as revelations at all."। অর্থাৎ 'গোঁড়া মতানুসারীদের (মুসলমান) মতে কোরানের প্রতিটি অক্ষর অকৃত্রিম স্বর্গীয় চিরন্তন এবং আল্লাহ্‌র মতই স্বয়ম্ভু। বস্তুত প্রথম দিকের কিছু রচনা (যেমন ৯১, ১০০ এবং ১০২, ১০৩ নং সূরাগুলি) আল্লাহ্‌র বাণী বলে মোটেই মনে হয় না।'

ধীমান পাঠক, লক্ষ করুন, ম্যুর সাহেবের লেখাকে কী চাতুর্যের সাথে বিকৃত করা হয়েছে। ম্যুর সাহেব তাঁর গ্রন্থের ৫২২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "The sword of Mohammad, and the Koran, are the most stubborn enemies of Civilisation, Liberty & Truth which the world has yet known." অর্থাৎ 'এ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জানামতে মহম্মদ ও কোরানের তরবারি হচ্ছে সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের প্রচণ্ডতম শত্রু।' ইসলামের মুখোশ উন্মোচনকারী এই ম্যুর সাহেবের লেখাকে বিকৃত করে ড.গনী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ম্যুর সাহেব ইসলামের প্রশংসা করেছেন। এই ড. সাহেবের একখানি কিতাবের নাম 'চরিত্র ও সমাজ গঠনে হযরত

মহম্মদ'। তাতে ভূরি ভূরি মিথ্যা ও স্ব-বিরোধী কথা আছে। ২২৭ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'বেহেশতে যখন কোন পুরুষ (অবশ্যই মুসলমান) স্ত্রীলোকের সঙ্গ পছন্দ করবে, তখনই সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে।' বিনা পয়সায় যৌন তৃপ্তি লাভের এমন ঢালাও ব্যবস্থা করেই কি মহম্মদ মানুষের চরিত্র গঠন করতে চেয়েছেন?

গনী সাহেবের মত আরও অনেক ইসলামপ্রেমী বুদ্ধিজীবী নিঃসঙ্কোচে ডাহা মিথ্যা কথা বলে চলেছেন। একটি উদাহরণ— ইন্টারনেটে www.submission.org নামে একটি ওয়েব সাইটে প্রচারিত 'Terrorism and Islam' নামের একটি নিবন্ধে কোরআনের ৫ নং সূরার ৮৭ নং আয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে এ ভাবে — " .... and do not aggress; God dislikes the aggressors. ....." অর্থাৎ 'প্রথমে আক্রমণ করো না। আল্লাহ্ প্রথম আক্রমণকারীদের পছন্দ করেন না।' অথচ এম.এম. পিকথল অনূদিত কোরানে 'aggress' শব্দটিই নেই। ওখানে আছে 'Transggress'। এর অর্থ সীমা লঙঘন করা। মাওলানা মোবারক করীম জওহর উক্ত আয়াতটির বঙ্গানুবাদ করেছেন এ ভাবে — 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না, সীমালঙঘনকারীকে আল্লাহ্ মোটেই ভালবাসেন না। (৫:৮৭)

সুধী পাঠকগণ, এই সব কু-বুদ্ধিজীবীদের ধূর্তামিটা দেখলেন তো?

বিখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর পিতা প্রয়াত সাহিত্যিক মণীষ ঘটক 'বর্তিকা' সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর প্রকাশনা ও সম্পাদনায় এই 'বর্তিকা' পত্রিকার 'মুসলিম সমাজভাবনা' নামে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ একটি বিশেষ সংকলন সংখ্যা বেরিয়েছে। অধিকাংশ বিশেষত প্রথম দিকের লেখাগুলিতে একতরফা ইসলাম ধর্মের গুণগানে ভরপুর। কোরআন ও হাদিসে যে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম বিদ্বেষের অজস্র বাক্য আছে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই লেখাগুলিতে। সব মুসলমান লেখকের এ এক সুচতুর কৌশল। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদকীয়তে যা লিখেছেন তা উক্ত নিবন্ধগুলির সাথে সম্পর্কহীন। একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'কয়েকটি হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে দেখলাম, জানলাম। চমৎকারভাবে এঁরা সমাজদেহে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন।' মহাশ্বেতা দেবীকে শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, তিনি ভুল দেখেছেন ও বুঝেছেন। হিন্দু-মুসলমান বিয়েগুলির শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা হিন্দু এবং বিয়েটা হয় ইসলাম ধর্ম মতে। তা না হলে মুসলমান সমাজ ও ধর্ম তা গ্রহণ করে না। এবং ঐ বিয়েগুলি হিন্দু সমাজও গ্রহণ করে না।

এপর্যন্ত অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান বিয়ে দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সাধারণ সমাজ গড়েনি। উভয় সমাজের ঐক্য হয়নি, ব্যবধানও ঘোচেনি। মহাশ্বেতা দেবী কোরআন পড়লে মুসলিম তোষণের পথে যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখছেন ও দেখাচ্ছেন তা করতেন

না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ সহ পৃথিবীর বহু মনীর্ষী এরূপ অবাস্তব স্বপ্ন দেখেননি। বোধ করি তিনি সে লেখাগুলির সাথেও পরিচিত নন। আর পরিচিত হলেও হয়ত কোন কারণে এসব এড়িয়ে যাচ্ছেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবী (?) কারো কারো মনে এরূপ অযৌক্তিক ও বুদ্ধিহীন ইসলাম তোষণের কারণ কি কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা অর্থলোভ নাকি ইসলামী সন্ত্রাস, তা সংশয়ের বিষয়। নবী, কোরআন ও ইসলামের স্তাবক এই সব আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, ডঃ আম্বেদকর, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ দেশী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু বিদেশী মণীষীদের ঐ একই বিষয়ে মন্তব্য স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়।

খলিফা ওসমানের সময় সংকলনকালে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোরআনের যে পরিবর্তনই হোক, কিন্তু তারপর কোরআন পরিবর্তিত হয়নি, এ কথা মেনেই এটা বলা যায় যে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের শত শত মণীষী ও সাধক, যথা— সর্ব ইমাম হানিফা, শফি, মালেক, হাম্বল,গাজ্জালী ও সাধক জালালুদ্দীন রুমী, হোসেন বসোরী, আবদুল কাদের জিলানী, মনসুর হাল্লাজ, মইনুদ্দিন চিশ্‌তী ইত্যাদি ইসলামকে কোরআন হাদিসেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাকে নানা ব্যাখ্যায় ও ভাবনায় সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। এতে মনে হয় মহম্মদের কালের ইসলাম উক্ত মণীষীদের মহৎ চিন্তা চেতনাযুক্ত হয়ে হয়ত একটা আধ্যাত্মিক মাত্রা ও ব্যাপকতা পেয়েছে।

মহম্মদ সম্পর্কে বলা যায়, বাস্তবে মহম্মদ যা ছিলেন চৌদ্দশ' বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন আর তিনি তা নেই। তাঁর অনুগামীদের কল্পনায়, বিশ্বাসে ও প্রচারণায় তিনি ক্রমে মহত্তর ও উজ্জলতর হয়েছেন। নানা অলৌকিকতাও তার সাথে যুক্ত হয়েছে। স্বভাবতই সৃজনশীল অনুসারীরা নিজেদের মনের মাধুরী মিশায়ে তাকে তুলনাহীন ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন। বহু লোক-গাথায় এর নজীর দেখা যায়।

আল্লাহ্‌র অবস্থাও সেভাবেই হয়ত কিছুটা পরিবর্তিত। কোরআনে বর্ণিত তাঁর কঠোরতা বোধ করি সুফি ইত্যাদি ভাবুকদের দ্বারা কিছুটা কোমলতা প্রাপ্ত হয়ে প্রেমময় হয়ে উঠেছে।

মনে রাখতে হবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে এখন যে সব সম্প্রদায়, উপ-সম্প্রদায় বা বিভিন্ন দল ইত্যাদি দেখছি তা নবী মহম্মদের জীবনকালে থাকার কথা নয়, ছিলও না। এগুলি ক্রমে পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছে। এই মাযহাব, সম্প্রদায়, তরিকা, সিলসিলাহ্‌ ইত্যাদি ইসলামের ভেতরকার ভাগগুলি ইসলাম অনুসারী বিভিন্ন সাধক বা ধর্মবেত্তা ব্যাখ্যাকারদের দ্বারা প্রবর্তিত। কিন্তু এই ভাগগুলির সবই ধর্মীয় তত্ত্বানুসারে হয়নি। দু'চারটি হয়েছে একান্তই রাজনৈতিক বা দলীয় কারণে। যেমন—শিয়া, সুন্নী, খারেজী প্রভৃতি।

'খলিফা' অর্থাৎ নবী মহম্মদের মৃত্যুর পর সর্ববিষয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এই নিয়ে মতভেদ শুরু হয়। মুসলমান যারা মহম্মদের স্থলে ইসলাম ধর্মীয় ও

রাষ্ট্রনেতা হিসাবে আবু বক্করকে খলিফা নির্বাচন করে তারাই 'সুন্নী'। আর যারা এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে মহম্মদের জেঠতুতো ভাই ও কন্যা ফাতেমার স্বামী আলীকে খলিফা বানাতে চেয়েছিল তারাই হল 'শিয়া' সম্প্রদায়। যাহোক, চতুর্থ খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর আলী তৎকালীন সিরিয়ার শাসনকর্তা মাবিয়া (মহম্মদের একজন প্রধান শিষ্য ও সহচর) ও খলিফা আলীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তখন এই বিরোধের মীমাংসায় একটি চাতুর্যপূর্ণ সালিশী হয়। এই সালিশীর বিরুদ্ধে শিয়াদের মধ্য হতে একদল লোক বিদ্রোহী হয়। এরাই 'খারেজী' সম্প্রদায়। এবং এই খারেজীদের একজনই খলিফা আলীকে নামায পড়ার সময় ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মহম্মদ পরবর্তী ইসলামের প্রাথমিক স্তরের ভাগগুলির ভিত্তি কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ছিল না। ছিল নেহাতই দলীয় কারণ। কিন্তু দীর্ঘকালের অমোঘ নিয়মে ইসলামের পরিবর্তন যাই হোক, তবু তার মূলনীতির পরিবর্তন হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইসলামের সেই পরধর্ম অস্বীকার, ঘৃণা ও তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ইসলামী কট্টর পন্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েই চলেছে।

ইদানীং ইন্টারনেটে বিভিন্ন ব্যক্তির ইসলামের বিপক্ষে (www.faith-freedom.org) ও সপক্ষে (www.islam.org & www.submission.org) অনেক রচনা পাওয়া যাচ্ছে। বিপক্ষে যারা লিখছেন, তারা কোরআন হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই লিখছেন এবং তাঁদের ব্যাখ্যায় কোন অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং তাঁদের সিদ্ধান্তকে যুক্তিবাদী কোন লোক উড়িয়ে দিতে পারেন না। তাঁরা বলছেন, ইসলামে পরধর্ম বিদ্বেষ আছে, যুদ্ধের মারফত ধর্ম বিস্তারের নির্দেশ আছে। কোরআনে বেহেশ্তের বর্ণনায় পবিত্র আত্মিক কোন কথা নেই, আছে নারীদেহ ভোগের কামনা উদ্রেককারী লোভনীয় বর্ণনা। কোরআন, হাদিসে নারী স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। বরং তাদের অবস্থা অত্যন্ত হীন ও অপমানের। এ সবই সত্য। প্রমাণিত সত্য।

অপরপক্ষে ইসলামের ঔদার্য, মহত্ত্ব ও অভ্রান্ততার সপক্ষে যাঁরা লিখছেন তাঁরাও কোরআন হাদিস থেকেই উদ্ধৃত করে লিখছেন। কোরআন-হাদিসে ভাল কথা নেই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু 'জেহাদের' ব্যাখ্যাটা যদি এমনভাবে করা হয় যে, ওটা মানুষের অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সৎপ্রবৃত্তির যুদ্ধ কিংবা মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ অথবা অন্যায়কারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ, তাহলে সেটা শুনতে যতই চমৎকার শোনাক কোরআনের নির্দেশের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। তেমনি কোরআন নির্দেশিত এক-তরফাভাবে পুরুষের তালাক ও স্ত্রীকে পেটানোর কিংবা চার বিয়ের অনুমতি সহ দাসী উপভোগের অধিকারের পাশাপাশি নারীদের বোরখা পরিয়ে সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্ত রাখার যুক্তিটাও গ্রহণযোগ্য হয় না।

যাহোক, আমরা উপরোক্ত পক্ষদ্বয়ের বক্তব্যের সত্যতা একেবারে অস্বীকার করি

না। কোরআনের পক্ষ সমর্থনকারীদের বক্তব্য মেনেই বলছি, হ্যাঁ, ভাল কথা কিছু কোরআনে আছে। কিন্তু খারাপ কথা যে বহুগুণে বেশী আছে, তা-ও তো অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কোরআনে স্ব-বিরোধী কথা প্রচুর আছে। আমরা সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে তা দেখিয়েছি। উপরে পরস্পর বিরোধী কোরআন ভিত্তিক আলোচনাকারী যে দু'টি পক্ষের উল্লেখ করেছি, তাঁরা একে অন্যের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার না করলেও আমরা উভয় পক্ষের কথার সত্যতা সীমিতভাবে স্বীকার করছি। তাতে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, কোরআনে মানবতাবিরোধী জাতি-বিদ্বেষ, মূলক ও অন্যান্য খারাপ কথা প্রচুর আছে। এবং ভাল কথা যে ক'টি আছে তা খারাপ কথাগুলিকে বাতিল করতে পারছে না। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাল কথার চেয়ে খারাপ কথাই ইসলাম অনুরাগীরা পালন করতে বেশী উৎসাহী। এবং তাদের দিক থেকে এটাই যুক্তিগ্রাহ্য।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত ২৬/১০/২০০৬ তারিখের একটি লেখায় জনৈক রায়হান (website_ahumand @ yahoo.com) মানুষ বিশেষত অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য কোরআনের কিছু আয়াত ভুলভালভাবে উদ্ধৃত করেছেন। কোরআনে মানবতাবাদ আছে একথার সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— **"I have not created Jinn & humankind except to serve *my creation.*"** (51:56) অথচ Pickthall সাহেব আয়াতটি অনুবাদ করেছেন— **"I created the Jinn & humankind only that they might worship me."** এবং ড. গণীর বাংলা অনুবাদে— "*আমার দাসত্বের জন্যই* আমি মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি।" (৫১:৫৬)

ইসলামে শান্তিবাদ প্রমাণ করার জন্য রায়হান সাহেব কোরআনের ৩নং সূরার ৮৫নং আয়াতের 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ করেছেন, Peace বা শান্তি। কিন্তু Pickthallএর অনুবাদে 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে— 'Surrender to Allah' যার বাংলা—'আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ'। অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা বাহুল্য। এতেই বোঝা যায় রায়হান সাহেব বা তাঁর মত কিছু শিক্ষিত মুসলমান, কোরআনকে তাঁদের ইচ্ছামত ব্যবহার করছেন। মানুষকে ধোঁকা দেওয়াই তাঁদের উদেশ্য।

লক্ষ করা গেছে বেশির ভাগ মুসলমান বুদ্ধিজীবী অন্তত ইদানীং একটি মোক্ষম রণকৌশল বের করেছেন। হিন্দু ধর্মের অহিংসা, ঔদার্য ও পরমত সহিষ্ণুতা (যেমন 'যত মত তত পথ') ইত্যাদির খুব প্রশংসা করছেন। অপরপক্ষে কোরআনের হিংসাত্মক কথাগুলি চেপে যাচ্ছেন এবং সামান্য যে দু'একটি ভাল কথা সেখানে আছে সেগুলি খুব জোর দিয়ে প্রচার করছেন। 'জেহাদ' এই ভয়ঙ্কর শব্দটির আধ্যাত্মিক ও মন গলানো মিথ্যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ফলে কোরআন সম্পর্কে অজ্ঞ নির্বোধ হিন্দুরা

(বুদ্ধিজীবী সহ) তাদের কথায় উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছে। যার প্রমাণ প্রাবন্ধিক, কবি, সাহিত্যিক নামধারী কেউ কেউ, এমনকি স্বর্গের বিকল্প 'রামকৃষ্ণ লোকে'র উদ্ভাবক রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণের দু'চার জনও। উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আমন্ত্রিত হয়ে জনা দুয়েক ডক্টর উপাধিধারী বিখ্যাত মুসলিম বুদ্ধিজীবী সেখানে গিয়ে খুব গালভরা বক্তব্য রাখেন। কিন্তু তাদের আসল রূপটা মিশন ধরতে পারে না। মিশন তাদের মুখপত্র 'উদ্বোধন' জুলাই ২০০৮ সপ্তম সংখ্যায় 'উদার সুরে জগৎ জুড়ে আনন্দ গান বাজে' শীর্ষক বুদ্ধিহীন ও আবেগ সর্বস্ব প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই সব সেকুলার সুধীবৃন্দকে সবিনয়ে স্মরণ করানো যেতে পারে যে, স্বর্গই হোক আর রামকৃষ্ণ লোকই হোক ইসলামের বিধানে তাঁরা তো দূরের কথা বরিষ্ঠ অবতার রামকৃষ্ণদেব কিংবা তার শ্রেষ্ঠতম শিষ্য বিবেকানন্দ পর্যন্ত বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। অমুসলমান সকলের জন্য রয়েছে দোজখের আগুন। কোরআন পড়ে দেখুন, এ বিষয়ে অজস্র আয়াতের কয়েকটি - ২:৭, ২৪, ৩৯, ১০৪, ১৬১, ১৬২।

অহিংসা নীতির বুদ্ধিহীন অনুসারীরা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর ইত্যাদি প্রাণীর মত পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে, যদি না তাঁরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করে। এই সত্যটা বৈষ্ণব পন্থী হিন্দুগণ যেন মনে রাখেন যে, তাঁদের বৈষ্ণবীয় অহিংসা কোরানের জেহাদের পথকে সুগমই করবে।

আমরা কোরআনের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি, তাই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করি। যুক্তি যাঁরা মানেন, তাঁরা মুক্ত মন নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হলে আমাদের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যাঁরা যুক্তি মানেন না, তাঁদের কাছে সবই ব্যর্থ। কথায় বলে - 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।' আমি যেমন দেখেছি অনেকেই তেমন জানেন যে, অধিকাংশ লোক কোন কোন বিষয়ে কিছুতেই যুক্তি বা সত্যকে স্বীকার করে না, পূর্ব ধারণা বা বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েই থাকে। হযরত মহম্মদের যুগেও তারা ছিল। তিনিও তা জানতেন। কোরআনেও সে কথার স্বীকৃতি বহুবার আছে (২:৬; ৭:১৭৯ ইত্যাদি)। একটা মিথ্যা ধারণা যদি মানুষের মনে বহুকাল ধরে প্রোথিতমূল হয়ে থাকে তবে তা উৎপাটিত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা পৃথিবীর কঠিনতম কাজের একটি। সাহসের কাজ তো বটেই। পূর্বেও বহু মনীষী ও সাহসী যুক্তিবাদী যে কাজটি করেছেন ও এখনও করছেন, আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি সামান্য সাধ্য নিয়ে তাঁদের সে সাধু প্রচেষ্টার প্রবাহে আমার শক্তির ক্ষীণ ধারাটি যুক্ত করলাম এই কারণে, যদি এতে সে প্রবাহের বিন্দুমাত্র বেগ বাড়ে, মানুষের সত্য গ্রহণে দ্বিধা ও সংশয় দূর হয় এবং তার ফলে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও দলীয় মনোভাব অপসারিত হয়ে ঔদার্য ও মানবিকতা জন্মে, শান্তি নিশ্চিত হয়, মানুষ মানুষকে ভালবাসে। তথাকথিত ধর্ম সে ভালবাসার পথে অন্তরায় না হয়।

এই বইটিতে নবী মহম্মদ ও কোরআনের কয়েকটি দিক নিয়ে সামান্যই আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য নবী ও কোরআনের স্বরূপ অনুসন্ধান করা। নবী মহম্মদ এই কোরআনের মাধ্যমে যাই কিছু বলুন তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের সকল সত্তাকে গৌণ করে কেবল একটি মাত্র সত্তাকে (বিশ্বাসী বা মুসলমান) প্রধান করা। এবং তার দ্বারা পৃথিবীর সব মানুষকে মক্কা-মুখী করে নিজেকে ও আরব জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে 'মানুষ' একটি প্রজাতি। সেটাই তার প্রকৃতিদত্ত মূল পরিচয় বা সত্তা। কিন্তু সে সত্তাকে ভুলিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন একটা মতবাদের আওতায় এনে মানুষের একটা ভিন্ন সত্তাকে মুখ্য করে তুললে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও হিংসার সৃষ্টি হবেই। নবী মহম্মদ কোরআনের মাধ্যমে এই অনুচিত কাজটি করেছেন। এই ভয়ঙ্কর সত্যটা ঐতিহাসিক।

৩.৮.২০০৬ তারিখে কোলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকায় (পৃ-৪) নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের একটি সাক্ষাৎকারের শেষ অংশ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তাঁর নূতন বই 'আইডেন্টিটি এণ্ড ভায়োলেন্স'-এ একথাটাই বলেছেন—'আমাদের প্রত্যেকের অনেক সত্তা আছে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটিকে ভুলে গেলে হিংস্রতাই প্রকাশ পায়।' তিনি আরও বলেছেন— 'কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে যারা বলেছেন ইসলাম কেবল শান্তির শিক্ষা দেয়, তারাও কম অতিসরলীকরণ করছেন না। ...বিভিন্ন সত্তার স্বীকৃতি, বিভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা, বিভিন্ন সত্তার মধ্যে চয়নের অধিকার এবং দায়িত্ব - এ বিষয়ে গভীর ও স্বচ্ছ চিন্তা বিশেষ জরুরী। হিংসার অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাতেও তা সহায়ক হতে পারে।'

আমরাও বলি— মানুষের ধর্মীয় সত্তাকে (বিশ্বাসী) প্রাধান্য না দিয়ে মনুষ্যত্ব সহ অন্যান্য সত্তাকেও স্বীকৃতি দেওয়ার শিক্ষাটা ইসলামে আনলে অবিশ্বাসীদের প্রতি হিংসা দূর হয়। তাতে সকল মানুষের সাথে সহাবস্থান সহজ হয়ে শান্তির পথ সুগম হয়।

মানুষ যারা ইসলামে বিশ্বাসী তাদের মধ্যে জেহাদে শহীদগণ সরাসরি বেহেশ্‌তে যাবে। অন্যান্য বিশ্বাসীদের কেয়ামতে বিচার হবে। তারা পাপের পরিমাণ অনুযায়ী দোজখ ভোগ করে অনন্তকালের জন্য বেহেশ্‌তবাসী হবে। ইসলামে অবিশ্বাসীদের বিচার হয়েই আছে। তারা সৎ অসৎ নির্বিশেষে অনন্তকালের জন্য দোজখে যাবে। কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র এই ব্যবস্থা কি যৌক্তিক?

আমরা বর্তমান পুস্তকের ৪০টি পরিচ্ছেদে কোরআনের বক্তব্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, কোরআন প্রধানতঃ হিংসাশ্রয়ী, অবৈজ্ঞানিক, দলীয় প্রচারণামূলক, অযৌক্তিক, স্ব-বিরোধী, অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টিকারী, অনৈতিক, ভোগবাদী, খাপছাড়া কথায় ভারাক্রান্ত, পুনরাবৃত্তিতে নিরস এক

পুস্তক। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে সকল মুসলমানের নিকট গ্রন্থটি কেন এত পবিত্র বলে মান্য তার বোধগম্য কারণ একটাই। এবং তা হচ্ছে, এতে পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট ভাষায় চোর, ডাকাত, লম্পট নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য নিশ্চিতভাবে বেহেশ্‌তের লোভ দেখান হয়েছে, যে বেহেশ্‌তে অনন্তকালের জন্য থাকবে অপরূপা চিরযৌবনা কুমারী অজস্র শয্যাসঙ্গিনী, উত্তম সুরা, সুস্বাদু খাদ্য ও মনোহর পোষাকের অফুরন্ত ব্যবস্থা। সেখানে নারী সম্ভোগে কোন বাধা নেই। কোন ক্লান্তি নেই। যৌবন চিরস্থায়ী। যৌনক্রীড়া ও খাওয়া-পরা ছাড়া কোন কর্মই নেই সেখানে। যৌনসম্ভোগের লালমুলো নাকের ডগায় এবং ইসলাম ত্যাগের শাস্তির খাঁড়া ঘাড়ের উপর ঝুলিয়ে মহম্মদ ইসলামের পথ প্রশস্ত করেছেন।

নবী মহম্মদ লোকচরিত্র বিশেষতঃ আরবদের দেহ-মনের চাহিদাটা ভালভাবে বোঝার মত যথেষ্ট বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। আর কোরআন যে আরবদের জন্যই রচিত সে কথা তো কোরআনেই আছে। আমরা এ বইয়ের ১২নং পরিচ্ছেদে তার প্রমাণ দিয়েছি।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতাবাদী অনেকের মতে যে গ্রন্থ মানুষকে 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' হিসেবে বিভক্ত করে ধর্ম প্রচারের জন্যই বিশ্বাসী পক্ষকে অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা ও লাঞ্ছনার উপদেশ দেয় তা ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না। বরং যাদুঘরেই তার স্থান হওয়া উচিত। যে কোন যুক্তিবাদী মানুষই এই মতকে সমর্থন করবেন।

কোরআন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আরো অনেক কথা আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে সব উল্লেখ করা গেল না। তবে সর্বোপরি যে ছোট্ট কথাটি চিন্তায় এসেছে, তা বলে উপসংহারের উপসংহার টানছি। কথাটি অনারব মুসলমান, বিশেষত যে সকল মুসলমান আরবী ভাষায় কোরআন পড়তেই পারেন না বা পড়লেও অর্থ বোঝেন না কিংবা সামান্যই বোঝেন, তাঁদের নিকট আমরা কোরআন নিয়ে এ পুস্তকে যে সকল অসঙ্গতি, ভুল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি তা কোন দিনই ধরা পড়েনি বা পড়তোও না। আর আরবী জানা মুসলমানদের কাছে ধরা পড়লেও অন্ধভক্তি, ভয় বা অন্য কোন কারণেই হোক তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি বরং চেপে গেছে। কিন্তু আজ দিন বদলেছে। অনারবদের অনেকের মাতৃভাষায় কোরআনের অনুবাদ হয়েছে। ফলে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় কোরআন পড়ার ও বোঝার সুযোগ পাচ্ছেন। এবং মহা কোরআনের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ বোধ করি এর ঐশী বাণীর দাবিকে দূরে সরিয়ে সংস্কারের দাবিকে উৎসাহিত করছে।

—)০(—

যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

বাংলা

১। সত্যের সন্ধান - আরজ আলি মাতুব্বর। প্রকাশনায় : বাংলাদেশ লেখক শিবির, যুক্তরাজ্য শাখা।

২। হ্যাণ্ড বুক অব 'ইসলামের ইতিহাস', অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন আলী, এম.এ.এল.এল.বি।

৩। বিশ্ব-নবী, গোলাম মোস্তফা।

৪। মোস্তফা চরিত, মো: আকরাম খাঁ।

৫। মকছুদোল মোমেনীন বা বেহেশতের কুঞ্জী, আলহাজ্ব কাজী মাওলানা মো. গোলাম রহমান।

৬। বঙ্গানুবাদ কুরআন শারীফ, মাওলানা মোবারক করীম জওহর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

৭। কোরআন শরীফ (বাংলা অনুবাদ), ড. ওসমান গনী।

৮। মুরতাদের শাস্তি, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী।

৯। তরজমা-এ কুরআন মজীদ, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা।

১০। ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নতুন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।

১১। শেষ প্রশ্ন, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২। শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব), ঐ।

১৩। নারীর মূল্য, ঐ।

১৪। বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঐ।

১৫। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা (প্রবন্ধ), বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৬। কেন উদ্বাস্তু হতে হল, শ্রীদেবজ্যোতি রায়।

১৭। নবরূপে তীতুমীর, ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়।

১৮। মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ, নিত্যরঞ্জন দাস।

১৯। অটলবিহারী, তসলিমা এবং .. (১৪-টি চিঠির সংকলন), শ্রীমতি দীপা বিশ্বাস সংকলিত ও সম্পাদিত।

২০। ইসলামের স্বরূপ, সুধীর পাল।

English

1. The Meaning of the Glorious Koran by M.M.Pickthall
2. Sahi Al Bukhari, Vol. IV by Dr. Muhammad Muhasin Khan.
3. The Life of Mahomet by Sir Willium Muir, 1st Indian Re-Print, 1992.
4. Writings and Speeches of Dr. B.R.Ambedkar, Vol. 12, Published by Govt. of Maharastra.
5. Islam the National Movement of Arabs by Anwar Sheikh.
6. The Dictionary of Islam by Thomas Patrick Hughes.
7. Understanding of Islam Through Hadis by Ramswarup & Published by Sitaram Goel.

আমরা বিশ্বাস করি যে, কোরআন ও মহম্মদকে বাদ দিলে ইসলাম থাকে না। তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান কিসের উপর দাঁড়াবেন? অতএব, কোরআন, ও মহম্মদ পরিত্যক্ত হোক, আমরা তা বলছি না। আমরা বলতে চাই, কোরআন ও মহম্মদের বাণী ও মতামতকে ক্রটিমুক্ত করে যুগের উপযোগী, সহনশীল ও মানবিক করা হোক। কেননা হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। কাজেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী হিসাবে মানুষকে বিভক্ত ও হিংসা বিদ্বেষে দ্বন্দ্বমুখর না করে শুদ্ধ মানব প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হোক ইসলামকে। 'দারুল-ইসলাম' ও 'দারুল-হারব' তত্ত্ব, যা বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করা হোক। তাতে ভিন্ন ধর্মানুসারীদের সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সরকারের অধীনে বসবাস করতে কোন অসুবিধা থাকবে না।